সাধু-তপস্বী

প্রথম খণ্ড

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺দুর্গামোহন ঘোষের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

১ম খণ্ড

তিব্বতীবাবা

চারিদিকে শুধু ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড় আর পাহাড়। সেই সব পাহাড়দের উঁচু-নিচু বুকগুলি ঘন বনের শ্যামল আঁচল দিয়ে ঢাকা। পাহাড়ী ঢলের সঙ্গে সঙ্গে সে আঁচল কেমন যেন এলায়িত হয়ে নেমে এসেছে সানুদেশ পর্যন্ত। মাঝে মাঝে দুষ্টু হাওয়ার হিল্লোলে উড়ু উড়ু করতে থাকে সে আঁচলটি আর ঠিক তখনি এক ঝাঁক উজ্জ্বল রোদ এসে জরির কাজ বসিয়ে দিয়ে যায় তার জটিল জমির উপর।

এ দৃশ্য যত মনোহরই হোক না কেন, এমন কিছু নতুন নয় নবীনচন্দ্রের কাছে। জন্মের পর হতে আজ পনের-ষোল বছর পর্যন্ত এ দৃশ্য একরকম রোজই তিনি দেখে আসছেন। কবে কোন্ সে আদিযুগে সৃষ্টি হয়েছে এই সব পাহাড় আর বনের। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত হয়ত নবীনচন্দ্রের মত এত গভীর দৃষ্টিতে এমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওসব কেউ কখনো দেখেনি। এত দেখেও তবু মন কেন ভরে না, একথা নিজেই বুঝে উঠতে পারেন না নবীনচন্দ্র। যদি শুধু এই দৃশ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাঁর দৃষ্টি তাহলে হয়ত অতি সহজেই তৃপ্ত হতেন তিনি। কিন্তু এই সব সুন্দর দৃশ্যের সীমা ছাড়িয়ে নবীনচন্দ্রের দৃষ্টি চলে যায় দূরের যত সব সুন্দরতর ও বৃহত্তর দৃশ্যাবলীর দিকে। এই সব পাহাড় যদি এত সুন্দর হয় তাহলে পর্বতরাজ হিমালয় কত না সুন্দর। চোখে দেখেন নি। শুধু নাম শুনেছেন। তবু সে কি দুর্বার আকর্ষণ তার।

উত্তরদিকে অরণ্যকুলেলিসমাচ্ছন্ন যে-সব পাহাড় এক দুর্ভেদ্য প্রাকার সৃষ্টি করে দিগন্তকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে সেই সব

পাহাড় ডিঙিয়ে নবীনচন্দ্রের মন ছুটে যায় হিমালয়ের বুকে। এক দুর্বার আকর্ষণে উত্তাল হয়ে উঠে শিরা-উপশিরার সমস্ত রক্ত।

কিন্তু এ আকর্ষণ শুধু কি হিমালয়ের। বিশ্বের বহিরঙ্গে যেখানে যা কিছু সুন্দর রঙ আছে শুধু কি তাই দেখে দেখে মনটাকে ভুলিয়ে রাখবেন তিনি সারা জীবন। না তা কখনই না। নবীনচন্দ্রের মনের আসল কথা কেউ জানে না। কেউ জানে না, কোন সুন্দর বস্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্রষ্টা সম্বন্ধে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তাঁর মনে।

সকলে জানে শৈশব হতেই নবীনচন্দ্র বড় ভাবুক। লোকালয় ছাড়িয়ে পাহাড়ে বা বনে গিয়ে এক মনে পাখির গান শোনেন অথবা গাছের চিকণ সবুজ পাতার উপর রঙীন রোদের খেলা দেখেন। কিন্তু তারা কেউ খবর রাখে না, সৌন্দর্যের সকল বহিরাবরণ ভেদ করে কত সহজে নবীনচন্দ্র চলে যান বস্তুস্বরূপের নিগূঢ় রহস্যলোকে। সেখানে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করতে থাকেন, কোথায় তার স্রষ্টা।

অথচ তিনি যে আছেন এ বিষয়ে নিশ্চিত নবীনচন্দ্র। তিনি আছেন বলেই কুয়াশার ধবল ঘোমটা-পরা সবুজ পাহাড় এত নয়নাভিরাম; অরণ্য এত রহস্যময়, সমুদ্র এমন অতলান্তশায়ী; পাখির কণ্ঠ এমন মধুস্রাবী; সূর্যকিরণ এত সমুজ্জ্বল এবং চন্দ্রাতপ এমন মদিরস্পর্শী। কিন্তু কোথায় তিনি নবীনচন্দ্র শুধু তাই জানেন না। বিশ্বজোড়া তাঁর এই দানের বিপুল মায়াবরণের কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে। অজস্রের মধ্যে আত্মার পদ্মাসন পেতে নিয়ত ধ্যাননিরত আছেন যে পরমাত্মারূপী এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তাঁকে তিনি একদিন না একদিনই জানবেনই।

সে আজ প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা। আসামের

অন্তর্গত শ্রীহট্ট তখন ছোট একটি গাঁ। সেই গাঁয়েরই ছোট একটি ঘরে মায়ের সঙ্গে বাস করেন নবীনচন্দ্র। বাড়ির পাশেই শিবমন্দির। মা তাতে নিয়মিত শিবপূজা করেন। বাবাকে শৈশবেই হারিয়েছেন। তাঁর কথা কিছুই মনে পড়ে না। শুধু শুনেছেন, তিনি ছিলেন রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সুদূর বঙ্গদেশ হতে এখানে এসে বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। কামরূপ কামাখ্যায় কিছুদিন থেকে তন্ত্রসাধনাও করেছিলেন।

মা চান শিব। বাবা চাইতেন শক্তি। নবীনচন্দ্র কিন্তু শিব বা শক্তি কোনটিই চান না। তিনি চান শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, সকল দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাবের অতীত এক অদ্বৈত পরমসত্তা। মনে-প্রাণে তিনি করেন তারই উপাসনা। উপাসনা যে সবসময় বাচিক বা আনুষ্ঠানিক হবে এমন কোন কথা নাই। উপাসনার প্রকৃত অর্থ হলো সমীপে আসীন হয়ে চিন্তা করা।

শুধু শিব শক্তি নয়, কোন দেব-দেবীর সাকার কোন মূর্তির প্রতিই কোন আসক্তি নাই নবীনচন্দ্রের। তাঁর কেবলই মনে হয়, অখণ্ড মণ্ডলাকার যে পরম সত্য সর্ব চরাচরকে ব্যাপ্ত করে আছে তার কোন লিঙ্গভেদ থাকতে পারে না কখনো এবং তিনি কখনো এক সংকীর্ণ মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। যিনি পরম ঈশ্বর সকল কারণের কারণ অগতির গতি তিনি একান্তভাবে নির্গুণ নিরাবয়ব। তাঁকে সগুণ রূপে দেখতে চান না তিনি। এই বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় যে জ্ঞান তাঁর হয়েছে তাতে ধর্মশাস্ত্র ও দেবদেবীর ধ্যান ও সাধন মন্ত্রগুলি সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু এ সব মন্ত্র ও দেবদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলিকে মানুষেরই কল্পনা প্রসূত বলে মনে হয় তাঁর। এই সব দেবতা মানুষেরই সৃষ্টি। এমন কি বেদকে অপৌরুষেয় বলে মেনে নিতে পারেন না তিনি। বেদ ও বেদান্তের শ্লোকগুলি অপূর্ব শব্দসম্ভার ও ধ্বনিসমন্বিত এক

অতুলনীয় কাব্য সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বড় জোর সাধক কবিদের সাধন চিন্তার কিছু কিছু ফল মেশানো আছে তার মধ্যে। নির্গুণ নিরাকার যে ব্রহ্ম তাঁকে চিন্তায় ধরা যাবে কী করে আর নিবিড়তম ধ্যান ধারণার উর্ধ্বলোকে অতিমানস চিন্তার স্বচ্ছ অসীম অবকাশে যদিও সে ব্রহ্ম কিছুটা আভাসিত হয়ে ওঠেন তাঁকে ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে কিভাবে। যদি তা যায় তাহলে নির্গুণ হয়ে উঠবে সগুণ। অখণ্ড মণ্ডলাকার হয়ে উঠবে খণ্ড।

নবীনচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র পনের কি ষোল। তবু এই সব কত রকমের জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্ন দিনে দিনে জমে ওঠে তাঁর মনে।

প্রতি বছর শিবচতুর্দশীর দিন পূজা উপচার সংগ্রহের কাজে একটু বেশী ব্যস্ত থাকেন মা। মার অনুরোধে সেদিন নবীনচন্দ্রও সকাল থেকে বাড়ি হতে বার হন নি কোথাও। সন্ধ্যার কিছু আগে মা একটি কাজের ভার দিলেন নবীনচন্দ্রের উপর। কোন এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যাচ্ছেন বিশেষ কাজে। যাবার আগে বলে গেলেন, ঘরের ভিতর পূজার যে সব নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছেন সেগুলি যেন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেন নবীনচন্দ্র। পূজার জন্য প্রস্তুত এই সব সযত্নসাধিত উপচার যেন কোনভাবে অপবিত্র না হয়। তিনি বরাবরই ভাবপ্রবণ। তাই তাঁকে এত করে বলতে হলো।

ঘরের দিকে তাকিয়ে দাওয়ার উপর বসে রইলেন নবীনচন্দ্র। এক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছেন। তবু যেন কিছুই দেখছেন না। মার অনুরোধ সত্ত্বেও দেবতার কথা দেবতার পূজা উপচারের কথা কিছুই মনে নাই তাঁর। তিনি তখন ভাবছেন, যিনি সকল দেবতার দেবতা তাঁর কথা, যিনি সব জায়গাতেই রয়েছেন, অথচ কোথাও তাঁকে পাওয়া যায় না।

এভাবে কতক্ষণ ছিলেন নবীনচন্দ্র কিছুই হুঁস ছিল না। সহসা

মার চীৎকারে চমকে উঠলেন। মা অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, তুই কি অন্ধ হয়েছিস? তোর চোখের সামনে ইঁদুর এসে ঠাকুরের পুজোর ফল চাল খেয়ে যাচ্ছে আর তুই চুপ করে দেখছিস? ঠাকুর দেবতার প্রতি এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা নাই তোর? তোর জন্য আজ আমায় পাপী সাজতে হলো ঠাকুরের কাছে? এমন ছেলে থাকাও যা না থাকাও তাই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন নবীনচন্দ্র। এক অটল গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। যে সত্যকে এতদিন অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করে এসেছেন অথচ প্রকাশ করতে পারেন নি, আজ সমস্ত সংশয় ও সংকোচের কুহেলি ভেদ করে সে সত্যের মুখোমুখি হতে চান তিনি। শুধু মুখোমুখি নয়, অন্তর থেকে সে সত্যকে বাইরে এনে সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

নবীনচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, তুমি কাকে ঠাকুর বলে এতদিন পুজো করে এসেছ তা ভেবে দেখেছ? যদি সত্যি সত্যিই জাগ্রত হতেন তোমার দেবতা, তাহলে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য তিনিই রক্ষা করতেন। তাছাড়া শাস্ত্রে যে বলে, যে জীব, সেই শিব। জীবের মধ্যে কি শিব নাই, হলেই বা সে জীব ছোট বা নিকৃষ্ট? মনে রেখো, যে ইঁদুরটা তোমার ঠাকুরের নৈবেদ্য এঁটো করেছে. তোমায় ঠাকুর তার মধ্যেও আছেন। যদি তিনি সেখানে না থাকেন অথবা সেকথা তুমি যদি বুঝতে না পেরে থাক, তাহলে মিথ্যাই তোমার ঠাকুর পুজো। মিথ্যা সব মিথ্যা।

ছোট মুখে বড় কথা বলিস না নবীন! গর্জন করে ওঠেন মা।

এক কাপড়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন নবীনচন্দ্র। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন জটিল হয়ে উঠেছে চারিদিকের পর্বতকন্দরে আর পত্রগুচ্ছমণ্ডিত বৃক্ষশাখায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল

না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডে ব্যাহত হচ্ছিল প্রতিটি পদক্ষেপ। তবু অক্লান্ত গতিতে অনমনীয় দৃঢ়তায় ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে চলছিলেন নবীনচন্দ্র। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির গভীর অন্ধকার পার্বত্য পথের উত্তুঙ্গ অজস্র বাধা কোন কিছুই বিন্দুমাত্র ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারল না তাঁর অটল অকম্পিত হৃদয়ে।

তাছাড়া নবীনচন্দ্রের সহসা মনে হলো তিনি ত একা যাচ্ছেন না। কে যেন তাঁর সামনে আলোক বর্তিকা হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। অজস্র ভূধরঅরণ্যসমন্বিত এই চরাচর ব্যাপী অন্ধকারের উর্ধ্বে দিগন্তের পটে পটে কে যেন অনির্বাণ আশার জ্যোর্তিলিখন এঁকে চলেছে অদৃশ্য হাতে। সেই স্বর্গীয় জ্যোতির চকিত উত্তাপে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল তাঁর মনশ্চক্ষুটি —অবিদ্যায় অন্ধ হয়ে ছিল এতদিন যে চক্ষু। সবাই শুধু চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে চায়। মন দিয়ে জানতে যায় না কেউ। পরখ করে দেখতে চায় সবাই। প্রাণ মন সমর্পণ করে তাঁর কাছে ক'জন। নবীনচন্দ্র এবার হতে তাঁর সেই মনের চোখ দিয়ে দেখবেন,সমগ্র জীবনচৈতন্যের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে তাঁকে জানবেন মহান আদিত্যবর্ণ সেই পরম পুরুষকে, যিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে অনন্ত জ্যোতির প্রতীকরূপে দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত লাভ করে মানুষ।

সহসা দূরে কোথায় একটা আলোক বিন্দু দেখতে পেলেন নবীনচন্দ্র। তীর্থ-যাত্রীদের জন্য এ অঞ্চলে পথের ধারে মাঝে মাঝে সরাইখানা আছে। হয়ত বা আলোটা আসছে কোন একটা সরাইখানা থেকে। সেই আলোক বিন্দুটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগলেন নবীনচন্দ্র।

যা ভেবেছিলেন, দেখলেন ঠিক তাই। একদল তীর্থযাত্রী পথের ধারে একটি সরাইখানায় রাত্রি যাপনের আয়োজন করছে। ওদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে অযোধ্যা। রাত্রির পর পরদিনই তারা

যাত্রা করবে অযোধ্যার পথে। তাঁদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই মিশে গেলেন নবীনচন্দ্র।

অযোধ্যায় দিনকতক সকলের সঙ্গে রইলেন। কিন্তু মনের মিল হলো না কারো সঙ্গে। তীর্থযাত্রীদের সকলেই রামকে অবতার বলে বিশ্বাস করেন। নবীনচন্দ্র কিন্তু এসব বিশ্বাস করতে পারেন না। তীর্থযাত্রীরা সকলে যখন সরযু নদীতে স্নান ও তর্পণ সেরে অযোধ্যাময় 'হা রাম' 'হা রাম' করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নবীনচন্দ্র তখন সরযু নদীর ধারে ঘন শালবনের মধ্যে একা একা পরমার্থের চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসে আছেন। এই পরমার্থ কোন মানবরূপী অবতারের ক্ষুদ্র দেহাবয়বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না কখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত তিনি।

একদিন নিশীথ রাত্রে সকলকে ছেড়ে হিমালয়ের পথে রওনা হলেন নবীনচন্দ্র। কোথা হতে এত সাহস এত উদ্যম তিনি পেলেন, বন্ধুর পার্বত্য পথের অসংখ্য চড়াই উৎরাই, মৃত্যুহিম হওয়া তীক্ষ্ণ অট্টহাসি, চারিদিকের তুষারভ্রূকুটি কোন কিছুই ব্যাহত করতে পারল না কেন তাঁর গতি—তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি শুধু ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগলেন সামনের দিকে। ঐ তুষারমৌলি সুউচ্চ হিমালয়কে ডিঙিয়ে তিনি যাবেন আরও ওদিকে আরও নির্জনে। তারপর যেখানে কেউ কখনো যায় না সেই জনমানববর্জিত দেশে খুঁজে নেবেন অন্তরালবর্তী এতটি গুহা। সেই গুহার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে অনাহারে অনিদ্রায় ধ্যান করতে থাকবেন পরমার্থের। এই পরমার্থকে জানতে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হবেন না তিনি।

এখানকার পথ-ঘাট সবই অজানা। কিভাবে কোনদিকে

কোথায় একা যাচ্ছেন কিছুই বুঝছেন না। তবু কোন ভয় নাই। কাকে কিজন্যই বা ভয় করবেন নবীনচন্দ্র। তিনি অনুভব করলেন, আসলে তাঁর অন্তরের সংকল্পটাই জমতে জমতে প্রকাণ্ড এক পাহাড় হয়ে উঠেছে। জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য হয়ে উঠেছে এই তুষারহিম হতে আরো শীতল। তাঁর একনিষ্ঠ মনের মন্দাকিনী সমস্ত পাথরের বাধা চূর্ণ করে ছুটে চলেছে অধ্যাত্মসাধনার সাগর সংগমে।

পথে যেতে যেতে যদি কখনো কোনদিন কোন ফল পেয়ে যান ত খান। তাও নিজের হাতে গাছ থেকে পাড়েন না। আশপাশের বনে যদি কোন ফল পড়ে থাকতে দেখেন তবে তাই গ্রহণ করেন। কোন ক্ষুধাই অনুভব করেন না তিনি। মাঝে মাঝে এক-একটা ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভরে কিছু জল খেয়ে নেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে যায় কোথায় যেন।

প্রথমে নেপাল। তারপর তিব্বত ও মানস সরোবর। পথে একদল যাত্রী ভয় দেখিয়েছিল নবীনচন্দ্রকে, নেপালের গহন অরণ্যে আছে বাঘ, তিব্বতে তুষারাবৃত পাহাড়ে আছে শ্বেত ভল্লুক। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ বৃহদাকার হিংস্র তুষারমানবের দেখা পাওয়া যায়।

নবীনচন্দ্র নির্ভয়ে বললেন, যে আসে আসুক না সকল জীবের মধ্যেই আমি দেখি সেই এক পরমাত্মার লীলা। আমি তো কারো প্রতি কখনো হিংসাভাব পোষণ করি না। জ্ঞান মতে আমি জীবনে কোনদিন একটি পিঁপড়েও পদদলিত করিনি। কেন তবে তারা আমার ক্ষতি করবে?

কিশোর বালকের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় যাত্রীদল। এর পর নবীনচন্দ্র একাই এগিয়ে চলতে থাকেন মানস সরোবরের পথে। সেখানে পৌঁছেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন নবীনচন্দ্র। চারিদিকে শুধু তুষার মৌলি পাহাড় যুগ যুগান্ত ধরে এক অটল স্তব্ধতা ও অনন্ত

ধ্যান-গাম্ভীর্যে জমাট বেঁধে আছে এই সব পাহাড়। এখানে এসে আরো তীব্র হয়ে উঠল তাঁর সাধনার ব্যাকুলতা।

মনোমত একটী গুহা বেছে নিলেন নবীনচন্দ্র। কিন্তু লোকে যে বলে গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনা হয় না। কিন্তু কোথায় পাবেন সেই গুরু যিনি তাঁকে ধীরে ধীরে চিনিয়ে দেবেন সাধন মার্গের জটিল পথগুলিকে। সাধনার জন্য প্রথমে যোগবিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। তিনি শুধু জানেন যোগাঙ্গ আট রকমের—যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। আরও শুনেছেন, যোগসাধনার এক-একটি স্তর আয়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করে সাধক। কিন্তু কে তাঁকে যোগ সাধনার গূঢ় পদ্ধতিগুলি বলে দেবে?

যোগসাধনার গূঢ় পদ্ধতিগুলির আবার প্রকারভেদ আছে কিন্তু তিনি এত সব প্রকার ভেদ জানেন না। তিনি যমের মধ্যে জানেন শুধু অহিংসা সত্য, ব্রহ্মচর্য, পরিমিতাহার আর শৌচ। নিয়মের মধ্যে জানেন শুধু মানসিক জপ। আসনের মধ্যে জানেন একমাত্র পদ্মাসন। প্রাণায়াম বলতে তিনি শুধু বোঝেন প্রাণ ও আপান বায়ুর সংযোগ সাধন। প্রত্যাহারের একমাত্র অর্থ হলো তাঁর কাছে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে নিবর্তিত করে অন্তর্মুখী করা। ব্রহ্মই তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধরণা, তাঁর চিন্তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাওয়াই সমাধি।

নিজে নিজেই পদ্মাসনে বসলেন নবীনচন্দ্র। দুই উরুর মধ্যে দুই পদতল সংস্থাপন করে দুই হাত দিয়ে বিপরীতক্রমে দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দুটিকে জোর করে ধরে বসলেন। কিন্তু কোন্ মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করবেন? তিনি ত মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানেন না। কিন্তু তা না জানুন। মনকে তিনি বশীভূত করে ফেলেছেন এই বয়সেই সেই মনকে কেমন করে কেন্দ্রীভূত করতে হয় কোন একটি বিশেষ চিন্তায় তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

দেখতে দেখতে সেই অচিন্ত্যনীয় অকল্পনীয় ব্রহ্মের নির্বিশেষ নির্বিকল্প ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন নবীনচন্দ্র। সমস্ত ব্যাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। একে একে মনের ক্রিয়াটাকে একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তিনি আগেই উপলব্ধি করেছেন, মনের কোন উৎপাদিকা শক্তি নাই। মন অন্তঃকরণের সাধারণ একটি বৃত্তিমাত্র; যন্ত্রবৎ কাজ করে। ইন্দ্রিগাগ্রাহ্য বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে আমাদের; কিন্তু অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করাতে পারে না। তাই মানসচৈতন্যের স্তরকে ভেদ করে জ্ঞানচৈতন্যের রশ্মি ধরে ধীরে ধীরে চিত্তের অতলে নেমে গেলেন নবীনচন্দ্র। অনুসন্ধানাত্মিকা শক্তির দ্বারা এই চিত্তই জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই চিত্তের সহযোগেই বাইরের যে কোন বস্তু ভাবরূপে অবস্থান করে আমাদের অন্তরে। চিত্তধাতুর স্পর্শ না পেলে কোন বস্তুই সত্য বা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না আমাদের কাছে।

সেই চিত্তের অতলে গিয়ে নবীনচন্দ্র দেখলেন, এক মহা আকাশ। সে আকাশ তাঁর এই গুহা গহ্বরের মতই ভীষণভাবে অন্ধকার। সে আকাশ নৈঃশব্দে যেমন গভীর, শূন্যতায় তেমনি সীমাহীন। কিন্তু কোথায় সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ যাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে ওই আকাশ। সেই আলোয় তিনি এক মুহূর্তে চিনে নেবেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপটিকে। সেই আলোর স্পর্শেই বিশ্বের সকল সারভূত সত্য এক অমৃতমূর্তি ধরে দেখা দেবে তাঁকে।

কতদিন এভাবে ছিলেন কিছুই বুঝতে পারেননি নবীনচন্দ্র। একদিন চোখ মেলে দেখলেন বাইরের দ্বার পথে একজন মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবসন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। সহসা নবীনচন্দ্রের মনে হলো, এই সন্ন্যাসীই হয়ত তাঁর বিধিনির্দিষ্ট নিয়তিচিহ্নিত যোগী-গুরু। ইনিই হয়ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁকে সাধন মার্গের উচ্চ শিখরে।

উঠে গিয়ে ভক্তিভয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন নবীনচন্দ্র। কথা বলে জানলেন, সন্ন্যাসী তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা। বৌদ্ধযোগ-বিত্তায় সিদ্ধিলাভ করে পর্যটন শুরু করেছেন। দিকে দিকে তথাগতের বাণী প্রচার আর মোহগ্রস্ত মানুষকে মহানির্বাণলাভে সাহায্য করাই এখন তাঁর একমাত্র ব্রত।

দুই এক দিনের মধ্যে তাঁর ভাষা আয়ত্ত করে নিলেন নবীনচন্দ্র। তাঁর মেধার তীক্ষ্ণতায় ও প্রতিভার অলৌকিকতায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। নবীনচন্দ্রের অন্তরের ব্যাকুল বাসনা শুনে তিনি বললেন, আমি বৌদ্ধযোগী। ব্রহ্ম কি তা ত জানি না। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আমাদের বিজিজ্ঞাসিতব্য বস্তু নয়। আমি শুধু তোমার জীব-সত্তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি বিশ্বাত্মার পরম উপলব্ধির গভীরে। আমি শুধু উদ্ঘাটিত করে দিতে পারি জরামরণচক্রের বিষাক্ত রহস্যটিকে, যাতে করে তুমি এই জরামরণকে অতিক্রম করে অনায়াসে চলে যেতে পার মহানির্বাণের নৈরাজ্যে।

সন্ন্যাসীর সামনে নতজানু হয়ে নবীনচন্দ্র কাতরকণ্ঠে বললেন, তাই হোক গুরুদেব, আপনি আমায় সেই বিশ্বাত্মাকেই চিনিয়ে দিন। এই বিশ্বাত্মাকে বুঝলেই তাঁকে আমার পাওয়া হবে। আমি যাঁকে ব্রহ্ম বলি তিনি ত বিশ্ব থেকে পৃথক নন। আপনারা যাকে বোধি বলেন, আমি তাকে বলি তাঁর দিব্যজ্যোতি। আপনাদের নির্বাণই আমার তাঁকে পাওয়ার আনন্দ। তাঁর সীমাহীন বিশালতায় আমি বিস্মিত হব। তাঁর অন্তহীন আলোর উচ্ছাসে আমি অভিভূত হব; তাঁর অগাধ রহস্যের রসে আমি চিরকাল ভাসব। এইভাবেই তাঁকে আমি সবার সঙ্গে যুক্ত করে অখণ্ডরূপে পেতে চাই। পৃথকভাবে খণ্ড রূপে নয়।

সেই লামা সন্ন্যাসীর নির্দেশমত আবার গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন নবীনচন্দ্র। আবার শুরু হলো তাঁর কঠোরতম সাধনা।

লামা সন্ন্যাসীটি আরো কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন নবীন-চন্দ্রের সাধনার ধারাটিকে। মাঝে মাঝে তাঁকে উপদেশ দিতেন। একদিন বললেন, দেখ, আমি হীনযান বৌদ্ধদের মত আত্মনির্বাণের সাধনা করি না। আমরা হচ্ছি মহাযান, বিশ্বাত্মবাদী। বিশ্বের সকল প্রাণীর জন্যই আমরা নির্বাণ কামনা করি। সকলের প্রতি আমাদের সমান মমত্ববোধ। ব্যবহারিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবে জাগতিক সব বস্তুরই একটা করে প্রাতিভাসিক অর্থ আছে। এই প্রাতিভাসিক অর্থকেই বেদান্তে বলে মায়া। কিন্তু পারমার্থিক অর্থে সব বস্তুই শূন্যস্বভাব; তোমরা যাকে বল ব্রহ্মসত্তা।

শান্ত নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে নবীনচন্দ্র বললেন, আমার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করবেন গুরুদেব, আসলে সব বস্তুস্বরূপ শূন্য হলেও সবার সব শূন্যতাকে পূর্ণ করে আনন্দঘনরূপে বিরাজ করছেন ব্রহ্মসত্তা। তিনি আছেন বলেই আকাশ শূন্য হয়েও এত বর্ণময়, আলোময়। তিনি আছেন বলেই সব কিছু শূন্যস্বভাব হয়েও এত অর্থময়। তিনি আছেন বলেই আমাদের অন্তরাত্মা শূন্য জেনেও আমরা বেঁচে আছি।

আর কোন তর্ক-বিতর্ক না করে গম্ভীর হয়ে রইলেন সন্ন্যাসী। তিনি বুঝলেন, নবীনচন্দ্র জন্ম-তপস্বী। পরমজ্ঞানের আলো স্বতোদ্ভাসিত তার চিত্তে। অবিদ্যার অন্ধকার যেটুকু আছে তার, কিছুদিনের সাধনাতেই কেটে যাবে নিঃশেষে। নবীনচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেলেন সন্ন্যাসী।

মনটা সামান্য একটু ব্যথিত ও বিচলিত হলো নবীনচন্দ্রের। সন্ন্যাসী তাঁকে সত্যিসত্যিই স্নেহ করতেন। বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকায় একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ভাব বেশীদিন স্থায়ী হলো না তাঁর মনে। কারো সঙ্গে মায়িক বা লৌকিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া তাঁর সাধনার একান্ত পরিপন্থী।

আবার শুরু হলো সেই গভীর সাধনা। এখন ধারণা ও ধ্যান অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নবীনচন্দ্রের কাছে। এবার তিনি যম নিয়মাদি দ্বারা মনকে আত্মার মধ্যে অবস্থিত করতে পারলেন সহজেই। পরবহ্মের আনন্দস্বরূপ তাঁর দেহমধ্যে যে হৃদয়পদ্ম আছে সেই পদ্মের মধ্যস্থিত আকাশে বাহ্যাকাশকে ধারণ করলেন নবীন-চন্দ্র। এই ধারণই হলো ধারণা। বৈদিক যোগশাস্ত্রে এই ধারণা পাঁচপ্রকার অর্থাৎ দেহস্থ পঞ্চভূতে পঞ্চদেবতার ধারণা করতে হয়। কিন্তু কোন দেবতার মূর্তি-কল্পনা পছন্দ করেন না তিনি।

ধারণার পর ধ্যান। নবীনচন্দ্র এবার বুঝলেন চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপচিন্তার নামই ধ্যান। সগুণ ও নির্গুণভেদে এই ধ্যান দুই রকমের। কিন্তু নবীনচন্দ্র বরাবরই নির্গুণ ধ্যানের পক্ষপাতী। দেহস্থ সকল মর্মস্থান অর্থাৎ নাড়ীস্থান, বায়ুস্থান প্রভৃতির দ্বারা আত্মাকে অবগত হয়ে সেই আত্মজ্ঞানের দ্বারা রূপরসগন্ধাদি-বিবর্জিত অনাদি অনন্ত অপ্রমেয় যিনি পরব্রহ্ম তাঁকে উপলব্ধি করা ও আমি সেই ব্রহ্মময় এইরূপ অনুভব করাই হলো নির্গুণ ধ্যান। নাসাগ্রে দৃষ্টি আরোপ করে ভ্রূযুগলমধ্যে শিরঃস্থিত ষোড়শদলপদ্ম হতে ক্ষরিত অজস্র অমৃতধারায় প্লাবিতজ্যোতির্ময়স্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করতে করতে পরে আমিই সেই পরমাত্মা এইরূপ অনুভব করলেন নবীনচন্দ্র। একবছর নিরন্তর এই অমৃত ধ্যান করার এলে মৃত্যুভয়কে একেবারে জয় করে ফেললেন। সহসা মনে হলো তাঁর, মধুস্রাবী অমৃতের ঝর্ণা ঝরে পড়ছে জলে স্থলে আকাশে বাতাসে পত্রেপুষ্পে। কোথাও কোন মৃত্যু বা দুঃখ নাই এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশে।

এইভাবে কতদিন কতমাস কতযুগ কেটে গেল সেই নির্জন গুহা মধ্যে তা কিছুই বুঝতে পারলেন না নবীনচন্দ্র।

কিন্তু নবীনচন্দ্র শুধু একাই ধ্যান করছেন না সেই গুহামধ্যে। সেই গুহার বাইরে চারিদিকের তুষারপর্বতগুলিও ধ্যানাবিষ্ট হয়ে

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে সমানে। প্রশান্তগম্ভীর সেই সব তুষার পর্বতগুলির ধ্যান ভাঙ্গাবার জন্য কত শ্যামাঙ্গী বনচ্ছায়া মাথা ঠুকেছে তাদের পাদদেশে। পাকা কমলালেবু রঙের কত হেমাঙ্গী রোদ সুচতুর নটীর মত নৃত্য করেছে তাদের শুভ্র ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে। কত কর্ণিকার কুসুম ফুটে ঝরে গেছে আর কত উতলা বাতাস হাহাকার করছে তাদের বুকে। তবু তাঁদের ধ্যান ভাঙ্গেনি। এতটুকু টলেনি তাদের হিমাক্ত হৃদয়।

সেই মানস সরোবরের নিকটবর্তী গুহামধ্যে আরো কিছুকাল থাকার পর সমতলে ফিরে আসবার প্রয়োজন অনুভব করলেন নবীনচন্দ্র। সেই বৌদ্ধলামা সন্ন্যাসীর মৈত্রী ও করুণার বাণীটি আজো তাঁর হৃদয়তন্ত্রে বাজছে। আত্মনির্বাণ বা ব্যক্তিগতভাবে মোক্ষলাভই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই মোক্ষলাভের সাধনা এবং তার সিদ্ধি একান্ত ভাবে স্বার্থপরতারই পরিচায়ক। শোক দুঃখ ও আধি ব্যাধি জর্জরিত ও মৃত্যুভয়গ্রস্ত কত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। তাদের জন্য কিছু-না কিছু করা দরকার। তাই সেই গুহাটি ত্যাগ করে এবার তাঁর সাধনার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে দিতে চাইলেন সারাদেশব্যাপী।

দেখতে দেখতে কত উপত্যকা ও মালভূমি পার হয়ে সমতল ভূমির দিকে নামতে লাগলেন নবীনচন্দ্র। কিন্তু তখনো মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন না। বহুবৎসর কথা না বলায় তাঁর মনে হলো, বাচনিক শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। কথা বলার কোন চেষ্টাও করলেন না।

প্রথমে গাড়োয়াল প্রদেশে এসে প্রবেশ করলেন। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। মাথায় বিরাট জটাভার। শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডল।

পরণে মলিন গৈরিক বসন। নবীনচন্দ্র নিজেই বুঝতে পারলেন না ঠিক কত বৎসর তিনি সেই পর্বতগুহায় ছিলেন। পনর বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে এসেছেন তা মনে আছে; কিন্তু এখন তাঁর বয়স কত তা কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তবে বার্ধক্য-জনিত কোন দুর্বলতা অনুভব করেছেন না দেহে। দেহের উচ্চতা ও বলিষ্ঠতা বেশ কিছুটা বেড়েছে বলেই মনে হলো।

তিনি ঠিক করলেন, অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করে চলবেন লোকালয়ে। যে যা সেচ্ছায় দান করতে চায় তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করবেন এবং তাতেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। কারুর কাছে কিছুই চাইবেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় পথ চলতে চলতে একটি সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন নবীনচন্দ্র। সেদিন সেখানে বেশী লোক ছিল না। মাত্র দুজন লোক একধারে বসে গল্প করছিল। লোক দুটিকে এক নজরে দেখেই তিনি দুষ্ট প্রকৃতির বলে জানতে পারলেন।

তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলিও তাচ্ছিল্যভরে নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগল। তুমি কোথা হতে আসছ? তুমি সাধু না পাগল? পাগল না পাগলের ছদ্মবেশে কোন চোর?

সে সব কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নবীনচন্দ্র সরাইখানার এককোণে নির্বিকারভাবে বসলেন। মানুষের এই সব নীচতা ক্ষুদ্রতা যেন নিতান্তই এক তুচ্ছ ব্যাপার। এক সহজ ঔদাসিন্যে তাই উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন এইসব বিদ্রূপ ও গালিগালাজ-গুলিকে।

কিন্তু তাঁর এই ঔদাসিন্যে আরো রেগে গেল লোক দু'টি। তাদের মধ্যে একজন প্রথমে থুথু দিল নবীনচন্দ্রের গায়ে। তার দেখাদেখি অন্যজনও তাই করল। তবু তেমনি নির্বিকারভাবে বসে রইলেন নবীনচন্দ্র। একটি কথাও বললেন না। কোনরূপ ঘৃণা বা রাগও প্রকাশ করলেন না।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল এবং কেমন করে তা ঘটল তা নিজেই বুঝতে পারলেন না নবীনচন্দ্র। সহসা তিনি অনুভব করলেন, তাঁর নির্মল নির্বিকার চিত্তাকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। তাঁর নিঃশ্বাসে যেন ঝড় বইছে। অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে যেন তাঁর দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে এক কাতর আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন নবীনচন্দ্র। দেখলেন তাঁর অদূরে লোক দু'টি মেঝের উপর পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে। অথচ কী হচ্ছে বলতে পারছে না। মুখ দিয়ে শুধু লালা নিঃসৃত হচ্ছে অবিরাম। নবীনচন্দ্র এবার বুঝতে পারলেন এ তাদের কৃতকর্মের ভয়ানক পরিণাম। কিন্তু তখন আর সময় নাই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিথর ও নিস্পন্দ হয়ে উঠল লোক দু'টির দেহ।

সেখানে আর কালবিলম্ব না করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন নবীনচন্দ্র। সরাইখানার যে কোন সময়ে লোক আসতে পারে এবং এলেই তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এরা কারা কেমন করে মরল।

তিনদিন পর অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটল উত্তর প্রদেশের এক চটিতে। সেও একটি বড় সরাইখানা। সেখানেও দিনশেষে পথক্লান্ত নবীনচন্দ্র গিয়েছিলেন রাত কাটাবার জন্য। গিয়ে দেখলেন, বাইশ জন লোকের এক যাত্রীদল জটলা পাকিয়ে বসে আছে। হাসি আর হুল্লোড়ের ঝড় বইছে সারা সরাইখানায়। সেখানে তিনি যেন একান্তই অবাঞ্ছিত।

নবীনচন্দ্রের বেশভূষা দেখে নানা ভাবে উপহাস করতে লাগল তারা। নানা রকমের অপমানজনক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল। নবীনচন্দ্র এবারও তেমনি নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করে নিতে লাগলেন সবকিছু। কোন কথা বললেন না। বলবার চেষ্টা করলেন না। বলবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না নবীনচন্দ্রকে চুপ করে বসতে দেখে কমার পরিবর্তে বেড়ে গেল তাদের উপহাস

ও বিদ্রূপবর্ষণ। নবীনচন্দ্র বসবার জন্য যে জায়গাটিকে বেছে ছিলেন সেই জায়গাটিতে জনকতক লোক থুথু ফেলে দিয়ে বলল, সাধুবাবার জন্য আসন তৈরী করে দিলাম। নবীনচন্দ্র কিন্তু নির্বিকারভাবে তারই উপর বসে পড়লেন। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, সাধুবাবার গলায় দেব, মালা নিয়ে আয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি বড় দড়িতে অনেকগুলো চামড়ার চটি গেঁথে মালার মত পরিয়ে দিল নবীনচন্দ্রের গলায়।

এবার তাদের পরিণামের কথা ভেবে ভীত হয়ে উঠলেন নবীনচন্দ্র। সেদিনকার মত আজও যদি তেমনি করে মেঘ জমে তাঁর নির্মল চিত্তাকাশে, নিশ্বাসে ঝড় বয়, দৃষ্টিতে অগ্নিবৃষ্টি হয়, তাহলে এই বাইশজন লোকই অকালে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এক অজানিত যন্ত্রণার জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে থাকবে তাদের দেহগুলো। এজন্য নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে মনটাকে ধ্যানে নিবিষ্ট করলেন। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন নবীনচন্দ্র। মধ্যরাত্রিতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বাইশ জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যের বিন্দুমাত্র শব্দও শোনা যাচ্ছেনা। ভয়ে ভয়ে একের পর এক তাদের দেহগুলিকে পরীক্ষা করে দেখলেন নবীনচন্দ্র, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য অনেক আগেই থেমে গেছে। কী করে এমন হলো কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সেই অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লেন। জনপদ হতে বহু দূরে নদীতীরের এক নির্জন প্রান্তরে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। সব মিলিয়ে চব্বিশটি মানুষের অকালমৃত্যুর তিনি কারণ হয়েছেন। অনুতাপে তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। অথচ নিজের কোন দোষও তিনি খুঁজে পেলেন না। আবার পরক্ষণেই ভাবলেন, লৌকিক অর্থে তাদের মৃত্যু হয়েছে সত্য। কিন্তু আসলে তারা মরেনি। দীর্ঘদিন

থয়ে পাপের কলুষে আচ্ছন্ন ছিল তাদের যে নিত্য শুদ্ধ আত্মা, সে আত্মা আজ মুক্ত হয়ে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হলো, তারা মহাজীবন লাভকরল অনন্তলোকে গিয়ে। তবু এবার মৌন ব্রত ভঙ্গ করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন নবীনচন্দ্র। মানুষ পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়লে উপযুক্ত সদুপদেশ পেলে জীবদ্দশাতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে শুদ্ধ ও মুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

পরদিন সকালেই পথে এক মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে প্রাণ কেঁদে উঠল নবীনচন্দ্রের। দেখলেন, পথের ধারে একটি গোরস্থানে বহু লোকজন। পরে বুঝলেন, স্থানীয় এক মুসলমান জমিদারের একমাত্র সন্তান দশ-এগারো বছরের একটি বালকপুত্র মারা গেছে এবং একটু আগেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। এবার তারা সকলেই চলে যাচ্ছে। গত দুইদিনকার সেই ঘটনার কথা সহসা মনে হলো নবীনচন্দ্রের এবং মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র অনুতাপের জ্বালা অনুভব করলেন। ভাবলেন, সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসে গেছে। তাঁর সামান্য ব্যথাহত কয়েকটি নিঃশ্বাসে ও মনোবেদনায় যদি চব্বিশটি লোকের প্রাণ যায়, কেন তবে তাঁর সাধনলব্ধ সমস্ত শক্তির প্রয়োগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি শিশুপ্রাণ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে না। তা যদি না হয় তাহলে বৃথাই তাঁর অমৃত ধ্যান এবং বৃথাই তাঁর মৃত্যুকে জয় করা।

সকলে চলে যেতে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে জনশূন্য গোরস্থানটি। নবীনচন্দ্র ঢুকে পড়লেন তার মধ্যে। তারপর কবরের কাঁচা মাটি অতিকষ্টে সব সরিয়ে বালকের মৃতদেহটি বার করলেন এবং তার সামনে স্থির হয়ে বসে প্রাণায়াম শুরু করলেন।

প্রাণ ও অপাণ বায়ুর সংযোগই হচ্ছে প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম পূরক, কুম্ভক, ও রেচক এই তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রণবের মত প্রাণায়ামও অকার, উকার ও মকার এই ত্রিবর্ণাত্মক।

নবীনচন্দ্র প্রথমে ব্যাহ্যস্থান হতে ইড়ানাড়ী দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করে ষোলবার অকার মূর্তি চিন্তা করে প্রণব জপ করতে করতে ধীরে ধীরে ওই বায়ু উদরস্থ করলেন। এইরূপ করাকে পূরক বলে। পরে উকার মূর্তি ধ্যান করে চৌষট্টি বার প্রণব জপ করতে করতে ওই বায়ুকে যতক্ষণ সম্ভব পূর্ণকুম্ভের মত ধারণ করলেন উদরের মধ্যে। একে বলে কুম্ভক শেষে বত্রিশবার প্রণব জপ করতে করতে পিংগলা নাড়ী দ্বারা ওই বায়ুকে রেচন করলেন। এইভাবে বায়ু-ত্যাগ করাকে বলে রেচক। দ্বিতীয়বারে ইড়া নাড়ীর পরিবর্তে পিংগলা নাড়ী দিয়ে বাহ্য বায়ু ধারণ করলেন। এইভাবে তিনবার প্রাণায়াম করলেন। কিন্তু প্রতিবারই রেচনকালে উদরস্থ বায়ু বাইরের বাতাসের সঙ্গে না মিশিয়ে মৃত বালকটির নাসিকারন্ধ্রে ত্যাগ করতে লাগলেন।

ছেলেটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন নবীনচন্দ্র। নিজের মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষমতা এই প্রথম প্রয়োগ করে প্রাণ সঞ্চার করলেন মৃতের মধ্যে এবং এই একটি প্রাণ সঞ্চারের উজ্জ্বল আনন্দ চব্বিশটি মানুষের মৃত্যুজনিত বিষাদের কালো ছায়াটাকে এক মুহূর্তে অপসারিত করে দিল তাঁর মন থেকে।

ছেলেটি বেঁচে উঠে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল নবীনচন্দ্রের দিকে। নবীনচন্দ্র তার পিঠে একটি মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন, যা বাড়ী যা, চেয়ে দেখছিস কি? তোর জন্য বাড়িতে বাবা মা কত ভাবছে। তোকে দেখে সবাই আশ্চর্য হলে বলবি এক সন্ন্যাসী আমায় বাঁচিয়ে দিল।

ছেলেটি বলল, তুমিও আমাদের বাড়ি চল না সাধুবাবা। তোমাকে দেখে বাবা খুব খুশি হবে।

নবীনচন্দ্র বললেন, আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। আমাকে আর কোন ঘরে যেতে নেই।

ছেলেটি চলে যেতেই নবীনচন্দ্র আবার যাত্রা শুরু করলেন।

কোথায় কোনদিকে যাবেন কোন তার ঠিক ঠিকানা নাই। তিনি শুধু এগিয়ে চলতে লাগলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন এবার হতে যাতে করে যথাসম্ভব অকালমৃত্যু রোধ করতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। এর জন্য ওষধি বিদ্যা শুরু করবেন স্থির করলেন। বনে-জঙ্গলে অবহেলিত যে সব অজস্র গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে আছে তাদের অদ্ভুত রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা যথা সময়ে প্রয়োগ করলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সারানো যেতে পারে। অনেক সময় অকাল মৃত্যুপর্যন্ত রোধ করা যেতে পারে।

একদল বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো নবীনচন্দ্রের। তিব্বতীয় সেই বৌদ্ধলামা ও বৌদ্ধযোগ পদ্ধতির কথা তখনো মনে আছে তাঁর। এই সন্ন্যাসীর দল তিব্বত নেপাল হয়ে যাবে ব্রহ্মদেশে। তারপর চীন। নবীনচন্দ্র স্থির করলেন, তিনিও তাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যাবেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে থেকেও নবীনচন্দ্র নিয়মিত ব্রহ্মের ধ্যান করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি হব একাধারে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক। বৌদ্ধের বোধি হয়ে উঠবে তাঁর কাছে বৈদান্তিকের পরম আত্মজ্ঞান যে জ্ঞান তাঁকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে ব্রহ্মো পলব্ধির গভীরে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস না করলেও তাঁদের বিশ্বাত্মবাদ ব্রহ্মোপলব্ধির এক বিশুদ্ধ নির্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নির্যাসে কারো মন অভিসিঞ্চিত না হলে কেউ কখনো সারা বিশ্বের মধ্যে নিজেকে এমন করে ছড়িয়ে দিতে পারেনা; সারা বিশ্বকে এমন ভাবে আপন করে টেনে নিতে পারে না নিজের মধ্যে।

কত পাহাড় ডিঙিয়ে কত গহন অরণ্য ভেদ করে সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলেন নবীনচন্দ্র ব্রহ্মদেশের পথে। পথ চলতে চলতে পথের ধারেই মাঝে মাঝে বিশ্রাম করেন দুই-এক দিনের জন্য। সাধন-ভজনও চলতে থাকে। আসাম ও ব্রহ্ম-দেশের মধ্যবর্তী বিরাট পার্বত্য অঞ্চলে গহন অরণ্যপথে নবীনচন্দ্রের

যোগ বিভূতির বহু পরিচয় পান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। যে-সব হিংস্র জীবজন্তুর কাছে যেতে তাঁরা ভয় পেতেন তাদের মাঝখান দিয়ে অবলীলাক্রমে চলে যেতেন নবীনচন্দ্র। সবচেয়ে হিংস্র জন্তুরাও ক্ষণেকের জন্য হিংসা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকত তাঁর দিকে।

একদিন বনপথে একটি ঘটনা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় সন্ন্যাসীর দল। নবীনচন্দ্র বসে তখন জপ করছিলেন। হঠাৎ বাঘের গায়ের তীব্র গন্ধ পেয়ে ভয়ে সচকিত হয়ে উঠল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি বাঘ গর্জন করতে করতে সেই দিকেই এসে পড়ল। প্রাণ ভয়ে সন্ন্যাসীরা সকলে জড়িয়ে ধরল নবীনচন্দ্রকে। যদিও এর আগে কোন দিন তাঁর কোন অলৌকিক বিভুতির পরিচয় তারা পায়নি তথাপি তাদের মনে হলো, এ বিপদে নবীনচন্দ্রই তাদের একমাত্র ভরসা।

সকলের আর্ত ব্যাকুলতায় বাধ্য হয়ে চোখ মেলে নবীনচন্দ্র দেখলেন, সত্যিই একটি বাঘ ধীর অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে এইদিকেই আসছে এবং সন্নাসীদের দিকে চোখ রেখে তাদের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের সকলকে পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বাঘটির দিকে নিজেই এগিয়ে গেলেন নবীনচন্দ্র। তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে কি একবার দেখে নিল বাঘটি। তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত হিংসা রক্ত লোলুপতা ভুলে গিয়ে পোষা বিড়ালের মত আব্দারের ভঙ্গিতে লেজ নাড়তে লাগল নবীনচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে। নবীনচন্দ্র তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ওঁরা ত তোমার কোন অনিষ্ট করেন নি, তবে কেন তুমি ওঁদের প্রতি হিংসাভাবাপন্ন হয়ে ছুটে এসেছ? যাও চলে যাও, আর কোনদিন আমাদের জপ-তপের বিঘ্ন ঘটাতে এস না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি চলে গেল। একবার পিছন ফিরে তাকালও না।

প্রথমে বৌদ্ধলামা প্রদর্শিত পথে সাধনা করবার পর পরে ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকে পরিণত হয়েছিলেন নবীনচন্দ্র একথা শুনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন মনে মনে। মুখে কিছু না বললেও সংশয় পোষণ করতেন তাঁর সাধন পদ্ধতিতে। এইবার কিন্তু তাঁরা লজ্জিত না হয়ে পারলেন না। সমস্ত অভিমান সংশয় ও ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁরা নবীনচন্দ্রের কাছে।

তাঁরা লজ্জার সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, যে অহিংসা ও মৈত্রীমন্ত্রের তাঁরা সাধনা করে আসছেন এতদিন এবং যে মন্ত্র লোকসমক্ষে প্রচারও করে এসেছেন কত নিষ্ঠার সঙ্গে, সে মন্ত্রের মহিমাকে তাঁরা আজো প্রসারিত করে দিতে পারেননি জীবজগতের মধ্যে—এটা তাঁদের সাধনারই শোচনীয় ব্যর্থতা। অথচ নবীনচন্দ্র বৈদান্তিক হয়েও একটি হিংস্র প্রাণীর মধ্যে কত সহজে পৌঁছে দিলেন এই এই অহিংসার মর্মবাণীটিকে।

নবীনচন্দ্র তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, যে কোন ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্য হলো সমস্ত ভেদ জ্ঞানের বিলোপ সাধন। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মের স্বরূপ যতই উপলব্ধি করতে থাকেন ততই নামভেদ, রূপভেদ, গুণভেদ প্রভৃতি সমস্ত রকমের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় তাঁদের কাছে। তখন যে কোন জীব বা জড়কে ভালবাসা সহজ হয়ে ওঠে তাঁদের পক্ষে।

তারপর নবীনচন্দ্র প্রথম জীবনে কিভাবে কোন এক অজ্ঞাত নামা অদ্ভুত সাধকের নির্দেশে একটি জীবকে তাঁর ইষ্টদেবতা ভাবে সাধনা করেছিলেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তার গল্পটি তাঁদের বললেন।

তিনি বলতে লাগলেন: ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে অযোধ্যা থেকে প্রথমে আমি নেপালে যাই। তারপর সেখান থেকে তিব্বত। এই নেপালে একজন অদ্ভুত সাধুর সংস্পর্শে আসি

আমি। প্রথমে তাঁর সেবা করতাম আমি প্রাণপণ যত্নে। তখন আমি পাগলের মত গুরু খুঁজে চলেছিলাম। তাই কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই সহজে আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম তাঁরপ্রতি। পাহাড়ের ধারে এক গভীর অরণ্যে একটি ছোট্ট আশ্রম ছিল এই সাধুটির। আমি সেখানে রয়ে গেলাম। তিনি আমায় দীক্ষা দেবেন অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃত পথটি দেখিয়ে দেবেন, এই আশা দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। অবশেষে একদিন রাত্রিতে আমি স্পষ্ট অধৈর্য প্রকাশ করে ফেলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে এই মুহূর্তে তুমি ঐ নদী হতে স্নান করে এস।

তখন রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। অন্ধকার গভীর হয়ে উঠেছে গহন অরণ্যের জটিল শাখা-প্রশাখায়। চারিদিকের পর্বতে তুষারপাতের ফলে এবং সূর্যকিরণ না থাকায় হিম হয়ে উঠেছে তীব্র। তবু আমি আশ্রম থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। অদূরেই একটি ছোট পার্বত্য নদী ছিল। তার সুতীক্ষ্ণ শীতলতায় আমি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে তাতে স্নান করলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্রমে গুরুজীর কাছে ফিরে এলাম। গুরুজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়িতে কে কে আছে? কাকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস?

আমি বলিলাম, বাড়িতে আমার আছে আমার মা আর একটি মেষ শাবক। মেষ শাবকটিকে আমি খুব ভালবাসতাম।

গুরুজী তখন বললেন, ঠিক আছে, ঐ মেষ শাবকটিরই ধ্যান করবে তুমি মনে-প্রাণে। কুটিরের অনতিদূরে ঐ যে পর্বতগাত্রে একটি গুহা রয়েছে, তার ভিতরে গিয়ে দিনরাত শুধু তার ধ্যান করবে। আমি তোমাকে না ডাকা পর্যন্ত তার থেকে বার হবে না তুমি কখনো। তাহলে জীবনে সব সাধনাই তোমার হবে নিষ্ফল। আমার আদেশ যদি যথাযথ পালন করতে পার এবং

এই প্রাথমিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পার তাহলে পরে বৃহত্তর যোগ সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ সম্ভব হবে তোমার পক্ষে।

কথাটার মর্ম ঠিকমত বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রইলাম গুরুজীর মুখের দিকে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলাম না।

গুরুজী আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, কেন এই অদ্ভুত নির্দেশ তা এখন বুঝতে পারছিস না, কিন্তু পরে পারবি। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জীবত্মা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন ও মহৎ অহংকারাদি দ্বারা মোহিত হয়ে অবস্থান করছে। এই জীবাত্মাকে আগে জানতে ও জাগাতে না পারলে পরমত্মাকে জানা সম্ভব নয়। আর এর জন্য চাই সগুণ ধ্যান। তুমি বয়সে তরুণ বলে তোমার পক্ষে প্রিয়বস্তুর ধ্যান ও ক্রমে ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে একাত্মতালাভ সহজ হবে। তাছাড়া এর দ্বারা সর্বভূতে ও সর্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞানও সহজেই হবে। তাই তোমাকে এই নির্দেশ দিলাম।

তারপর গুরুজী আমায় সাধন-প্রক্রিয়াগুলি সহজভাবে বলে দিলেন। তিনি আমায় প্রথমে ভৌতিক দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করলেন। তিনি বললেন, তোমায় আগে বলেছি, ধারণা পাঁচ প্রকার। তার কারণ দেহের মধ্যে যে পঞ্চভূত রয়েছে সেই পঙ্কভূতে পঞ্চ দেবতাকে ধারণ করতে হয়। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের পৃথক পৃথক স্থান আছে দেহের মধ্যে। পাদ মূল হতে জানু পর্যন্ত পৃথ্বীস্থান, জানু হতে গুহ্য পর্যন্ত জলস্থান, গুহ্য হতে হৃদয় পর্যন্ত বহ্নিস্থান, হৃদয় হতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত বায়ুস্থান আর ভ্রূমধ্য হতে শিরঃপ্রান্ত পর্যন্ত ব্যোম বা আকাশস্থান। লং বা পৃথ্বিবীজ জপ করতে করতে পৃথ্বীস্থানে ব্রহ্মাকে, বং বা বারিবীজ জপ করতে করতে জলস্থানে বিষ্ণুকে, রং বা বহ্নিবীজ জপ করতে করতে অগ্নিস্থানে রুদ্রকে, যং বা বায়ুবীজ জপ জপ করতে করতে বায়ুস্থানে ঈশ্বরকে ও হং বা ব্যোমবীজ জপ করতে

করতে আকাশস্থানে সকল কার্যের কারণস্বরূপ সদাশিব পরমশ্বেরকে সমাহিতচিত্তে ধারণ করবে। ধারনার মূল কথা হলো, কর্মস্বরূপ ভৌতিক দেবতাদের সদাশিব অর্থাৎ পরমানন্দরূপ স্বস্ব-কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের মধ্যে সংলীন করে দেয়া এবং পরে জীবাত্মাকেও সেই পরমকারণরূপ পরব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া। তুমি এখন, পরব্রহ্মের কল্পনা করতে যাবে না; এখন তোমার ঐ ধ্যেয়বস্তু মেষশাবককেই ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করবে। কিন্তু তার আগে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করতে শিখতে হবে। প্রথমে আসন দ্বারা বায়ুকে নিরুদ্ধ করে অগ্নিস্থানে নিয়ে যাবে। তারপর অগ্নির সঙ্গে বায়ুকে বুদ্ধিদ্বারা নাভিমণ্ডলে ও পরে ভ্রূযুগল মধ্যে অথবা ব্যোম নামক হৃদয়াকাশস্থানে নিরুদ্ধ করবে।

গুরুদেব নির্দেশিত এই পদ্ধতি অনুসারে আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বছর সাধনা করলাম সেই গুহার মধ্যে। সেই অন্ধকার গুহা হতে আমি একটিবারের জন্য বাইরে আসি নাই। এমন কি আসন থেকেও উঠি নাই। গুরুদেব আহার্য যা নিজের হাতে দিয়ে এসেছেন তাই খেয়েছি।

তারপর একদিন গুরুদেব আমায় ডাক দিলেন। আমার তখন ঘোর ভাঙ্গল। মনো হলো আমি সত্যিই মেষে পরিণত হয়ে গিয়েছি। মানুষের মত কথা বলতে পারছি না আমি। কথা বলতে গেলেই মেষের কণ্ঠ নির্গত হচ্ছে। গুহার বাইরে আসতে গেলেই মস্তকোপরি উদ্ভূত মেষশৃঙ্গে ব্যাহত হচ্ছে আমার গতি। আমি গুরুদেবকে সবকথা জগাতেই তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, তাহলে এবার সত্যি সত্যিই তুই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিস।

এই বলে গুরুদেব আমার হাত ধরে আমায় বাইরে নিয়ে আসতেই আমি আবার মানুষের মতো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে লাগ-লাম। তারপরই গুরুর আদেশে আমি সেখান থেকে মানস

সরোবরের পথে চলে যাই। তিনি বললেন, আমার কাছে তোর কাজ হয়ে গেছে। এবার তোকে অন্যত্র যেতে হবে।

এইভাবে সেদিন নবীনচন্দ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বুঝিয়ে দিলেন, সর্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞানই বুদ্ধ প্রচারিত অহিংসা মৈত্রী ও করুণার মহত্তর উপলব্ধির গভীরে কত সহজে নিয়ে গেছে তাঁকে।

তখন আসামের সর্বত্র ও পাতকই নাগা ও লুসাই পাহাড়ের সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চলে কালাজ্বর ও বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ খুব বেশী ছিল। একবার সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুই একজনের ভয়ঙ্কর কালাজ্বর হতে বিশেষ বিচলিত হয়ে ওঠেন নবীনচন্দ্র। কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যখন হা হুতাশ করতে লাগলেন, তিনি তখন কয়েকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় বুনো গাছগাছড়া হতে এক আশ্চর্য ওষধি আবিস্কার করলেন। সেই ওষধি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীদের কালাজ্বর একেবারে সেরে গেল। তারপর থেকে কত অজানা গাছের শিকড় ও কত অবহেলিত আগাছার ছাল পাতা প্রভৃতির আশ্চর্য গুণে কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছেন এবং কত মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মদেশে গিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও প্যাগোডায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নবীনচন্দ্র। প্রথমে মান্দালয়। তারপর রেঙ্গুন। তারপর মৌলমেন। যেখানেই যান সেখানকার পরিবেশ ও মানুষের প্রতি এক নূতন আগ্রহ অনুভব করেন তিনি। সন্ন্যাসী হিসাবে কোন বিশেষ বস্তু ব্যক্তি বা স্থানের প্রতি তাঁর আসক্তি বা মায়া থাকা উচিত নয়। নবীনচন্দ্রেরও সে আসক্তি কোনদিনই ছিল না। ব্রহ্মদেশ যাবার পথে তিনি আসামের প্রান্তভাগকে ছুঁয়ে গেছেন। তবু একবার বাড়ী ফিরে যাননি। কিন্তু যে কোন বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের লীলাকে প্রত্যক্ষ করবার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর এবং অদ্বৈত চেতনার দ্বারা মনটি তাঁর এমনি বিধৃত

ছিল যে কোথাও কোন অশান্তি অনুভব করতেন না তিনি। পরিচিত অপরিচিত, আপন পর বলে কোন ভেদজ্ঞান ছিল না তাঁর।

ব্রহ্মের অভেদত্ব বোঝবার জন্য একটি পদ রচনা করেন নবীনচন্দ্র,

সেই পরমাত্মা তুমি, নহ তুমি দেহমন
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ।
ঘটাদিতে ব্যোম মত মায়িক উপাধি যোগে
আত্ম আত্মেতর ব্যবচ্ছেদ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ একাধারে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই-ই। তিনি দেহও নন, মনও নন। আকাশ নিরবয়ব; তার কোন রূপ নাই; ঘটাদির মাধ্যমেই তার প্রকাশ। ব্রহ্ম তেমনি মায়িক অর্থেই প্রকাশমান। মায়িক উপাদি সহযোগে তাঁকে দেখলেই আত্মা-অনাত্মা বস্তু-অবস্তু প্রভৃতি ভেদজ্ঞান হয়।

এই সময় সারা ব্রহ্মদেশে ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বেড়ান নবীনচন্দ্র। তাঁর বেদান্ত মতের প্রচার ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ভাল চোখে দেখননি। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, নবীনচন্দ্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মঠে বাস করলেও এবং মুখে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও যোগসাধনার প্রশংসা করলেও আসলে তিনি বৈদান্তিক এবং বৌদ্ধমতের উপর বেদান্তমতের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী।

যে সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নবীনচন্দ্র ব্রহ্মদেশে এসেছিলেন এবং যাঁদের কাছে এতদিন ছিলেন তাঁরা অন্যান্য বৌদ্ধ সংঘ পরিচালক ও মঠাধ্যক্ষদের নির্দেশে তাঁকে আর তাঁদের সঙ্গে থাকতে দিতে চাইলেন না।

নবীনচন্দ্র মঠ ত্যাগ করে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে দেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ছোট ছোট ধর্মসভা আহ্বান করে সবাইকে, বিশেষ করে বৌদ্ধদের লক্ষ্যকরে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, তপস্যা, যথার্থ জ্ঞান ও নিত্য ব্রহ্মচর্য দ্বারা

নির্মলচিত্ত সাধকগণ যাঁকে দর্শন করেন সেই আত্মা হচ্ছে জ্যোতির্ময় ও স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব। আত্মার এই জ্যোতির্ময় স্বরূপকে জানতে পারাই মানে বোধি লাভ করা। এই আত্মার স্বরূপকে জানতে পারলে পার্থিব অপার্থিব আর কোন বস্তুই অজ্ঞাত থাকে না। এই আত্মার স্বরূপ জানতে না পারলে ভেদজ্ঞান দূর হবে না এবং তার ফলে সর্বভূতে মমতা ও করুণা প্রদর্শন সম্ভব হবে না।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ক্রমেই ভুল বুঝতে লাগল নবীনচন্দ্রকে। তাঁকে ভয় করত তারা। সামনে এসে যুক্তিতে পেরে উঠত না তারা। অথচ সাধারণ মানুষ তাঁকে খুবই ভালবাসত। কারো কঠিন ব্যাধি হলেই ছুটে আসত তাঁর কাছে। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন তিনি। সুতরাং কোন অসুবিধা হত না তাঁর সেখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশতে।

তবু নবীনচন্দ্র স্থির করে ফেললেন, ভারতে ফিরে যাবেন তিনি। অন্য কারণে নয়, অনেকদিন এসেছেন এবং যে জন্য তিনি এসেছিলেন সে কারণ অনেকখানি সিদ্ধ হয়েছে, এই কথা ভেবেই তিনি এ-সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু তাঁর ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার কিছু আগে একবার সেখানকার বৌদ্ধরা সম্মিলিতভাবে একটি ধর্মসভার আহ্বান করে তর্কযুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুরোধ করে নবীনচন্দ্রকে।

কিন্তু ইরাবতী নদীর ধারে মুক্ত আকাশের তলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় নবীনচন্দ্র যা বলেন, তা শুনে স্তব্ধ হয়ে যান উপস্থিত বৌদ্ধরা। কোন পাল্টা যুক্তি খুঁজে না পেয়ে নীরব পরাজয়ে মাথা নত করে বসে থাকেন সকলে।

নবীনচন্দ্র সেখানে প্রথমে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা সকলে মিলে ভগবান বুদ্ধকে যতখানি শ্রদ্ধা করেন, আমি একা ঠিক তাঁকে ততখানি শ্রদ্ধা করি। আমার

ধৃষ্টতা আপনারা মাপ করবেন। কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস। তাই এখানে কোন কিছু বলবার আগে ভগবান বুদ্ধের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। যে বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠানের ভয়াবহতা হতে বহু ধর্মভীরু মানুষকে মুক্ত করেছিলেন তাঁকে প্রণাম। যে বুদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ মানবজগৎ হতে জীব জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তাঁকে প্রণাম। যে বুদ্ধ অপূর্ব যোগসাধনার দ্বারা বায়ুর মত সহজ গতিশীলতায় নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন সর্ব চরাচরে, করুণার বিগলিত প্রবাহরূপে যিনি সহজ তরলতায় প্লাবিত করেছিলেন সমগ্র বিশ্বজগৎকে সেই পরমযোগী বিশাত্মবাদী বুদ্ধকে শতকোটি প্রণাম।

নবীনচন্দ্র আরও বললেন, ভগবান বুদ্ধ বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এসব কথা কখনো উচ্চারণ করেন নাই তা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি অনাত্মবাদী একথা আমি কোনমতেই স্বীকার করব না। বিশ্বের সর্বভূতে এক অখণ্ড আত্মাকে বিচিত্ররূপে লীলায়িত না দেখলে কখনই তিনি বিশ্বকে ভালবাসতে পারতেন না এমন করে। আমি কয়েক বছর আগে এখানে আসবার সময় নাগা পাহাড়ের দুর্গম অরণ্য পথে একটি বাঘকে ভালবেসে বশীভূত করেছিলাম এবং আমার সঙ্গীদের বলেছিলাম আমি ঐ বাঘের মধ্যে ব্রহ্মের লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রহ্মের কথা ছেড়ে দিন ; কিন্তু কোন জীবকেই আপনার নিজের মত করে ভালবাসতে পারবেন না, যদি না তার মধ্যে আপন আত্মাকে প্রসারিত দেখেন। এ-কথা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না।

আত্মার কোনরূপ অনিশ্চয়তার অবকাশ নাই। এই আত্মাকে নমস্কার করে বশিষ্ঠদেব বলেছিলেন,

সর্বভূতান্তরস্থায় নিত্য শুদ্ধ চিদাত্মনে
প্রত্যেকচৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমোনম।

সর্বভূতের অন্তরস্থিত নিত্যশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ও আন্তরচৈতন্যরূপ

যে আমি সেই আমাকে নমস্কার। আত্মা হচ্ছে ব্যাপক; একাধারে ব্যাক্তিগত ও বিশ্বগত। আত্মা হচ্ছে ব্যাপকচৈতন্য বা জ্ঞানাধিকরণ। যা সকল স্থানে ব্যাপ্ত, যা সকল দ্রব্যকে ধারণ করেছে এবং সকল বিষয়কে গ্রাস করেছে তাই আত্মা।

এই আত্মাকে ছাড়িয়ে বা এড়িয়ে কোথাও যাবার বা কিছু করবার উপায় নাই। এইজন্য শংকরাচার্য বলেছিলেন,

কিং করোমি কঃ গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥

আমি কি করব, কোথায় যাব, কী গ্রহণ করব, ত্যাগ করবই বা কি। আত্মার বাইরে ত কোন কিছুই নাই। সবখানেই সব কিছুতেই যে আমিই ছড়িয়ে রয়েছি। মহাপ্রলয়কালে অনন্ত জলরাশির ধারা সমগ্র জগৎ যেমন প্লাবিত ছিল এই আত্মা .তমনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে।

এই আত্মার সামগ্রিক অখণ্ড রূপই হলো পরমাত্মা। বস্তুসত্যের চূড়ান্ত ও পরিণত রূপ হলো ব্রহ্ম। আপনাদের বোধিই হলো বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান। বুদ্ধ মানে পরম জ্ঞানী; তিনিই বেদান্তের পরমহংস বা সোহং স্বামী যিনি নিজের আত্মার মত করে সমগ্র জগৎ-সাংসারকে দেখতে পেয়েছেন। আসলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ শুধু ভাষাগত, সত্যগত নয়। কিন্তু ভাষা ত আর সত্য নয়। কোন না কোন সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যই প্রতীক অর্থে আমরা ভাষা ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ নিয়ে বিরোধের কোন অর্থ হয় না। আমরা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শব্দ দ্বারা যে সত্যাদর্শকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আপনাদের বিশ্বাত্মবাদের সঙ্গে তার খুব একটা পার্থক্য নাই।

বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন মাতা যেমন প্রাণ দিয়েও পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমান দয়াভাব জন্মাবে। উর্ধ্বদিকে, অধোদিকে,

চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য. হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমান দয়াভাব পোষণ করবে। কি দাঁড়াতে, কি চলতে, কি বসতে, যতক্ষণ নিদ্রিত না হবে এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে।

একেই বলে ব্রহ্মবিহার। ভগবান বুদ্ধের এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা ও মৈত্রীই হলো ব্রহ্মবিহার। বিশ্বের আত্মাকে না জানলে কখনই তা সম্ভব নয়।

সেদিন নবীনচন্দ্রের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় উপস্থিত :বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। অনেকেই অনুতপ্ত হন তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণের জন্য। কিন্তু নবীনচন্দ্র বেশী দিন আর থাকেন নাই ব্রহ্মদেশে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার ভারবর্ষে চলে আসেন।

তখন সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। যদিও জাগতিক যে কোন সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকাই তাঁর ধর্ম তথাপি দেশব্যাপী নরহত্যার ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে ব্যথাহত না হয়ে পারলেন না। যদিও কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপ তিনি সমর্থন করতে পারেন না সাধক হিসাবে, যদিও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব দেশের মানুষই সমান তাঁর কাছে, তবু দেশবাসীর দুঃখে কাতর হয়ে উঠল তাঁর প্রাণ। প্রথমে আসাম থেকে বিহারে এলেন ; তারপর বিহার থেকে কানপুরের পথে এগিয়ে চললেন নবীনচন্দ্র।

কানপুরের কাছে গিয়ে দেখলেন, চারিদিকে একটা থম থমে ভাব। সমস্ত মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত। আরও দেখা গেল, সহরের মধ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য তাদের একজন সেনাপতির নেতৃত্বে পথচারীদের মধ্য হতে বেছে বেছে বলিষ্ঠ যুবকদের কাউকে মারছে কাউকে ধরছে। অনেক সময় বাড়ীর ভিতর থেকেও যুবকদের টেনে আনছে।

নবীনচন্দ্র নির্ভয়ে সোজা সেনাপতির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন। বললেন, যারা তোমাদের মেরেছে বা ক্ষতি করেছে তাদের তুমি মারতে পার, কিন্তু যারা কোন দোষ করে নাই তাদের বিনা দোষে কেন এমন করে শাস্তি দিচ্ছ?

ইংরেজ সেনাপতি সম্প্রতি দেশ থেকে বিদ্রোহ দমন করতে এসেছে। নবীনচন্দ্রের তিব্বতীয় ভাষা বুঝতে পারল না। প্রথম টায় সাহেব অত্যন্ত রেগে গেল। কিন্তু সৌম্যদর্শন গৈরিক বসন কন্থা করঙ্গবাহী এই সন্ন্যাসীর আপাদ মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার কিছুটা নরম হলো। সন্ন্যাসীর সমগ্র চেহারাটি যেন সত্য সত্যই অহিংসা মৈত্রী ও প্রীতির মূর্ত প্রতীক। তবে সাময়িক ভাবে মুহুর্তের জন্য সামান্য কিছু বিচলিত হলেও পরক্ষণেই সরকারী কর্তব্য বোধের কঠোরতা ও পেশাগত স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা আবার জেগে উঠল তার মনের মধ্যে। সাহেব তাই কড়া গলায় নবীনচন্দ্রকে কিছু কাঁচা হিন্দি কিছু ইংরিজি মিশিয়ে বলল, কেন শাস্তি দিচ্ছি তোমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? তুমি কে?

তিনি একজন ভারতীয় একথা বললে তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হতে পারে এজন্য নবীনচন্দ্র বললেন, আমি একজন তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ থেকে আসছি। আমি তোমাকে নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচারের জন্য যে প্রশ্ন করেছিলাম তার কৈফিয়ৎ আমি চাইনি, সে কৈফিয়ৎ দাও তুমি তোমার নিজের আত্মার কাছে।

কথাগুলি নবীনচন্দ্র বললেন, বিশুদ্ধ ইংরিজিতে। তখনকার দিনে ইংরিজি শিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভংঙ্গিতে কোন ভারতীয়কে কথা বলতে শোনেনি সাহেবরা। তাই তারা অতিশয় আশ্চর্যবোধ করল। গোরা সৈন্যদের কেউ কাছে না এলেও দুচার জন ভীড় করতে লাগল আশে পাশে। এই

আশ্চর্য সাধুর প্রতি অন্ন বিস্তর কৌতূহলী হয়ে উঠল সকলেই।

সেনাপতি বলল, তুমি তিব্বতীয় সন্ন্যাসী ইংরিজি জানলে কি করে?

নবীনচন্দ্র বললেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে আমি তার সঙ্গে ঠিক সেই ভাষাতেই কথা বলতে পারি।

সাহেবরা সকলে আবার অবাক হলো বিস্ময়ে। যাদুবিদ্যার কথা তারা শুনেছে। কিন্তু স্বচক্ষে এমন যাদু জীবনে কখনো দেখেনি তারা। সেনাপতি তবু অত সহজে হার মানবার লোক নয়। তাই জোর গলায় নবীনচন্দ্রকে বলল, তুমি আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছ, তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব।

নবীনচন্দ্র শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমকে নিয়ে যেতে হবে না আমি নিজেই যাব তোমাদের বড় কর্তার কাছে। প্রতিবাদ করব তোমাদের এই আচরণের। কিন্তু যাদের অন্যায়ভাবে ধরেছ তাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে হবে। এদের সকলের মুক্তির বিনিময়ে আমি সেচ্ছায় বন্দীত্ব মেনে নেব।

সেনাপতি বলল ভ্রূকুটি করে, আমি তোমার কথামত যদি কাজ না করি।

নবীনচন্দ্র একটুখানি মৃদু হাসলেন, তিনি ভাবলেন এবার যদি তেমনি করে তাঁর নির্মল অন্তর আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে, নিশ্বাসে ঝড় বয়, কোনরূপ চাঞ্চল্যের ঢেউ জাগে তাঁর নিস্তরঙ্গ রক্ত শিরায়, তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণবায়ুর উদ্ধত উচ্ছাস এত-গুলি জীবনের বিকৃত উৎসাহ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে, যেমন করে বহুদিন আগে লক্ষ্ণৌএর কাছে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল চব্বিশটি মানুষের প্রাণ। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন নবীনচন্দ্র। কোনরূপ বিকার জাগতে দিলেন না তাঁর নির্বিকার মনে।

নবীনচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন। তুমি তোমার আত্মাকে চেন না

বলেই আত্মার কি অসীম শক্তি তা তুমি জান না সাহেব। একবার সেই শক্তি যদি জাগে আমার মধ্যে তাহলে তাই দিয়ে তোমাদের সমস্ত শক্তিকে বিকল করে দিতে পারি এক মুহূর্তে।

কিন্তু মুখের কথায় বিশ্বাস করতে চাইল না। আত্মার এই আশ্চর্য শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখতে চাইল সাহেব।

নবীনচন্দ্র তখন তাদের প্রানে না মেরে একটা ভাল রকমের শিক্ষা দিতে চাইলেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমার যা খুসি করো।

সেনাপতি সাহেব তখন তাঁর সৈন্যদের সমস্ত বন্দীদের নিয়ে জোর করে কানপুর জেলের দিকে এগিয়ে যাবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু সৈন্যরা এক পা এগোতে না এগোতেই সব বন্দুকগুলি আপনা হতে পড়ে গেল তাদের হাত থেকে। অনেক চেষ্টা করেও বন্দুকগুলি তারা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে পারল না। শুধু তাই নয়, সৈন্যরা সকলে অস্বাভাবিক রকমের নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদের মনে হলো চলা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা টুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছে। সেনাপতি বার বার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে চলতে পারল না।

সেনাপতি সাহেব তখন নবীনচন্দ্রকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে ইংরিজিতে বলল, তোমার যাদু থামাও; তুমি আমার সৈন্যদের সব ঠিক করে দাও। আমি তোমার কথা মেনে নেব; আমি ওদের ছেড়ে দেব। তবে ওরা যাতে আবার বিদ্রোহ না করে তার জন্য তোমায় দায়ী থাকতে হবে।

সাহেব সৈন্যরা সবাইকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা চলে যেতেই উপস্থিত জনতা নবীনচন্দ্রের জয়ধ্বনি করতে লাগল। এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। এবার তারা এসে ঘিরে ধরল তাঁকে।

- নবীনচন্দ্র সাহেবদের কাছে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরূপে নিজের পরিচয় দেয়ায় তাঁকে তিব্বতীবাবা বলতে লাগল সকলে।

কিন্তু নিজেই জেলখানার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিব্বতী বাবা। তিনি বললেন, সাহেবরা আমায় না ধরলেও আমি নিজে গিয়ে ধরা দেব। আমি জেলখানায় গিয়ে দেখব কি ভাবে অজস্র মানুষ সেখানে রয়েছে। তাছাড়া এভাবে যাতে সৈন্যরা সাধারণ শান্তিপ্রিয় মনুষ্যের উপর অত্যাচার না করে তার জন্য বড় সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

কানপুরে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিযুক্ত অফিসারের কাছে গিয়ে সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলতেই অফিসার রেগে গিয়ে তিব্বতী বাবাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন। কোন বাধা দিলেন না বা কোন প্রতিবাদ করলেন না তিনি।

তিনি সেচ্ছায় কারাবরণ করলেও সেনাপতি সাহেব তার বড় কর্তাকে বুঝিয়ে বলে মুক্ত করে দিল তিব্বতীবাবাকে। জেলে গিয়ে বহু মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ও সাহস সঞ্চার করেছিলেন তাদের মনে।

কানপুর থেকে তিব্বতীবাবা গেলেন গুজরাটে। একটি উষর প্রান্তরে একা একা থাকতেন। কানপুর থেকেই কয়েকজন ভক্ত তিব্বতী বাবার সঙ্গ নিয়েছিল। কিন্তু কাউকে স্থায়ী ভাবে কাছে নিলেন না তিব্বতীবাবা ; দীক্ষাও দিলেন না কাউকে। শুধু দুজনকে বললেন, তোমরা দিন কতকের জন্য আমার কাছে থাকতে পার। আমিও বেশীদিন এখানে থাকব না। এর পর আমি উত্তর পশ্চিম সীমান্তে চলে যাব।

এই সময় তিব্বতীবাবা প্রায়ই ধ্যান তন্ময় অবস্থায় থাকতেন। এক এক সময় এই রকম তন্ময় অবস্থায় দু তিনদিন কেটে যেত। পরণে কৌপীনটুকুও থাকত না। খবর পেয়ে অনেক ভক্তের

দল তাঁকে দর্শন করবার জন্য ছুটে আসত দূর দূরান্ত থেকে। গুজ-রাটের লোকে তাঁকে বলত নেংটাবাবা।

লোকের মুখে একথা শুনে তিব্বতী বাবা ভক্তদের বলতেন, যার যা খুসি আমায় সেই নামেই ডাকুক। যে যেই নামেই ডাকুক সেই আমি ত এক এবং অদ্বিতীয়। নামভেদে বস্তু স্বরূপ কখনো ভিন্ন হয় না। আমাদের ব্রহ্মও তেমনি এক এবং অদ্বিতীয়। যে যেভাবে বা যে নামেই ডাকুক না কেন তাঁর দ্বিত্ব নাই।

এক একসময় ধ্যানভঙ্গের পরও সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে কৌপীন বা পরিধেয় গৈরিক বসন নিয়ে এলে তিব্বতীবাবা বলতেন, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তোরা এখনো লজ্জা ত্যাগ করতে পারিস নাই। আমার কিন্তু আর কোন লজ্জা ভয় বলে কোন জিনিষ নাই।

ভক্তদের শিক্ষা দেবার জন্য আরো বুঝিয়ে বলতেন সহজ করে। কি করে লজ্জা ভয় ত্যাগ করতে হয় জানিস? আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক জ্ঞান করা। আত্মচৈতন্যকে আমরা দেহের উপর আরোপ করি বলেই লজ্জা ভয় আনন্দ বেদনা প্রভৃতি সংবেদন সৃষ্ট হয়। কিন্তু দেহকে অনাত্মা জড়বস্তু ভেবে আত্মচৈতন্যকে তার উপর হতে সরিয়ে নিলেই দেখবি সুখ দুঃখ লজ্জা ঘৃণা ভয় সব কিছুর উর্ধ্বে সব কিছুর অতীত এক স্তরে চলে গিয়েছিস।

তিব্বতীবাবা গুজরাট ত্যাগের দিন স্থির করতে ভক্তরা তাঁর আসন্ন বিরহে কাতর হয়ে উঠল। তারা আব্দার করে বলল আমাদের ফেলে আপনার যাওয়া হবে না। আপনি যেখানে যাবেন আমরাও যাব। আপনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষ; এক জায়গায় বসে আপন আত্মার মধ্যেই জগৎসর্বস্ব দেখতে পান। আপনার বিভিন্ন জায়গা ঘুরবার কোন প্রয়োজন নাই।

তিব্বতীবাবা শান্তকণ্ঠে বললেন, সব জানি তবু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিচিত্র বস্তু ও মানুষের মধ্যে সেই এক ব্রহ্মের লীলাকে

প্রত্যক্ষ করতে বড় ভাল লাগে আমার। ওখান থেকে এসে একবার দক্ষিণ ভারত যাব। তারপর বাংলা দেশ।

ভক্তদের অনুরোধে আরো কিছুদিন গুজরাটে রয়ে গেলেন তিব্বতীবাবা। তবে সেই উষর প্রান্তর হতে আস্তানা গুটিয়ে বনের ভিতরে চলে গেলেন।

একদিন ভক্তরা সেই বনের মধ্যে ককটি অলৌকিক দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সেদিন দুপুরবেলায় তারা নিকটবর্তী একটি নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল দুজনে। ফিরে এসে দেখে, একটি গাছের তলায় তিব্বতীবাবা পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন আর একটি বিসধর গোখরো সাপ তাঁর হাতে ও গলায় জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখের সামনে ফণাটি ধরে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন মহাযোগী মহাদেব নিথর নিশ্চল অবস্থায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

দৃশ্যটি দেখে তারা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। কি করবে কিছু ভেবে পেলনা। চীৎকার করে তিব্বতীবাবার ধ্যান ভাঙ্গাবারও সাহস হলো না। অগত্যা চুপকরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দূর থেকে।

এইভাবে সাপটি প্রায় এক ঘণ্টা থাকবার পর তিব্বতীবাবার দেহটিকে ছেড়ে দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে বনের মধ্যে চলে গেল। তিব্বতীবাবার ধ্যান ভাঙ্গল আরো বহুক্ষণ পর। ভক্তরা তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি হেসে সহজ রসিকতার সুরে বললেন, তব্‌ত হম যোগীরাজ আশুতোষ বন গয়া।

ভক্তরা ভাবল তিব্বীবাবা রসিকতা করছেন তাদের কথা। তাই তারা আরো বেশী গুরুত্ব দিয়ে বলল, হ্যাঁ বাবা, আমরা নিজের চোখে দেখেছি। একঘণ্টা ধরে সাপটা আপনার ঘাড়ে বসে ছিল, তারপর চলে গেল।

তিব্বতীবাবা তখন বললেন সত্যই বলছি, সাপ এক দিক দিয়ে

পরম যোগী। সাপ বহুক্ষণ নিশ্বাস ধরে রাখতে পারে। এমনিতেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব কম পড়ে ওদের। যে প্রাণবায়ু ধারণ ও সংযম কত আয়াস ও অভ্যাসের দ্বারা করে থাকি, সাপ তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে অনায়াসই তা করে থাকে। এই জন্যই মহাযোগী মহেশ্বর এত জীবের মধ্যে সাপকেই ভূষণরূপে বেছে নিয়েছেন। নিষ্প্রাণবৎ নিশ্চল কোন জীবের ক্ষতি করে না ওরা। গভীর যোগনিদ্রার পক্ষে একান্ত অনুকুল হচ্ছে এই সাপ।

তিব্বতীবাবা আরো বললেন, পাদাঙ্গুষ্ঠ হত মস্তকের উর্ধ্ব পর্যন্ত সমস্ত শরীরে জলপূর্ণ কুম্ভের মত বুদ্ধির দ্বারা প্রাণবায়ুকে ধারণ করার নামই হচ্ছে প্রকৃত প্রাণায়াম। এই বায়ুকে আবার প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্র পরে ললাট ও ভ্রূযুগলের মধ্যে নিরোধ করতে হয়। এ বড় কঠিন কাজ। যখন দেখবে সাপ তোমার ধ্যানমগ্ন দেহের উপর চলে যাচ্ছে অথচ তুমি বুঝতে পারছ না তখন জানবে এই ধরণের যোগসাধনা সম্ভব তোমার পক্ষে।

এই সময় দিনের বেলায় একটু অবকাশ পেলেই তিব্বতীবাবা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ওষুধের বিভিন্ন গাছ গাছড়ার সন্ধান করতেন।

একদিন একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন আপনার বয়স কত?

তিব্বতীবাবা বললেন, আমার নিজের বয়স কত আমি ত জানি না। তবে যোগসাধনা নিয়মিত করার ফলে কোন রোগ-যন্ত্রণা কোনদিন অনুভব করি নাই আমি।

ভক্তরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা কি করে সম্ভব বাবা! দেহ ধারণ করলেই ত নানা রকমের আধি ব্যাধিতে ভুগতে হয় জীবকে।

তিব্বতীবাবা বললেন, দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যোগ ও মোক্ষ সাধনের হেতুভূত শরীর মধ্যে আঠারোটি মর্মস্থানের উল্লেখ করেছেন। জংঘা নাভি, কণ্ঠকূপ,মূর্ধা প্রভৃতি এই সব মর্মস্থানের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে। এই সব মর্মস্থানে একান্ত মনে প্রাণবায়ুকে

ধারণ করে পরে একস্থান হতে অন্য স্থানে সেই বায়ু সঞ্চারিত করে দেয়াকেও এক রকমের প্রত্যাহার বলে। অষ্টযোগের একটি হচ্ছে প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার অবশ্য আরো দুই রকমের আছে, যেমন বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করা, আর বাইরের প্রত্যক্ষ বস্তুকে দেহের মধ্যে আত্ম স্বরূপে দর্শন করা। কিন্তু যিনি ওই প্রাণ বায়ু যম ও নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার অভ্যাস করে থাকেন তাঁর সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং তাঁর যোগসিদ্ধিও সহজে হয়।

দিনকতক পরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে রওনা হলেন নবীনচন্দ্র। কত পাহাড় অরণ্য পার হয়ে রাজপুতানার বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে গিয়ে পড়লেন। দুজন ভক্ত শিষ্য সঙ্গে আসছিল। মরুভূমিতে পা দিয়েই তিব্বতীবাবা তাদের চলে যেতে বললেন। রাজপুতানার মরুভূমির পর সিন্ধুদেশের মরুভূমি। ভক্তরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করল, প্রখর সূর্যকিরণও চারিদিকের তপ্ত বালিরাশির মাঝখানেও তিব্বতীবাবার দেহটি সবসময় শীতল থাকত। যেতে যেতে তিনি যেখানে দাঁড়াতেন, সেইখানেই তপ্ত বালির উপর এক শীতল ছায়া পড়ত। ভক্তরা আশ্চর্যের সঙ্গে আরো দেখল, একদিন তিব্বতীবাবা বিশাল সিন্ধুনদ অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেলেন।

কিন্তু সমতল ছেড়ে পাহাড়ের চড়াই উৎতারই-এর পথ ধরতেই শিষ্য দুজনকে তখনকার মত বিদায় দিলেন।

এ এক অদ্ভূত দেশ। এখানে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বড় রুক্ষ আর নীরস। কোথাও কোন গাছপালা বা তৃণ শস্য চোখে পড়ে না। কিন্তু সেখানে যা কিছু দেখছেন সব কিছুই ভাল লাগছে তিব্বতীবাবার! সব কিছুই সেই লীলাময় ব্রহ্মের প্রকাশ। সেই একই ব্রহ্ম বিচিত্র রূপে বিভিন্ন বস্তুতে রূপায়িত। তিনি প্রস্তরে কঠিন, জলে তরল, অরণ্যে অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল, প্রান্তরে অবারিত।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হতে তিব্বতীবাবা গেলেন কাবুলে। এখানকার মানুষদের দেখলে মনে হয় দেহের দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু এদের দেখে তিব্বতীবাবার দুঃখ হলো, এদের দেহ এত উন্নত, কিন্তু আত্মার কথা এরা একবারও ভাবে না। দেহগত পূর্ণতার অন্তরালে এক শোচনীয় আত্মিক দীনতাকে ঢেকে রেখেছে যেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু করে কাবুল পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড জুড়ে এক উৎকট দারিদ্র্যের ছাপ দেখতে পেলেন তিব্বতীবাবা। কৃষিযোগ্য ভূমির স্বল্পতার জন্য এ অঞ্চলে বড় অন্নাভাব। চুরি, ডাকাতি রাহাজানি লেগেই আছে। তার উপর বৃটিশ রাজশক্তি এই বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বশে আনতে না পেরে বার বার আক্রমণ হানছে।

পেশোয়ারের কাছে একটি পাহাড়ের পথে একটি মৃত লোককে পনরুজ্জীবিত করেন তিব্বতীবাবা। ও অঞ্চলে পাহাড়ে এক ধরণের সরু ও ছোট আকারের বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। কোন পথিককে সে সাপে কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য। এইভাবে কেউ মারা গেলে পাহাড়ের মধ্যেই এক জায়গায় তার মৃতদেহটিকে কতকগুলি পাথরের চাপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

একদিন একদল পথিকের মধ্যে একজন এইভাবে সর্প দংশনে মারা গেলে তার মৃতদেহটি পাথরের মধ্যে ঢেকে রাখা হচ্ছিল। এমন সময় তিব্বতীবাবা সেখানে উপস্থিত হয়ে সব কথা শুনে তাকে কবর দিতে নিষেধ করলেন। তারপর তাঁর একটি ঝুলি থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য গাছের শিকড় জলে ভিজিয়ে একটি পাথরের টুকরো দিয়ে থেঁতো করে মৃত লোকটির ক্ষত স্থানে নাকে ও মুখের ভিতর তার রস ঢেলে দিলেন যতদূর সম্ভব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ চাইল লোকটি। আশ্চর্য হয়ে পথিক দলের সবাই লুটিয়ে পড়ল তিব্বতীবাবার পায়ে। তারা নিজেদের

ভাষায় বলল, আমরা মুসলমান ; তুমি হিন্দু বা বৌদ্ধ যেই হও না কেন, আজ হতে আমরা হলাম তোমার ভক্ত। তোমার দাসানুদাস তুমি যা বলবে তাই করব।

তিব্বতীবাবা বললেন, সৎপথে থেকে সংসার ধর্ম পালন করবে। নিজের মতন করে এই বিশ্বের সকল জীবকে ভালবাসবে—এই উপদেশ ছাড়া আমার অন্য মন্ত্র নাই।

কাবুলেও বেশ কিছুদিন ছিলেন তিব্বতীবাবা। সেখানে নির্ভীক নির্বিকার ও সদানন্দময়ভাবে সব সময় ঘুরে বেড়াতেন বলে লোকে তাঁকে পাগলাবাবা বলত।

কাবুল থেকে আসবার সময় নৈনিতালে কিছুদিন থাকেন তিব্বতীবাবা। সেখানেও একটি লোককে দুরারোধ্য ব্যাধির কবল থেকে বাঁচান বলে সেখানকার লোকে তাঁর নাম দেয় মৃত্যুঞ্জয়বাবা।

নৈনিতাল থেকে হৃষিকেশ হয়ে নেপাল চলে গেলেন। এই সময় দেহটি বড় জীর্ণ হয়ে ওঠে তিব্বতীবাবার। দুশো পূর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগেই। অথচ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ এবং তাঁর যোগসাধন পদ্ধতি যোগ্য ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে প্রচারের জন্য আরো কিছুকাল তাঁর এই মরদেহটিকে টিকিয়ে রাখা দরকার।

একদিন সহসা একটি সুযোগ মিলে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। এ সুযোগ কিন্তু বড় অদ্ভুত লাগল তিব্বতীবাবার নিজের কাছেই। একদিন একটি দুর্গম পার্বত্য পথে যেতে যেতে দেখলেন, একটি গুহার কাছে কোন এক বলিষ্ঠ তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সবেমাত্র অকালে মরদেহ ত্যাগ করেছে। সহসা অদ্ভুত একটা খেয়াল চাপল তিব্বতীবাবার মাথায়। মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ যদি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত আত্মার এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করা হয়, তাহলে তিনি কেন তাঁর জীর্ণ অপটু দেহটি ত্যাগ করে এই বলিষ্ঠ মৃতদেহটি ধারণ

করতে পারবেন না? আত্মাকে ত তিনি এর আগেই ইচ্ছামত শরীর থেকে একেবারে বিভিন্ন করে নিতে শিখেছেন।

কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ। সাধকের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। একমাত্র শংকরাচার্য বহুকাল আগে এক মাসের জন্য কামকলা শিক্ষা করবার জন্য এক মৃত রাজার দেহ ধারণ করেছিলেন নিজের দেহ ত্যাগ করে।

নিকটস্থ নদী জলে স্নান ও তর্পণ করে ধ্যানে বসলেন তিব্বতীবাবা। ধ্যান সমাধিস্থ হয়ে নিজের আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাশের মৃতদেহটির মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। তারপর নূতন দেহ ধারণ করে পিছন ফিরে আর না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

নূতন দেহের নূতনতর এক জৈবশক্তি অনুভব করলেন তিব্বতীবাবা। তবু জন্মাবধি যে দেহটাকে অবলম্বন করে অজস্র কর্ম, চিন্তা ও সাধন ভজনের লীলাবৈচিত্র্যে ফেটে পড়েছিল তাঁর আত্মা, সে দেহটির প্রতি এক গভীর মমতা অনুভব না করে পারলেন না তিব্বতীবাবা।

নেপাল থেকে বাংলাদেশে এলেন তিব্বতীবাবা। বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগ চলেছে। তখন ঋষি অরবিন্দ এবং তাঁর যোগ্য সহোদর বারীন ঘোষের নেতৃত্বে অজস্র বাঙালী যুবক বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্য বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে।

এখানে সেখানে ঘুরবার পর কলকাতায় কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে কিছুদিন থাকেন তিব্বতীবাবা। হঠাৎ একদিন কলকাতায় একটি আশ্চর্য কথা শুনলেন। বর্ধমান শহরের অদূরে চান্না নামক অখ্যাত একটি গাঁয়ের প্রান্তে আশ্রম স্থাপন করে যতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় নামে একজন বিপ্লবী বৈদান্তিক পদ্ধতিতে যোগসাধনা করছেন। সোহং মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নাম হয়েছে

নিরালম্ব স্বামী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আর বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও তিনি বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেন। প্রয়োজন মত আশ্রয় দান করেন তাদের।

কথাটা শুনে নিরালম্ব স্বামীকে দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিব্বতীবাবা। কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করে কলকাতা সেইদিনই রওনা হলেন। স্থির করলেন, নিরালম্ব স্বামীকে দেখে ওখান থেকে দক্ষিণ ভারত যাত্রা করবেন। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের সব অংশেই তিনি ভ্রমণ করেছেন।

আশ্রমটি প্রথমে চোখে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিব্বতীবাবা। চান্না গাঁ হতে কিছুদূরে খড়োশ্বরী নদীর ধারে দিগন্তজোড়া মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটি খড়ের ছাউনিওয়ালা কুঁড়ে ঘর। সামনে পরিচ্ছন্ন এক ফালি উঠোন। চারিদিকে ফুলের গাছ।

তিব্বতীবাবা সেখানে গিয়ে দেখলেন, আজানুলম্বিত বাহু, গৌর বর্ণ, সুন্দর কান্তি, দীর্ঘ কেশ বিশিষ্ট এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় কুটিরের দাওয়ায় বসে একজন যুবককে গীতার সাখ্যযোগ বোঝাচ্ছেন।

তিব্বতীবাবার বুঝতে দেরী হলো না, ইনিই হচ্ছেন নিরালম্ব স্বামী। নিরালম্ব স্বামী বিপ্লবী যুবকটিকে তখন আত্মনিবিষ্টভাবে বল ছিলেন, যে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, যন্ত্র যাকে ছেদন করতে পারে না, আগুন দিয়ে তাকে দগ্ধ করা যায় না, জল যাকে সিক্ত করতে করতে পারে না, বাতাস যাকে শুষ্ক করতে পারে না, যে আত্মা কাউকে হনন করে না অথবা নিজে কারো দ্বারা নিহত হয় না, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাকে ধরা যায় না, চিন্তায় যাকে পাওয়া যায় না, যার মধ্যে কোন কিছুতেই বিকার সৃষ্টি করতে পারা যায় না,—সেই আত্মাকে আগে ভালভাবে জেনে তবে বিপ্লবে যোগদান করবে।

মনে রাখবে শত্রুদের আত্মার সঙ্গে তোমাদের আত্মার কোন বিরোধ নাই। কারণ আত্মা সবই এক অদ্বিতীয় এবং অভিন্ন ;

নিষ্কলুষ নিষ্পাপ নির্বিকার। শত্রুদের দেহগত যে বিকৃত জৈব চেতনা তাদের আত্মাকে আচ্ছন্ন ও অবরুদ্ধ করে তোমাদের ক্ষতি-সাধন করছে, তোমাদের উদ্দেশ্য হবে সেই চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়া। মনে রাখবে, বিকৃত জৈব চেতনার দ্বারা আত্ম-চৈতন্য আচ্ছন্ন না হলে মানুষ কখনো পাপ করে না। আত্মাকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমস্ত রকমের পাপ কর্ম হতে বিরত হয়। তাদের দেহ বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাপ ও বিকৃতি হতে মুক্ত হবে তাদের নিত্য শুদ্ধ আত্মা। এই পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই শত্রুদের নিধন করবে তোমরা।

কথা শেষ হবার পর তিব্বতীবাবার দিকে দৃষ্টিপাত হতেই চমকে উঠলেন নিরালম্ব স্বামী। মূহুর্ত মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে তিব্বতীবাবার পাদ বন্দনা করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন দান করলেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ তিব্বতীবাবাকে দর্শনমাত্র তাঁর প্রকৃত মহত্বকে উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র দেরী হলো না তাঁর। পরে তাঁর শিষ্যদের কাছে নিরালম্ব স্বামী তিব্বতীবাবা সম্পর্কে বলে-ছিলেন, শংকরাচার্যের পর এত বড় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ভারত-বর্ষে জন্মেছেন বলে মনে হয় না।

জ্ঞানমার্গের সাধনার উচ্চ স্তরে উঠে গেলেও সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে তিব্বতীবাবার কাছে আত্ম সমর্পণ করলেন নিরালম্ব স্বামী। তিব্বতীবাবাও বড় স্নেহের চোখে দেখলেন তাঁকে।

তখন বর্ষাকাল। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নাই। আকাশ জোড়া বাদল মেঘের ঘনকৃষ্ণ বিশাল ছায়া সমস্ত মাঠকে ঠেকে দিয়েছে। গৌরবর্ণা স্ফীতকায়া খড়ি নদী নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। উঠোনে গন্ধহীন লাল সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে অজস্র। জায়গাটি ঘুরে ঘুরে তিব্বতীবাবা দেখলেন ; সত্যিই বড় মনোরম।

দিনকতক নিরালম্ব স্বামীর কাছে থাকার পর দক্ষিণ ভারত যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন তিব্বতীবাবা। এই কয়দিনের

মধ্যেই নিরালম্ব স্বামীও অনেক গুহ্য যোগসাধনা শিখে নিলেন এই মহাসাধকের কাছ থেকে। একটা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিব্বতীবাবা, নিরালম্ব স্বামী কারো কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন নি। প্রাচীনকালের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকেই মনে মনে গুরু হিসাবে বরণ করে তাঁরই লিখিত উপদেশ অনুসারে যোগসাধনা করে যান। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের একটি মাটির প্রতিমূর্তিও ঘরের মধ্যে স্থাপন করেছেন তিনি।

ধর্মদাস রায় নামে চান্না গাঁয়ের এক যুবক নিরালম্ব স্বামীর আশ্রমে যাতায়াত করতেন। বাল্যকাল হতেই ধর্মের প্রতি প্রবণতা ছিল তাঁর। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই এক নিমেষে আসক্ত হয়ে পড়তেন তাঁদের প্রতি। ঘর সংসারের সব কথা ভুলে তাঁদের কাছে কাছে থাকতেই ভালবাসতেন।

তিব্বতীবাবার বিদায় নেবার সময় হতেই ধর্মদাস রায় বললেন, আমিও আপনার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত যাব। আপনার কাছে কাছে থাকব, আপনার সেবা করব।

কয়েকদিনের মধ্যেই সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে তিব্বতীবাবার মনে বেশ কিছুটা রেখাপাত করে ফেলেছেন ধর্মদাস। তাই তাঁর কাতর অনুরোধ একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না তিব্বতবাবা। নিরালম্ব স্বামীও বারবার অনুরোধ করলেন তাঁকে ধর্মদাসকে সঙ্গে নেবার জন্য। বড় বিনয়ী এবং সেবা-যত্নে পটু ধর্মদাস।

তিব্বতীবাবা ধর্মদাসকে বললেন, বাবা মার মত নিয়েছ?

ধর্মদাস উত্তর করলেন, আমার মত ছেলের বাড়ীতে থাকাও যা না থাকাও তাই। আমার দ্বারা সংসারের কোন কাজই হয় না। বাবা মা সেটা জানেন। আপনার মত সাধকের সঙ্গ লাভ করা এক পরম সৌভাগ্যের কথা বলে মনে করি। সে সৌভাগ্য হতে আমার বাবা মা কিছুতেই আমায় বঞ্চিত করবেন না আমি জানি।

তিব্বতীবাবার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লেন ধর্মদাস রায়। ছোট্ট একটি গাঁয়ের গণ্ডী পার হয়ে এক বৃহৎ জগতের মধ্যে মুক্তি লাভ করলেন তিনি। তাই তাঁর আনন্দ অন্তরে ধরে না। কত পাহাড়, প্রান্তর, অরণ্য, নদ, নদী পার হয়ে যেতে লাগলেন একে একে। যেতে যেতে বুঝতে পারলেন, পৃথিবী কত বিশাল কত বৈচিত্র্যময়। কিন্তু তাঁর আনন্দ কি শুধু পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্যকে আপন অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কারের মধ্যে? এ প্রশ্ন নিজেকে নিজে করে পরক্ষণেই তার উত্তর খুঁজে পেলেন ধর্মদাস। তাঁর আনন্দের আসল উদ্দেশ্য হলো, তিব্বতীবাবার অবিরাম সাহচর্য লাভ। এই পৃথিবীর বস্তুময় বিশালতা ও বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে আত্মা বলে একটা জিনিস আছে সেই আত্মাকে জেনেছেন তিব্বতীবাবা। শুধু আত্মাকে নয় পরমাত্মার স্বরূপকেও উপলব্ধি করেছেন আপন অন্তরের মধ্যে। সুতরাং তিব্বতীবাবাই তাঁর কাছে সব কিছুর থেকে বড়।

প্রথমে মাদ্রাজ গিয়ে উঠলেন তিব্বতীবাবা। তিব্বতীবাবা একদিন ধর্মদাসকে ডেকে বললেন, আচ্ছা ধর্মদাস, তুমি এতদিন আমার কাছে রয়েছ; আমার এত সেবা যত্ন করছ। কিন্তু সাধন ভজনের কোন কথা বল নাত। মন্ত্র-তন্ত্র শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই কি দরকার নাই তোমার?

ধর্মদাস শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন, না, ওসব আমার কিছুই দরকার নাই বাবা। আপনিই হচ্ছেন আমার কাছে সকল সাধনার সার। আমি সাধন-ভজন কিছুই জানতে চাই না। আপনাকে কাছে পেলেই সব পাওয়া হলো।

তিব্বতীবাবা আর কিছুই বললেন না। সেই দিন হতে ধর্মদাসের প্রতি স্নেহ তাঁর বেড়ে গেল আরো। এর আগে যারা তাঁর কাছে এসেছিল, তারা সবাই কিছু না কি পাবার জন্য এসেছিল। ঋদ্ধি সিদ্ধির উপায়, সাধন ভজনের পথ কত সব চেয়েছিল

তারা তাঁর কাছে। কিন্তু ধর্মদাস চায় শুধু তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে। এ এক অদ্ভুত চাওয়া। ধর্মদাসকে প্রত্যাখ্যান করবার কোন শক্তিই নাই তাঁর।

মাদ্রাজ থেকে শংকরাচার্যের জন্মস্থান দেখবার জন্য দিনকতকের জন্য কেরল যাত্রা করলেন তিব্বতীবাবা।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কেরলে প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোরম। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে যেন দেশটি উঠে এসেছে। পুরাণে তাই বলে, যোগশক্তি বলে জামদগ্ন্য পরশুরাম সমুদ্র গর্ভ হতে এ দেশের ভূমিখণ্ডকে তুলে আনেন। এ দেশের চারিদিকে শুধু খাল-বিল আর নদী-নালা। জল আর গাছপালার ভীড়। এখানকার গাছপালা যেমন কোনদিন তাদের সবুজ সজীবতা হারায় না, তেমনি ঘাসে ঢাকা মাটির উপর থেকে স্নিগ্ধচিকণ শ্যামলিমার ছোপটুকুও কখনো মুছে যায় না।

এই কেরল দেশের মধ্যেই কালাড়ি নামে ছোট্ট একটি গ্রামে বহুকাল আগে শিবগুরু নামে এক নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বাস করতেন। গাঁয়ের শেষে আছে চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দির। চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবেরই অপর নাম। এই মন্দিরেই জাগ্রত শিব লিঙ্গের বহু আরাধনা করে শিবগুরু এক সুসন্তান লাভ করেন। এই সন্তানই পরে শংকরাচার্য নামে এক মহা বৈদান্তিক পণ্ডিত ও সাধকরূপে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করে যান সমগ্র দেশে।

ঘুরে ঘুরে সব খুঁটিয়ে দেখলেন তিব্বতীবাবা যেমন একদিন দেখেছিলেন নেপালে বুদ্ধদেবের জন্ম স্থান কপিলাবস্তু নগরীতে গিয়ে। বস্তুতঃ তিব্বতীবাবা যেন ছিলেন বুদ্ধ ও শংকরাচার্যের মিলিত রূপ। দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের এক আশ্চর্য উপাদানে গড়ে উঠেছিল তাঁর মনের ধাতু।

কেরল থেকে তিব্বতীবাবা গেলেন নর্মদা নদীর তীরে শংকরাচর্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে। বহু শক্তিমান সাধকের তপস্যাপূতঃ এই

স্থান। কথিত আছে, রামায়ণের যুগে মহাতেজা বিভাণ্ডক মুনি এবং তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এইখানে তপস্যা করতেন। ঘন বনাঞ্চলে ঢাকা এই স্থানটি হতেই রাজা লোমপাদ প্রেরিত সুচতুর বারবণিতারা এসে বিভাণ্ডক মুনির অলক্ষ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। এই মনোরম পবিত্র স্থানটিকেই শংকরাচার্য একদিন বেছে নিয়ে কর্ণাটের রাজা সুধন্বার সাহায্যে এখানে এক মঠ স্থাপন করেন।

আবার মাদ্রাজে ফিরে এলেন তিব্বতীবাবা। হাজীসাহেব নামে এক মুসলমানের বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে বাস করতে লাগলেন। ধর্মদাস তাঁর কাছে থেকে সেবা করেন। তিব্বতীবাবা কথা খুব কম বলতেন। নিজের যোগবিভূতিও কথনো প্রকশ করতে চাইতেন না। কিন্তু রুগ্ন ও আর্ত মানুষের কান্না বা কাতর মিনতি কখনো অবহেলা করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, নিয়তি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল কেউ বাড়াতে পারে না, তবে একটু চেষ্টা করলে অকাল মৃত্যুকে রোধ করতে পারা যায়। রোগীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিনির্দিষ্ট মৃত্যুকাল উপস্থিত কি না তা বলে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তিব্বতীবাবার।

একদিন ব্যালোড়ের রাজা পার্থসারথি আপ্পারাও এসে কাতর মিনতি জানালেন তিব্বতীবাবার কাছে। ভক্তি ভরে প্রণাম করে বললেন, একবার দয়া করে পায়ের ধূলো দিতে হবে রাজবাড়ীতে। রাণীর কঠিন অসুখ। বহুকাল ধরে দেশ-বিদেশের বহু অভিজ্ঞ সেরা চিকিৎসককে দেখিয়েও তাঁর রক্তস্রাব সারেনি। এখন তাঁর কংকালসার দেহে নির্বাপিতপ্রায় জীবনের দীপ শিখাটি কোনরকমে ক্ষীণভাবে জ্বলছে। তবু রাজার দৃঢ় বিশ্বাস তিব্বতীবাবাই রাণীকে নিশ্চয়ই মৃত্যুপথ হতে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। রাণীর বয়স তিরিশের বেশী হবে না।

তিব্বতীবাবা রাজার মুখ হতে সব কথা শুনে ধর্মদাসকে তাঁর

ওষুধের পুঁটলিটি আনতে বললেন। তারপর রাজাকে তিনটি পয়সা দিতে বললেন। রাজা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তিনটি পয়সা বার করে দিলে তিব্বতীবাবা একটি অজানা গাছের মূল বার করে দিয়ে বললেন, এইটি ভাগ করে পনের দিন ভাল করে বেঁটে সরবতের সঙ্গে খাওয়াতে হবে। পনের দিন খাওয়ালেই কমবে। পনের দিন খাওয়ালে জীবনে আর কখনো এ রোগ হবে না। পনের দিন পর খবর দিবি।

রাজা তিব্বতীবাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনাকেও যেতে হবে প্রভু। আমি হতাশায় বড় কাতর এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আপনাকেও প্রাসাদে পনের দিন দয়া করে থাকতে হবে। আপনার নির্দেশমতই সব কিছু হবে। আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।

অগত্যা ধর্মদাসকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে পনের দিন রইলেন তিব্বতীবাবা। আদর যত্নের কোন ত্রুটি হলো না। ইতিমধ্যে রাণীর রোগ সেরে যেতে বহু ধনদৌলত দিতে চাইলেন রাজা। কিন্তু তিব্বতীবাবা হেসে বললেন, ওষুধটির দাম মাত্র তিনপয়সা ; এর বেশী ত আমি নিতে পারি না।

পনের দিন পর আবার সেই হাজী সাহেবের বাড়ীতে এসে উঠলেন তীব্বতীবাবা। মুসলমানের বাড়ীতে উঠতে প্রথমে দু' একজন নিষেধ করলেও তাতে কান দেননি তিনি। সর্বজীব ও ব্রহ্মের অভেদতত্বটি যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁর জাতিভেদ বা বর্ণ ভেদ মিথ্যা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রাণীর রোগ সারানোর কথাটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বহু মুমূর্ষু নরনারী ভিড় করতে লাগল তিবতীবাবার কাছে। তিনি কখনো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেননি। ওষুধ বিক্রি করে সামান্য যা পয়সা পেতেন তাতেই কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

রাজা পার্থসারথি আপ্পারাওর ছেলের একবার ভয়ংকর রকমের বসন্ত হয়। এ বসন্তে মানুষ সাধারণতঃ বাঁচে না। তিব্বতীবাবা এবার প্রাসাদে না গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু খাওয়াবার মাত্রা ঠিক না হওয়ায় সহসা প্রবল জ্বর ছেড়ে গিয়ে সমস্ত দেহ শীতল হয়ে গিয়ে হাতের নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। কান্নার রোল পড়ে যায় রাজবাড়ীতে। বহু বড় ডাক্তার এসে হাজির হয়। খবর পেয়ে তিব্বতীবাবা নিজে এসে একটি ওষুধ বেঁটে নিজের হাতে কোনরকমে খাইয়ে দেন। সমস্ত ডাক্তারদের বিমূঢ় করে দিয়ে মুহূর্তমধ্যে বাঁচিয়ে তুললেন ছেলেটিকে।

মাদ্রাজের আর একজন রাজার কুষ্ঠরোগ সারান তিব্বতীবাবা। এইভাবে মাদ্রাজে পঁচিশ বছর থাকবার পর ধর্মদাসকে সঙ্গে করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন আবার।

এবার কলকাতায় কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষা দান করেন তিব্বতী বাবা। ডাক্তার কুঞ্জেশ্বর মিশ্র, অক্ষয় মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের পোষ্যপুত্র, সুরেশ উকিলের পিতামহ প্রভৃতি তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা কাঁকুরগাছি ও হাওড়ার দালালপুকুর অঞ্চলে একটি করে মঠ স্থাপন করেন। পরে তিনি ব্যায়ামবিদ শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়কে দীক্ষা দান করে তাঁর নাম দেন সোহং স্বামী। ব্রহ্মদেশীয় মং পাইইনও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

একবার সুরেশ উকিলের পিতামহ তিব্বতীবাবার কাছে দীক্ষা নেবার পর রাণাঘাটে তাঁর এক ধনী উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর বাড়ীতে তিব্বতীবাবাকে নিয়ে যান। বন্ধুটি বড় গোঁড়া যুক্তিবাদী; সাধু সন্ন্যাসীদের জপ তপও যোগক্রিয়ায় বিশ্বাস নাই। তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে তিব্বতাবাবা তাঁকে কয়েকটি অলৌকিক যোগ-বিভূতি দেখান। তাঁর চোখের সামনে লঘিমা রূপ যোগশক্তির প্রভাবে শরীরটিকে আশ্চর্যভাবে লঘু করে ভরা গঙ্গার উপর দিয়ে খড়ম পায়ে হেঁটে যান।

পরে যুক্তিবাদী ভদ্রলোকটি তিব্বতীবাবার কাছে আত্ম সমর্পণ না করে পারেন নি।

কলকাতা হতে একবার নিরালম্ব স্বামীকে দেখতে এলেন তিব্বতীবাবা চান্নার আশ্রমে। অনেকদিন হতে অনুরোধ করে-ছিলেন স্বামিজী। এই চান্নার আশ্রমেই পালিতপুর গ্রামনিবাসী ধর্মদাস মণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হন তিব্বতীবাবা। সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতীবাবার একজন পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন কর্মদাস এবং তাঁকে পরম সমাদরের সঙ্গে পালিতপুরে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের শেষে মাঠের মাঝখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ধমান শহর থেকে কিছুদূরে দেওয়ান দীঘি হতে দেড় ক্রোশ দূরে পালিতপুর গাঁয়ের শেষে ছোট একটি নদী। সেই নদীর পারে অদূরে মাঠের মাঝখানে একটি সরোবর ও অগভীর বনের মধ্যে মঠ। এই শান্ত নির্জন পরিবেশে ধর্মদাস রায়ের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন তিব্বতীবাবা। সেই সময় পাহাড়পুর মঙ্গলসীমা নামে একটি গাঁ হতে দ্বিজপদ নামে এক কিশোর বালক গৃহত্যাগ করে এই মঠে এসে তিব্বতীবাবার সেবা করতে থাকেন।

তিব্বতীবাবা আজকাল ওষুধ দেয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতেন এ সমস্ত শক্তি সাময়িক। এ শক্তির বিকাশ যত কম দেখানো যায় ততই ভাল। কিন্তু ধর্মদাস রায় তাঁর অলৌকিক চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলে ফেলেছেন এর আগেই অনেকের কাছে।

একদিন পালিতপুরের জমিদার ভূতনাথ তাঁর মুমুর্ষু শিশুসন্তান অমরনাথকে নিয়ে এসে তিব্বতীবাবার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পা পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন একে আপনাকে বাঁচাইতেই হবে বাবা। আমার একমাত্র পুত্রসন্তান, আমার বংশের প্রদীপ। মাত্র বছর সাত আট বয়স। দুরারোগ্য যকৃতের রোগে দুই বছর ধরে ভুগে ভুগে

আজ মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। দেশের সব বড় বড় ডাক্তারকেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। কিন্তু কী এমন করেছি আমি অথবা আমার এই শিশুপুত্র যার জন্য অকালে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে একে।

তিব্বতীবাবা একবার নীরবে শায়িত শিশুটির পানে চেয়ে দেখলেন। রক্তশূন্যতায় পীতবর্ণ হয়ে উঠেছে কংকালসার দেহখানি। কোটরাগত চোখদুটির দৃষ্টি হয়ে উঠেছে ঝাপসা এবং ম্লান।

তিব্বতীবাবা গম্ভীরভাবে বললেন, আমি কিছু করতে পারব না। একে নিয়ে যা আমার কাছ হতে। আমি ডাক্তার না কবরেজ? মানুষের জ্বালায় লোকালয় হতে বহুদূরে বাস করছি। এখানেও আমায় জ্বালাতন করতে আসবি?

ততক্ষণে ভূতনাথ বাবুর স্ত্রীও এসে পড়েছেন। তিনিও ব্যাকুল ভাবে তিব্বতীবাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে এবার মমতা জাগল তিব্বতীবাবার মনে। সত্যি সত্যিই এটা অকাল মৃত্যু। অনেক সময় অনেকের আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হতেই নানাকারণে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় তাদের।

তিব্বতীবাবা অনেক ভেবে বললেন, আজই গোধুলিবেলায় আমার এখানে একটি সাদা ভেড়া দিয়ে যাবি। মনে থাকে যেন ভেড়াটি সাদা এবং অল্পবয়স্ক হয়। এক ডাকে যা দাম চাইবে তাই দিয়ে নিবি। সারারাত্রি এই ছেলে আর ভেড়াটিকে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকব আমি। আমি কি করব না করব বাইরে থেকে কেউ যেন কিছু না দেখে।

ছোট গৌর নদী বর্ষার জল পেয়ে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে তখন। গোধুলি হতে না হতেই মেঘের ছায়ায় ভর করে সন্ধ্যা নেমে এসেছে অকালে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা সরোবরের ধারে আমবনে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। দুপুর থেকে বৃষ্টি নামায় মাঠ থেকে

চাষীরা আগেই কাজ সেরে চলে গেছে। যথা সময়ে ভূতনাতবাবু লোকজন সমেত ভেড়াটিকে নিয়ে এলেন আশ্রমে।

সন্ধ্যা হতেই একটি মাটির ঘরের মধ্যে ভেড়াটিকে নিয়ে ঢুকলেন তিব্বতীবাবা। অমরনাথকে আগে হতেই শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের মধ্যে।

এক তীব্র উৎকণ্ঠায় সারারাত চোখে পাতায় করতে পারেন না ভূতনাথবাবু। অতন্দ্র দৃষ্টিতে পাহারা দিতে লাগলেন কুটিরের বাইরে বসে। তাঁর স্ত্রীও হয়ত ঘরে বসে অশ্রু বর্ষণ করছেন সারারাত। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল উপরে নিচে আকাশ পৃথিবীজোড়া এই অন্ধকার জমাট বেঁধে তাঁরই বুকের উপর চেপে বসে আছে। এ অন্ধকার কখনো সরবে না। আর কখনো ভোর হবে না।

কিন্তু সত্যি সত্যিই ভোর হলো। সমস্ত মেঘ আর অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠল চারিদিকে। পাখিরা জেগে উঠল গাছে গাছে। ঘর থেকে বরিয়ে এলেন তিব্বতীবাবা। হাসিমুখে বললেন মা, তোর ছেলের আর কোন রোগ নাই।

ভূতনাথবাবু তিব্বতীবাবার পা দুটো ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। বললেন আপনি মানুষ নন, দেবতা।

তিবতীবাবা পা দুটো সরিয়ে নিয়ে বললেন, এখন মা তোর তোর ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যা। ওকে ঝোল ভাত খেতে দিবি। বেচারা অনেকদিন না খেয়ে আছে।

ভূতনাথবাবু ঘরের ভিতর ব্যস্তভাবে গিয়ে দেখলেন অমরনাথ উঠে বসেছে। যার মুখহতে কথা বার হচ্ছিলনা, সে এখন পরিস্কার বলছে, ক্ষিদে পেয়েছে।

এদিকে আর একটি দৃশ্য দেখে আনন্দের মাঝে বেদনা অনুভব করলেন ভূতনাথবাবু। সেই সাদা মেষশাবকটির রং আর সাদা

নাই। একেবারে হলুদ হয়ে উঠেছে তার সাদা চামড়াটি। অত্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে উঠেছে তার হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ।

তিব্বতীবাবা বললেন, এ আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। তোর ছেলের সমস্ত রোগ সঞ্চারিত করেছি এর দেহে। এ মারা গেলে এর মৃতদেহটি একটি ভাল নিরিবিলি জায়গা দেখে কবর দিবি। এই রোগ সঞ্চার উপলক্ষ্য মাত্র। এর মেষদেহের মধ্যে যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন আত্মা রয়েছে সেই আত্মাকে মুক্ত করে বিশ্বনিখিলের ব্রহ্মাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম।

মেষশাবকটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন ভূতনাথবাবু। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার পরোপকারী আত্মা পরজন্মে এক মহাজীবন লাভ করুক।

ছেলেকে বুকে করে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর কোলে দিলেন ভূতনাথবাবু। তারপর মৃত মেষপালকটিকে সমাহিত করবার ব্যবস্থা করলেন।

এরপর থেকে ভূতনাথবাবু পরিবারস্থ সকলেই পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন তিব্বতীবাবার। ধর্মদাস মণ্ডলের সঙ্গে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় ভার বহনের অংশ গ্রহণ করেন।

এই সময় গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের জন্য ধর্মদাস রায়কে তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন তিব্বতীবাবা। দ্বিজপদ ব্রহ্মচারি তখন একাই সেবা করতে থাকেন তাঁর। দ্বিজপদ বাল্যকালে তিব্বতী বাবাকে চোখে না দেখেই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে আসবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন আপনা হতে।

দ্বিজপদকেও খুব স্নেহ করতেন তিবতীবাবা। অবসর সময়ে জীবনের অনেক কথা তাঁকে বলতেন।

একবার তিবতীবাবার ব্যাপ্তি যোগবিভূতির এক আশ্চর্য পরিচয় পান দ্বিজপদ। বহুবল্লভ নামে বীরভূম জেলার একটি লোক এসে কিছুদিন পালিতপুরের আশ্রমে এসে থাকে। তিবতীবাবাকে ছেড়ে

কোথাও থাকতে পারত না সে। একবার দুই একদিনের জন্য সে কাজের জন্য বাড়ী যায়। একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ তিব্বতী-বাবা আপন মনে হাসতে থাকেন। আশ্চর্য হয়ে দ্বিজপদ তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, বহুবল্লভ তার বাড়ী থেকে আমার কাছে আসবার জন্য রওনা হতে চাইছে আর তার স্ত্রী তার কাপড় ধরে টানাটানি করছে ; সে কিছুতেই তার স্বামীকে আসতে দেবে না। না হেসে থাকা যায় না।

দ্বিজপদ সবিস্ময়ে বললেন, সেকি বাবা এতদূরের কথা আপনি কি করে দেখতে পেলেন ?

দ্বিজপদর কথায় চমক ভাঙ্গল তাঁর। আবার তিনি সহজ হয়ে উঠলেন। এমনি করে বহু দূরস্থিত ভক্ত ও শিষ্যদের সব কথা তিনি জানতে পারতেন। ভক্তরাও ইচ্ছা মত সব জায়গা থেকেই সাক্ষাৎ পেত তাঁর।

অবশেষে মরদেহ ত্যাগের দিন ঘনিয়ে এল তিব্বতীবাবার। মায়িক জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন পরব্রহ্মের যুগ যুগান্তব্যাপী সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করলেন তিনি। জীব ও ব্রহ্মের অভেদতত্বটির পূর্ণ উপলব্ধি হওয়ায় 'তত্বমসি' এই মহাজ্ঞান জাগ্রত হলো তার মধ্যে। এর পরে এই মরদেহের মধ্যে তার আত্মা আর বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে চাইছে না।

দেহত্যাগের অভিলাষ জানাতে দ্বিজপদ শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। সব শিষ্যদের খবর দিলেন।

সেদিন সকালবেলায় তিব্বতীবাবা দ্বিজপদকে কাছে ডেকে বললেন, তুই কোথাও কখনো যাবি না। কোন ভয় নাই। যত-দিন বাঁচবি এখানেই থাকবি। আমার মঠে রোজ সকাল সন্ধ্যায় সাধনার ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখবি।

দ্বিজপদ ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠলেন। তিব্বতীবাবা বললেন,

আমি ঘর যাচ্ছি। আত্মা আমার দীর্ঘ প্রবাসের পর আসল জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

তিব্বতীবাবা তখন তাঁর ঘরের মধ্যে বুদ্ধ মূর্তির সামনে পদ্মাসনে বসে বৈদান্তিক পদ্ধতিতে নির্বিকার ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন। প্রথমে বহ্নির সঙ্গে প্রাণবায়ুকে বুদ্ধির দ্বারা মূর্ধস্থানে নিহিত করলেন। পরে মূর্ধস্থান ভেদ করে আকাশ-স্থানে নিয়ে গেলেন এবং অবশেষে সেই আকাশস্থানে ওংকারমন্ত্র জপ করতে করতে প্রানবায়ু ত্যাগ করলেন।

শিষ্যরা এই সময় সকলেই তিব্বতীবাবাকে তাঁদের আপন আপন জায়গায় দেখতে পান। ভূতনাথ তা মহাশয় তিব্বতীবাবার মৃতুকালে বিছানায় শায়িত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। সহসা তিব্বতীবাবাকে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেন। কিছুক্ষণ পরে বাবার তিরোরধানের খবর পেয়ে মর্মাহত হয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হন। যোগ্য শিষ্য ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্রও তিরোধানের সময় গুরুদেবের অলৌকিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেন।

তিব্বতীবাবার মরদেহ ত্যাগের দিনকতক পরে দ্বিজপদ ব্রহ্মচারি কলকাতায় কাঁকুড়গাছি মঠে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। এখানে একা একা থাকতে তাঁর মন চাইছিল না। তাছাড়া তাঁর ভরণ পোষণ কি ভাবে চলবে যে বিষয়েও তাঁর সংশয় ছিল মনে।

সেদিন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে তিব্বতীবাবার মহান আত্মার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানিয়ে গৈরিক বসনে কন্থা ও করঙ্গ নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন দ্বিজপদ। পালিতপুর গ্রাম পার হয়ে কাঁচা সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন আপন মনে। তিব্বতীবাবার কত পুণ্য স্মৃতি-কথা একের একের এক করে জাগতে লাগল আর ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তাঁর মন।

বর্ধমান কাটোয়ার ছোট রেল লাইনটি পার হলেই পাওয়া যাবে বর্ধমান যাবার বাঁধা সড়ক। কিন্তু সরাইটিকুরির লেভেল ক্রসিংএর কাছে আসতেই ভয়ে চমকে উঠলেন দ্বিজপদ। মনে হলো, দিনের সব আলো ম্লান হয়ে গেছে তার সামনে। দ্বিজপদ সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সামনে পথ আগলে তিব্বতীবাবা সশরীরে দাঁড়িয়ে। তিব্বতীবাবা স্পষ্ট বললেন, তোকে আমি বার বার নিষেধ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও আমার কথা ঠেলে আশ্রম ছেড়ে তোর চলে আসা উচিত হয়নি। এই মুহূর্তে ফিরে যা। আমি বলছি তোর কোন অসুবিধা হবে না কোন দিন। শুধু আমি যেমন ভাবে বলেছি সেই ভাবে সাধনা করে যাবি।

আজও সেই পালিতপুর আশ্রমে বৃদ্ধ দ্বিজপদ ব্রহ্মচারি রয়ে গেছেন। তিব্বতীবাবার পুণ্য স্মৃতিটিকে বুকের মধ্যে ধরে রেখে বৈদান্তিক সাধনার ক্ষীয়মাণ ধারাটিকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিব্বতীবাবার মত ব্রহ্মজ্ঞানী মহাসাধকের কখনো মৃত্যু নাই। মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষের অমর আত্মা আজও মাঝে মাঝে উপযুক্ত ভক্তের নিষ্ঠাবান চিত্তে আবির্ভূত হন। প্রয়োজনমত সাধন পথের নির্দেশ দেন। বিপদগ্রস্ত ভক্তকে উদ্ধারের উপায় বলে দেন। কিছুকাল আগে দ্বিজপদ ব্রহ্মচারি মহাশয় একবার নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। আশ্রমে একাকী থাকেন; সেবা যত্নের লোক নাই। বড় বিপদে পড়লেন দ্বিজপদ। এই সময় একদিন রাত্রিকালে সেখানে আবির্ভূত হয়ে একটি ওষুধের নাম বলে দেন তিব্বতীবাবা। তিনি আরও বলেন, এবার হতে মাটির চালাঘরে না শুয়ে আমার দালানের ছোট কুটরিটাতে তক্তাপোষের উপর শুবি।

তিব্বতীবাবার নির্দেশ আজো শ্রদ্ধাভরে মেনে চলছেন দ্বিজপদ।

কে বললে মা আমার কালো! তিনি যদি কালো হবেন, ত্রিভুবন আলো হয়ে উঠবে কেন তাঁর রূপের ছটায়! চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যদি বিরাজ করতে থাকে তাঁর ত্রিনয়নে, কেন তবে মসীলিপ্ত হবে তাঁর দিব্য কান্তি! আমি ত দেখছি, চাঁদের গায়ে কলংক আছে, তবু তাঁর রূপের মধ্যে কোন কালিমা নাই।

চান্না গাঁয়ের শেষ প্রান্তে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে এলেই এই ধরণের কত প্রশ্ন জাগে কিশোর কমলাকান্তের মনে। সেদিন মন্দির সংলগ্ন অনতিনিবিড় বনে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেও মন্দির ছেড়ে গাঁয়ে গেলেন না কমলাকান্ত। কী যেন এক মাদকতা মেশানো আছে এই মন্দিরে। তাঁর মা, ভাই, ঘর সংসার সব কিছু ভুলে যান নিমেষের মধ্যে। কোথা হতে এক চঞ্চলতার ঢেউ এসে সহসা উত্তাল হয়ে ওঠে প্রাণের মধ্যে। তারপর সেই ঢেউটা তাঁর আন্তরসত্তার ভিত্তিমূলটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মাথায় গিয়ে সব চিন্তাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তখন শুধু একমাত্র কালীমার চিন্তায় তন্ময় হয়ে যান। সমস্ত অন্তরাত্মা আকুল হয়ে ওঠে তাঁকে পাওয়ার জন্য।

বড় নির্জন এবং শান্তিপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত এই বিশালাক্ষীর মন্দিরটি। এর উত্তরে অর্থাৎ পিছন দিকে ক্ষীণকায়া খড়োশ্বরী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত। সামনে মন্দির প্রাঙ্গনে আম ও আশশ্যাওড়ার বন, মাঝে মাঝে দুই একটা বট ও শিমূল গাছ। বন তেমন ঘন না হলেও সব সময় ছায়া নিবিড় করে রেখেছে সমস্ত স্থানটিকে। পূবে ও পশ্চিমে ধানক্ষেত। তবে পূবদিকের মত পশ্চিম দিকের মাঠ তেমন দিগন্ত বিস্তৃত নয়। অদূরে চান্না গাঁয়ের

সীমাচিহ্নরূপ ঘন শ্যামল একটি বনচাপ মাঠের বুক চেপে দিগন্তকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

আনুমানিক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেন কমলাকান্ত। গরীব মধ্যবিত্ত ঘর। পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য যজন যাজন করে কোন রকমে দিন চালান। গরীব হলেও শাস্ত্রজ্ঞ সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন মহেশ্বর। মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছে পুত্রের জন্য গৌরববোধ করতেন। বলতেন, তুমি দেখো, এ ছেলে বড় হয়ে মহাপণ্ডিত হবে। আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এমন অপরূপ দেহকান্তি এমন সুললিত উদাস ভাব সচরাচর গরীবের ঘরে কোন ছেলের মধ্যে দেখা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পুত্র-সুখ বেশী দিন ভোগ করে যেতে পাননি মহেশ্বর। কমলাকান্তের বাল্যকালেই তিনি পরলোক গমন করেন।

এই চান্নাগাঁয়েই মামার বাড়ী কমলাকান্ত। নিজবাড়ী অম্বিকা কালনা এই বর্ধমান জেলাতেই। এখান থেকে আট নয় ক্রোশের পথ। কিন্তু পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরেই তাঁর মা মহায় সম্বলহীন অবস্থায় ছেলেদের নিয়ে ভাই এর আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। কমলাকান্ত অবশ্য থাকেন অম্বিকা গাঁয়ে তাঁদের এক পুরানো যজমানের বাড়ীতে। সেখানে থেকে টোলে পড়াশুনো করেন। বাড়ীতে জমিজমা না থাক, বামুনের ঘরের ছেলে যদি উপযুক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারেন তাহলে পূজা অর্চনার কাজ ছাড়াও একটা চতুষ্পাঠি খুলে বসতে পারলে মন্দ রোজগার হবে না। এই ভেবেই তাঁর পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছেন তাঁর অভিভাবক বৃন্দ।

ছাত্র হিসাবে কমলাকান্ত সত্যিই মেধাবী। তাঁর স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দুটোই তীক্ষ্ণ। এই বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হয়েছে তাঁর। তবু পড়াশুনোয় একেবারে মন নাই তাঁর। শুধু পড়াশুনো কেন, বৈষয়িক কোন বিষয়েই নাই কোন আসক্তি।

কমলাকান্তর জীবনে একমাত্র প্রিয়বস্তু হলো, রামপ্রসাদের শ্যামা-সংগীত। লোক মুখ শুনতে শুনতে ছোট থেকে অনেক পদই তিনি আয়ত্ত করেছেন। তাছাড়া নিজে তিনি সুকণ্ঠ। সেই গান তিনি সময় পেলেই একা একা নির্জনে পথে ঘাটে মাঠে প্রান্তরে গেয়ে বেড়ান মনের আনন্দে।

সময় না পেলেও জোর করে সময় করে নেন কমলাকান্ত। প্রায়ই তিনি কারণে অকারণে অম্বিকা হতে চান্নায় ছুটে আসেন। মামার বাড়ীর প্রতি কোন মোহ নাই তাঁর। মা ভাই এর প্রতিও কোন টান নাই। চান্নায় তাঁর একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হলো বিশালাক্ষীর মন্দির আর তার সান্নিহিত বন।

দেবী বিশালক্ষী শক্তিরূপা কালীরই অন্য নাম। অথচ মন্দির মধ্যে কালীর কোন পুর্ণাবয়ব মূর্তি নাই। আছে শুধু তার ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ। লোহা বা অন্য কোন কঠিন ধাতু নির্মিত বিশাল অক্ষি-যুগলবিশিষ্ট জিহ্বাকর্ত্তনরতা কালীমায়ের কয়েকটি মাথা বেদীর উপর সাজানো। কিন্তু ওই মুণ্ডগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দেবী মূর্তিটি ভেসে ওঠে ভাববিভোর কমলাকান্ত চোখের সামনে। তাঁর মনে হয়, দেবী যেন তাঁর বিশাল অক্ষির দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বভূতের প্রতি যুগপৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। জগতে এমন কোন পাপ গোপনতা বা অন্ধকার নাই যা তাঁর ওই দৃষ্টির ঐশ্বরিক তীক্ষ্ণতার দ্বারা বিদ্ধ হয় না। কে বলে তিনি লেলিহান জিহ্বা বার করে রক্তলোলুপতার পরিচয় দিচ্ছেন। আসলে তিনি সত্ত্বাংশযুক্ত শ্বেত দন্তের দ্বারা রজোরূপী জিহ্বা কর্তন করছেন। কে বলে তাঁর গলায় নরমুণ্ড মালা। কিন্তু ও ত মুণ্ডমালা নয়, ও হলো মাতৃকা আদি বর্ণমালা। এ মালায় যুক্ত একান্নটি মুণ্ড বর্ণমালার একান্নটি অক্ষরের প্রতীক। নিত্য ও সত্য শব্দব্রহ্ম একান্নটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি করেছে। আদ্যকল্পে মুক্তকেশী হয়েছিলেন। কিন্তু কে বললে, তিনি মুক্তকেশী ও উলঙ্গিনী বলে ভীষণা। তাঁর

মুক্ত কেশপাশ এমন এক মায়াপাশের প্রতীক যা সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই মায়া নাশ করতে না পারলে জীবের মুক্তি নাই। কালী মা যে সব বন্ধন হতে হতে মুক্ত তাঁর নগ্ন মূর্তি সেই সত্যকে দ্যোতিত করছে। তাই তিনি মহামায়া হয়েও সর্বপাশ মুক্ত।

নদীটির নাম খড়োশ্বরী। লোকে বলে খড়ি। কিন্তু এ নামও কমলাকান্তকে তাঁর কালীমার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। খড়োশ্বরী কালীরই ত অন্য নাম। মা চতুর্ভূজারূপে চারটি হাতে ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ চারটি বর্গ দান করছেন। তার মধ্যে দুটি ডান হাতে জ্ঞান ও বিবেকরূপ খড়্গ ও কর্তরিকা আছে। দুটি বাঁ হাতে আছে নীলপদ্ম ও কপালপাত্র। নীল পদ্ম শান্তি আর বরাভয়ের প্রতীক। আর কপালপাত্রে মহাপ্রলয়ের পর অবশিষ্ট বিশ্বের কারণকে ধারণ করে আছেন।

এবার কমলাকান্ত মুখ তুলে দেখলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার বেশ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে চারিদিকে। জমাট বাঁধা স্তব্ধতার বুকে অজস্র আঁচড় কেটে চলেছে একটানা ঝিল্লীর রব। বাড়ীতে এতক্ষণ হয়ত তাঁর মা ও মামা খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন। তবু এই নির্জন নিস্তব্ধ নৈশ চরাচরের ভীষণ অন্ধকারের মাঝখানে একা থেকেও কোনরূপ ভয় পেলেন না কিশোর কমলা-কান্ত। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল কে বললে তিনি একা। তাঁর জগজ্জননী রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। তার মনে হলো, বিশ্বজোড়া বিশাল ও কৃষ্ণ মূর্তিতে তাঁর কালীমা মাথায় অজস্র সূর্য তারার মুকুট পরে মৃত্যুরূপ মহাকালের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কমলাকান্ত আবার নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন, কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছিস মা। আমি ত কিছুতেই তোকে দেখে ভয় পাব না। জানি, মহাপ্রলয়ের অবসানে তোর প্রলয়ং-করী মূর্তি দেখে ভয়ে মহাকাল তোর পদতলে নীলপদ্ম দিয়ে

পূজো করেছিলেন। জানি, যে মহাকাল সমস্ত কালকে গ্রাস করে সেই মহাকালকে নাশ করতে পেরেছিস বলেই আত্মাশক্তি কালিকা নামে তুই অভিহিতা। আমি কিন্তু তবু ভয় পাব না। তুই যে আমার মা। আমার মা। আমার মা।

গাঁ থেকে কিছু লোকজন আলো নিয়ে এসে দেখে, একটি প্রাচীন বটগাছের তলে কমলাকান্ত অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। মন্দিরের পাশেই ছোট একটি ডোবা। সেখান থেকে জল এনে মুখে চোখে দিতেই জ্ঞান হলো।

মা বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বড় ছেলে, কত আশা তার উপর। সেই ছেলে যদি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায় সবাইকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। বাড়িতে আয় না থাকলে শুধু দুই এক বিঘে জমিতে কি করে সংসার চলবে। একমাত্র বিয়ে ছাড়া ধর্মের প্রতি এই আতিশয্য ও বৈরাগ্য ভাব কাটাবার অন্য কোন উপায় নাই। নতুন মায়ায় আবদ্ধ করতে হবে ছেলের মনকে। মা ও মামাতে যুক্তি করে তাই বিয়ের ব্যবস্থা করলেন কমলাকান্তর।

কাছাকাছি একটি গাঁয়েই পাত্রী যোগাড় হয়ে গেল। ছেলে হিসাবে কমলাকান্তও খারাপ নন। মাত্র আঠার উনিশ বয়স। সুন্দর সুঠাম দেহ। ভাল লেখাপড়া জানা। ন'বছরের গৌরী নয়, ওরই মধ্যে একটু বড়সড় দেখে মেয়ে আনা হলো। দ্বিরাগমনে এসে যেন ঘর করতে পারে। কমলাকান্তকে বুঝিয়ে তার মনের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন করতে হবে। খুব ছোট মেয়ে সুবিধে করতে পারবে না।

মেয়েটি সত্যি সত্যিই বড় সুলক্ষণা এবং শান্তস্বভাবা। সংসারে মন ঠিক বসাতে না পারলেও স্ত্রীকে বড় ভাল বাসতেন কমলাকান্ত।

রোজ একবার করে সন্ধ্যার দিকে বিশালাক্ষীর মন্দিরে যেতেন

কমলাকান্ত। না গিয়ে থাকতে পারতেন না। দিনের বেলায় অবশ্য এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে কিছু যজমানের বাড়ীতে পুজা করে সংসারে বেশ কিছুটা সাহায্য করতেন। কমলাকন্তের ব্যবহারে মা অনেকখানি খুশি হয়েছেন।

একদিন রাত্রিতে শোবার ঘরে ঢুকে কমলাকান্ত দেখলেন, স্ত্রী তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। কালো কালো টানা চোখ। বড় গভীর ও শীতল সে চোখের চাউনি। কমলাকান্ত সে দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, তুমি আমার ব্রহ্মময়ী জগজ্জনীর অংশসম্ভূতা, তাই ত তোমায় 'আমি ভালবাসি। তোমার ওই ভাসা ভাসা কালো চোখের তারায় দেখছি আমার সবচেয়ে প্রিয় কালিকামূর্তির ঘনকৃষ্ণ ছায়া। আমি আমার কালীমাকে খুব বেশী ভালবাসি। তোমার দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারি না। তুমি এতে কিছু মনে কর না ত?

তাঁর স্ত্রী তখন দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, মনে আবার কি করব? তুমি যা ভালবাস, আমিও তাই ভালবাসি, তুমি যা চাও আমিও তাই চাই। তুমি থেকে আমি কি আলাদা? আমি না তোমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার সহধর্মিণী। তোমার ধর্ম সাধনায় আমি যদি সাহায্য করতে না পারি তবে বৃথাই আমার তোমার স্ত্রী হওয়া।

তারপর দেয়ালে টাঙ্গাণ একটি কালীমূর্তির পটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন, কালীমাকে আমিও কি কম ভালবাসি? ও মূর্তিকে প্রণাম না করে আমি কোনদিন জলস্পর্শ করি না।

স্ত্রীর মুখে একথা শুনে অদ্ভুত অনাস্বাদিতপূর্ব এক পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল কমলাকান্তর সারা অঙ্গ। এক নূতনতর ও গভীরতর উপলব্ধির মধুর শিহরণে প্রতিটি রোমকূপ উঠল কেঁপে। স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে চিবুক ধরে বললেন, আগে আর পাঁচজনের মত আমারো ধারণা ছিল, স্বর্গে ও সংসারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জায়া ও জননী দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তু। কিন্তু এখন

দেখছি সে ধারণা আমার ভুল। ইচ্ছা করলে সংসারকেই স্বর্গ করে তুলতে পারি আমরা। একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ইষ্টদেবীর এখানেই দেখা পেতে পারি। একই নারীশক্তি জননীরূপে আমাদের প্রজনন ও পালন করে আবার জায়ারূপে আমাদের আহ্লাদ দান করে। আমাদের জগজ্জননী একই শ্যামা মা যদি ব্রহ্মাণীরূপে সৃষ্টি বৈষ্ণবীরূপে পালন এবং রুদ্রাণীরূপে সংহার করতে করতে পারেন, তবে একই নারীমন সৃষ্টিশক্তি ও আহ্লাদিনী-শক্তিরূপে কাজ করতে পারবে না কেন ?

কমলাকান্ত শুধু ভক্ত নন, তিনি কবি এবং সুকণ্ঠ গায়ক। কিন্তু তার কবিতায় একমাত্র ভক্তিভাব ছাড়া আর কোন ভাব নাই। একমাত্র শ্যামাসংগীত মূলক পদ ছাড়া আর কিছুই রচনা করেন না। সারাদিন সংসারের কাজ ও সারা সন্ধ্যা ইষ্টদেবীর ধ্যান ও পূজার পর ঘরে এসে মৃদু প্রদীপালোকের সামনে বসে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পদ রচনা করেন কমলাকান্ত। কিশোরী স্ত্রীও তাঁর সামনে জেগে থেকে পাশে বসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তা দেখেন। বারবার শুতে যেতে বলা সত্বেও শুতে যান না। অপূর্ব এক আনন্দানুভূতি জাগে কমলাকান্তের মনে। স্ত্রীর নিবিড় সান্নিধ্যে বসে ইষ্টদেবীর স্তবগান রচনা করছেন। যোগতন্দ্রাসমাচ্ছন্ন নিশীথ রাত্রির এই স্তব্ধ অবকাশে তরুণী জায়ার মদালস দেহলতাকে নিজেন দেহের মধ্যে ধারণ করে মনে মনে জপ করছেন জগজ্জননীর ধ্যান। এ এক অদ্ভূত সাধনা। দুটি একাকার করা দেহের মধ্যে থেকে এ কি দেহাতীতের নিগূঢ় উপলব্ধি।

সংসারে পুত্র ও পুত্রবধূর মিল দেখে মার আনন্দ আর ধরে না। কিছুদিন ধরে সুখ-শান্তির স্রোত বয়ে গেল সংসারে। কিন্তু এ সুখ বেশীদিন রইল না। হঠাৎ রোগে স্ত্রী মারা যেতে মনে বড় আঘাত পেলেন কমলাকান্ত। কিন্তু খড়্গেশ্বরী নদীর ধারে শ্মশানে স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করতে গিয়ে নিজেকে নিজেই বোঝালেন।

হয়ত স্ত্রী থাকলে ক্রমশই জড়িয়ে পড়তেন সংসারের মায়ায়; পরে হয়ত বিঘ্ন ঘটত সাধনায়। তাই মা তাকে সরিয়ে নিলেন নিজের হাতে। তাছাড়া মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর দেহটা লোকচক্ষে ভস্মীভূত হলেও দিব্যচোখে কমলাকান্ত দেখলেন, সে দেহ ব্যাপ্ত ও বিলীন হয়ে রইল এই বিপুল বিশ্বের বিশালতায়।

সহসা তত্ত্বকথা মনে হলো কমলাকান্তের। বেদান্তে যাকে ব্রহ্ম বলে তন্ত্রমতে সে ব্রহ্ম হচ্ছে শিব ও শক্তির একাত্মভাবেরই নামান্তর। নিজ দেহের মধ্যে এই শিব ও শক্তির মিলন ঘটানোই হলো তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য। পারাটাই হলো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। সৃষ্টির আগে ব্রহ্ম ছিলেন এক ও অদ্বিতীয়। সহসা তিনি বহু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং নিজেকে ছত্রিশতত্ত্বে বিভক্ত করে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। এই ছত্রিশতত্ত্বের মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি এই পঞ্চভূত দ্বারাই স্থূল পৃথিবী গঠিত। দেবীর মস্তকে যে পঞ্চমুদ্রা আছে তা হচ্ছে এই পঞ্চভূতেরই প্রতীক। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর ভৌতিক দেহ এই পঞ্চভূতেই মিশে আছে। সুতরাং শোকের কিছু নাই।

বৈরাগ্যবাসনা আবার প্রবল হয়ে উঠল কমলাকান্তর মনে। তা বুঝতে পেরে মা আবার বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করলেন। অল্প দিনের মধ্যে বিয়েও আবার হয়ে গেল। আগেকার মতই যজন যাজনের মধ্য দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন কমলাকান্ত। কিন্তু মনকে নিবিষ্ট করতে পারলেন না সংসারে। কেমন করে তিনি সবাইকে বোঝাবেন, রক্তের সম্পর্ক আর আত্মার সম্পর্ক এক নয়। সংসারের এরা কেউ তাঁর প্রকৃত আত্মীয় নয়। জীবনে তাঁর একমাত্র আত্মীয় হচ্ছে তাঁর কালীমা। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর সংসার। তিনি কেমন করে সবাইকে বোঝাবেন, তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে, কামনা ও কল্পনায় দেহের রক্তে ও আত্মার চৈতন্যে সেই এক মাতৃচিন্তা এক আতপ্ত প্রেরণার অগ্নি-

সঞ্চালনে প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে তাঁর সমগ্র সত্তায়। এ কথা কাউকে বললে বুঝবে না। বুঝলেও বিশ্বাস করবে না।

কমলাকান্ত কবি। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করে শক্তিতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্র ভাল ভাবেই অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তবু অনুভব করলেন, জীবনে তাঁর একজন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরু প্রদর্শিত সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করেই সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন তাঁর সাধনায়।

কিন্তু যে সে গুরু হলে চলবে না। তন্ত্রসাধনায় পশ্যাচার ও বীরাচারের বীভৎসতা ও চক্রসাধন, শবসাধন প্রভৃতি জটিলতাকে একেবারেই সমর্থন করতে পারেন না কমলাকান্ত। এগুলির প্রতি বিতৃষ্ণার অন্ত নাই তাঁর। জীবনে তাই তিনি চান এমন এক গুরু যিনি তাঁকে দিব্যভাবসমন্বিত কৌলাচারের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের পদটি দেখিয়ে দিতে পারবেন। এইভাবে তন্ত্র-সাধনার পথটিকে সমস্ত রকমের ভয়াবহ জটিলতা হতে মুক্ত করে সহজ, সরল ও সুগম করে যেতে চান সকলের জন্য। ভক্তকবি রামপ্রসাদের মতই এক মধুর মানবিক অন্তরঙ্গতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চান ভক্ত ভগবানের সম্পর্কটিকে।

আরাধ্যা দেবীর সঙ্গে কমলাকান্তর নিবিড় অন্তরঙ্গতার এই ভাবটি কত সহজে মানুষের চিত্তকে আলোড়িত করত, তার এক বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা হতে।

একবার কমলাকান্ত কোন এক দূর গাঁয়ের একটি যজমান বাড়ীতে গিয়েছিলেন শ্রাদ্ধোপলক্ষে। চান্না হতে গাঁটির দূরত্ব পাঁচক্রোশ। প্রথমে চান্না হতে খড়িনদী পার হয়ে আমবনা কয়রাপুরের দেবীতলায় উঠতে হয়। সেখান থেকে কাঁচা বাদশাহী সড়ক ধরে সোজা ওরগাঁয়ের হাটতলায় পৌঁছে সড়ক ছেড়ে ধরতে হয় বিশাল ওর-গাঁয়ের ডাঙ্গা। তখনকার দিনে এ ডাঙ্গা ছিল বড় বিপদসংকুল। কয়েক ক্রোশব্যাপী এই বিশাল

ডাঙ্গার চারিদিকে ছড়িয়ে থাকত বহু ঠাঙাড়ে আর মানুষ মারার দল। কোথাও কোন তৃণগুল্ম নাই, কৃষিযোগ্য কোন উর্বর ভূমি নাই। কোন জলাশয় বা বৃক্ষছায়া নাই। শুধু শক্ত কাঁকুড়ে মাটির অবাধ্য অবারিত বিস্তার। মাঝে মাঝে কৃষ্ণকাণ্ড ঋজুদেহ দৈত্যাকার কতকগুলো তালগাছের উদ্ধত অবস্থিতি এই প্রান্তরের ভয়াবহতাকে বাড়িয়ে তুলেছে আরো। এই ডাঙ্গা পূবদিক ধরে পার হলে তবে পাওয়া যাবে সেই গাঁটি।

যাবার সময় সকালের দিকে এই ডাঙ্গা নির্বিঘ্নেই পার হলেন কমলাকান্ত। সেদিন ছিল ওর গাঁয়ের হাটবার। দলবদ্ধভাবে বহু লোক ও গরুর গাড়ী যাতায়াত করছিল। তাছাড়া সকালের দিকে ঠাঙাড়েদের উৎপাত কম থাকে। কিন্তু কাজ সেরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল কমলাকান্তর। তাঁর যজমান বারবার তাঁকে অনুরোধ করল, বাবাঠাকুর, আজকের রাতটা থেকে যান; এই অবেলায় গিয়ে কাজ নাই। তাছাড়া পথের যা অবস্থা, আপনি ত সবই জানেন।

কমলাকান্ত হেসে বললেন, মার নাম করতে করতে চলে যাব। জীবনের ভয় ত আমি কখনো করিনে। এ জীবন যাঁকে সঁপে দিয়েছি তাঁর ইচ্ছা হয় রাখবেন না হয় না রাখবেন। তোরা কিছু ভাবিসনে।

শেষ বিকেলেই বেরিয়ে পড়লেন কমলাকান্ত। ঘাড়ে একটা পুঁটলি আর চাদরের খুঁটে কিছু টাকা। আপন মনে অনুচ্চস্বরে স্বরচিত গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললেন। বেলাশেষের লাল রোদ রক্তাভ কাঁকুরে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। দিগন্ত-প্রসারী শূন্য প্রান্তরের স্তব্ধ বিশালতায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হলো কমলাকান্তর। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন। নিজের দেহটাকে যেন দেখতে পাচ্ছেন না। নিজের গলার স্বর শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছেন না। কিন্তু এখানেও তাঁর মা আছেন।

তাঁর কোন ভয় নাই। লোকালয়ে সর্ব জীবের মধ্যে মা যেমন সুপ্ত হয়ে আছেন, এই স্তব্ধ বিশাল প্রস্তরের মধ্যেও মা তেমনি গুপ্তভাবে বিরাজ করছেন।

সহসা বিকট শব্দ করে একদল ডাকাত এসে পথরোধ করে ঘিরে দাঁড়াল কমলাকান্তকে। এ পথে এই সময়ে দস্যুদের সঙ্গে দেখা হবে জানতেন তিনি। তাই বিস্মিত হলেন না এমন কিছু। তারা কিছু না বলতেই চাদরের খুঁট থেকে কয়েকটি রূপোর টাকা আর পুঁটুলির জিনিসপত্রগুলি দিয়ে বললেন, এই নাও বাবারা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ; আমার কাছে যা ছিল দিলাম, আর ত কিছু নাই।

ডাকাতের সর্দার কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল, বাড়ী কোথা ?

কমলাকান্ত চান্নার নাম করতে তারা বলল, বড় কাছাকাছি জায়গা। তোমাকে ছেড়ে দিলে আমাদের বিপদ হতে পারে। তোমাকে খুন করব আমরা।

সাক্ষাৎ যমদূতের মত চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কোঁমর বাধা মালকোঁচা করা কাপড়। হাতে লাঠি আর সড়কি। কমলাকান্ত নির্ভয়ে সহজভাবে বললেন, তা বেশ বাবা বেশ। ভাল কথা। তবে শুধু একটা কথা, একবার প্রাণভরে জনমের মত মায়ের নাম করে নিই। একবার শুধু একটু সবুর কর বাবারা।

দস্যু সর্দার আশ্চর্য হয়ে বলল, ঠিক আছে। ভাবল, প্রাণের এতটুকু মায়া নাই, এ কেমন মানুষ।

প্রাণ খুলে গান ধরলেন কমলাকান্ত। যেমন মধুর কণ্ঠ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী বাণী। মৃত্যুকালে তোদের পুত্র পরিবার কেউ সঙ্গে যাবে না। সংসারের সকল অনিত্যতা সমস্ত মোহের আবরণ ভেদ করে প্রকট হয়ে ওঠে এই সময় এক তিমিরমণ্ডিত ভীষণতায়। তখন কেবল শ্যামা মার রাঙা চরণ দুটিই একমাত্র ভরসা। এ জীবনে কোন পার্থিব সঞ্চয় তাঁর নাই; থাকবার মধ্যে শুধু জপের মালা

আর ঝুলি আর আছে একখানি একটি জীর্ণ কাঁথা। এগুলি রেখে তিনি মার কাছে যাচ্ছেন। জীবনে জগজ্জননী মার যে করুণা তিনি পাননি এবার মৃত্যুতে সেই অপার করুণা পেয়ে ধন্য হবেন।

গান শুনতে শুনতে ডাকাতদের পাথরের মত কঠিন হৃদয়ে প্রথমে বড় রকমের একটা ফাটল ধরল। তারপর সে পাথর একেবারে জল হয়ে গেল। ডাকাতরা সাধারণতঃ কালীভক্ত হয়। শক্তিময়ীর কাছ থেকে শক্তি ভিক্ষা করে নিয়ে সেই শক্তির তারা অপব্যয় করে থাকে। আজ কিন্তু কমলাকান্তর স্বরচিত স্বকণ্ঠে গীত শ্যামাসংগীত শুনে তাদের সমস্ত অশুভ শক্তি বিকল হয়ে গেল দেহের মধ্যে। তাদের জীবনের বিকৃতি ও অসাড়তা প্রকট হয়ে উঠল আজ প্রথম তাদের কাছে। কমলাকান্তর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল সবাই সজল চোখে।

তাদের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ক্ষমাসুন্দর কণ্ঠে কমলাকান্ত বললেন, মা তোদের সুমতি দেবেন। তোরা মাকে ডাক। মায়র সত্যিকারের ছেলে হয়ে ওঠ।

দস্যুসর্দার কেঁদে বলল, একটা যা হোক পথ বলে দাও বাবা। জানি জীবনে অনেক পাপ করেছি। কিন্তু এ কাজ কি আর সাধ করে করি। অনাবৃষ্টি অজন্মা লেগেই আছে। ডাঙ্গা ডহর জায়গা চাষ করে খাব তার উপায় নাই।

কমলাকান্ত তেমনি সস্নেহে বললেন, বিশ্বাস করে মার উপর ছেড়ে দে, তিনিই তোদের ভাবনা ভাববেন।

সেদিন ওরগাঁয়েরডাঙ্গায় প্রাকসন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারে প্রথম আলো ফুটে উঠল একদল মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে। নীতি চেতনার শুভ্র আলোর মধ্যে নবজন্ম লাভ করল তারা। দস্যুসর্দার নিজে কমলাকান্তর পুঁটলি মাথায় করে দিয়ে এল চান্নায়। কমলাকান্ত টাকা কটি ভাগ করে দিলেন সকলের মধ্যে।

পরে এরা সকলেই রূপান্তরিত হয়ে ভাল হয়ে ওঠে। এদের প্রায়ই দেখা যেত, বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়ে কমলাকান্তর কাছে ভক্তিভরে শ্যামাসংগীত শুনছে।

মানকরের কাছে কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। তখনকার দিনে কেনারাম ছিলেন একজন সার্থক তন্ত্রসাধক। তাঁর বাড়ীতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও কালীমূর্তি ছিল। একবার চান্নার নিমটবর্তী একটি গাঁয়ে কালীপুজা উপলক্ষে কমলাকান্ত সেখানে গেলে দেখা হয়ে যায় কেনারামের সঙ্গে। কেনারামও নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে কমলাকান্ত জানলেন সত্যি সত্যিই কেনা-রাম একজন শক্তিমান সাধক। কিন্তু তাঁর সাধনার ধারাটি বড় সহজ ও সরল।

তন্ত্রসাধনায় তিনটি ভাব ও সাতটি আচারের উল্লেখ আছে। পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাব-এই তিনটি ভাবের মধ্যে দিব্যভাব যেমন শ্রেষ্ঠ, সমস্ত আচারের মধ্যে তেমনি কৌলাচারই শ্রেষ্ঠ। কুলাচার যোগভোগাত্মক। অকুল হলেন শিব আর কুল হলেন শক্তি। এই শিব ও শক্তির সামরস্যের অনুসন্ধানই কৌল সাধনার কাজ। কৌলকে তন্ত্রসাধনার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম মানতে হয় না। তবে সাধারণতঃ কৌল সাধকগণ উপবাস, পরস্ত্রীগমন, ব্রত পালন, তীর্থ পর্যটন পরিহার করে চলেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বের প্রথম বর্ণ 'ম' সমন্বিত যে পঞ্চ-ম-কার তন্ত্রসাধনার প্রধান অংগ কেনারাম তার মধ্যে কখনো কখনো মদ্য, মাংস, মৎস এবং মুদ্রা অর্থে কিছু ফলমূল শুদ্ধি করে গ্রহণ করতেন। এই স্থূল পঞ্চ-ম-কার গুলিকে সাধনার আবশ্যকীয় অংশ বলে মনে করতেন না। তাছাড়া তিনি সংসারত্যাগী ছিলেন না, গৃহবাসী হয়েই সাধনা করতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সাধক কেনারামের কাছে দীক্ষা নিলেন কমলাকান্ত। কেনারাম নিজে এসে বিশালক্ষীদেবীর মন্দিরের

সামনে শিমুলগাছের তলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরী করে দিয়ে গেলেন। তিনি বার বার সাবধান করে দিলেন কমলাকান্তকে, একমাত্র উপাসনার কাল ছাড়া মদ্য, মাংস, মৎস ও ফলমূল গ্রহণ করবে না। দেবীকে উৎসর্গ না করে গ্রহণ করবে না আবার বিনা শুদ্ধিতে দেবীকে দান করবে না। মন্ত্রার্থ স্ফুরণ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই মদ্যমাংসাদি নির্বিকার নিষ্কামভাবে ব্যবহার করবে। সতৃষ্ণ হলে মহা পাতকী হবে। সুরাকে সহস্রার বিগলিত মধুরূপে জ্ঞান করে কুলকুণ্ডলিনী মুখে আহুতি দান করবে। যে পর্যন্ত দৃষ্টি ও মন বিঘূর্ণিত না হয় সেই পর্যন্তই সুরাপান বিধেয়। মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান পশুপানের সমান। নিজ স্ত্রীকে শক্তি ভেবে নিষ্কামভাবে শুধু ঋতুকালে তাঁর কাছে গমন করবে। অন্য মৈথুন সাধনায় দরকার নাই। মনে রাখবে সহস্রারই হচ্ছে তন্ত্রমতে শিব আর কুলকুণ্ডলিনী হচ্ছে শক্তি। এই শিব ও শক্তির মিলন ঘটানোই হলো মৈথুন সাধনার লক্ষ্য। যখন দেখবে তোমার দেহস্থ চক্রমধ্যে শক্তিরূপিনী কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে সহস্রার বিগলিত মধু পান করছেন তখনই জানবে তুমি সিদ্ধি লাভ করেছ। সবই দেবীর ইচ্ছা, তুমি শুধু সাধনা করে যাও।

সাধনার এক নূতন অধ্যায় শুরু হলো এবার কমলাকান্তর জীবনে। কিন্তু সাধনায় মন দিতে গিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। সংসারে লোক বলতে অবশ্য মাত্র তিনজন মা—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আর একটি শিশুকন্যা। তাহালেও খরচ আছে। জমি জমা বলতে মাত্র দুবিঘে-মামা দান করেছিলেন। কিন্তু তাতে সারাবছরের ভাত হয় না। তার উপর নুন তেল কাপড় আছে। যজমানবাড়ীর কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন কমলাকান্ত। এগাঁ সেগাঁ যাওয়া ত দূরের কথা গাঁয়ের কোন বাড়ীতে যাওয়াও হয়ে ওঠে না। প্রায় সব সময়ই বিশালাক্ষীর মন্দিরের সামনে বনভূমিতে

মা কালীর ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকেন অথবা শ্যামাসংগীতের পদ রচনা করেন।

এই সময় পাঁচজনের পরামর্শে গাঁয়ের মধ্যে একটি টোল খোলেন কমলাকান্ত। শাস্ত্রজ্ঞান আছে। তার উপর কাব্য ও ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শী। সুতরাং ছাত্রও বেশ আসতে লাগল। কিন্তু এ কাজেও মন বসাতে পারলেন না কমলাকান্ত। টোল ছেড়ে বিশালাক্ষী মন্দিরে গিয়ে নাম জপ করতে লাগলেন।

এভাবে টোল চলা সম্ভব নয়। তাই উঠে গেল। মা অনুযোগ করতে লগেলেন। একদিন বিশালাক্ষী মন্দিরে এসে কমলাকান্তকে নির্জনে পেয়ে মা বললেন, দেখ কমলা, ধর্মকর্ম ভাল। আমি তোকে তা করতে বারণ করছি না। কিন্তু আমি বলছি কি, সংসারটাও ত ধর্ম। সে ধর্মে কি এসব করে অবহেলা করা উচিত? বামুনের ছেলে যা হোক ত একটা কিছু করতে হবে। ঘরে জমিজমা বা আয়ের কোন উপায় থাকলে তোকে বিরক্ত করতাম না।

কমলাকান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন মার কথায়। গৃহধর্মে তিনি সত্যি সত্যিই অবহেলা করেছেন। মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও মা আমি এবার থেকে যা হোক একটা কিছু করছি।

কিন্তু মা জানেন, কিছুই শেষপর্যন্ত করবেন না কমলাকান্ত। সাধনার যে সুউচ্চ স্তরে মন তাঁর উঠে গেছে সেখান থেকে মনকে সংসারের ছোট সুখ দুঃখের মাঝে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই বুঝি বাবা, তবু বউটা আর ওই দুধের বাচ্ছাটার মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে তোকে বিরক্ত করি। এক কাজ কর। তুই নাহয় আমাদের অম্বিকে কালনায় পাঠিয়ে দে। সেখানে তোর বাবার দুচারটে পুরনো যজমান আছে যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কমলাকান্ত বললেন, সবই শ্যামামায়ের ইচ্ছা। মা যা করবেন তাই হবে।

মা চলে যেতে শ্যামা মার উদ্দেশে আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, সংসার জ্বালা আর যে সহ্য করতে পারছি না মা। সব জেনেও কেন তুই আমায় সংসারে আবদ্ধ করলি? আমি যে তোকে ছাড়া আর কাউকে জানি না মা। তোকে ছেড়ে কোথাও এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।

সেদিন কমলাকান্তর মা মন্দির হতে বাড়ী গিয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখলেন। দেখেন কিছুক্ষণ আগে কোন এক অজ্ঞাতনামা লালপাড় শাড়ী পরা শ্যামাঙ্গী মহিলা এসে তাঁদের বাড়ীতে প্রচুর জিনিষপত্র দিয়ে গেছে। চাল, গম, ঘি ময়দা তৈজসপত্র এত পরিমানে দিয়ে গেছে যে তাঁদের সংসার তাতে একমাস ভাল-ভাবেই চলে যাবে।

কমলাকান্ত রাত্রিতে বাড়ী ফিরে ঘটনাটির কথা শুনে আশ্চর্য গিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর ভক্ত বা ভুতপূর্ব ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছিলেন, তাদের কেউ এভাবে কোন জিনিষ পাঠায়নি। তখন ধ্যানের মধ্য দিয়ে জানলেন, এ তাঁর শামা মায়েন কীর্তি। তাঁকে পরোক্ষভাবে দাক্ষিণ্য দেখিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিচ্ছেন না। তবে কি এখনো মন্ত্রসিদ্ধি বা মন্ত্র-চৈতন্য হয় নি যার জন্য সাক্ষাৎদেবীদর্শন লাভ করে ধন্য হতে পাচ্ছেন না তিনি?

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে নিকটস্থ আম বনে আর বট শিমূলের মাথায়। চারিদিকের নিঝুম নিস্তব্ধ মাঠ দিনের শেষে হয়ে উঠেছে আরও নিস্তব্ধ। আবার একটি পদমুখে মুখে রচনা করে গাইতে লাগলেন। তাঁর আশার তরু আজও মঞ্জরিত হয়ে উঠল না। সব শাখাগুলি তাঁর শুকিয়ে গেল একে একে; তবু একটি মঞ্জরিও দেখা দিল না সে তরুতে।

কমলাকান্ত বিশালাক্ষী দেবীর ভোগরাগের সব ব্যবস্থার ভার স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। দেবীর নিত্য পূজার জন্য কোন জমি-জমা বা সেবাইতের ব্যবস্থা নাই। তবু কোথা হতে রোজ পূজার সমস্ত উপচার যোগাড় হয়ে যায় তা বোঝাই যায় না। রাত্রিতে রোজ মাছ রান্না করে ভোগ দিতে হয়। তাও কোথা হতে যোগাড় হয়ে যায়। চান্না গাঁয়ের এক গোয়ালা দুধ ঘি যা লাগে দিয়ে যায়। কোথা হতে এক বাগ্দী রমণী মাছ দিয়ে যায় ঠিক সময়ে। তারপর তাঁর ভক্তেরা পালা করে দিয়ে যায় আতপ চাল আর ফল মূল।

সংসারও তখন হতে বেশই চলে যায়। সেদিন থেকে সংসারের অভাব অনটন সম্পর্কে কোন অভিযোগই শুনতে পান না মার কাছে। এই সময় কমলাকান্ত কিছু আগমনী বিষয়ক পদও রচনা। অখণ্ড ভক্ত হৃদয়ের আকৃতির সঙ্গে যে জগজ্জননীর রূপের ভজনা করে এসেছেন এতদিন তাঁকে এবার বাঙালী ঘরের এক সাধারণ মেয়ের মত উমা রূপে দেখলেন। গিরিরাজ দক্ষ আর তাঁর স্ত্রী মেনকার মেয়ে শিবের ঘরণী উমা। কৈলাসপুর হতে তাকে বাপের বাড়ী আনাবার জন্য মার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। যিনি সমগ্র জগতের জননী বহ্মময়ী, লীলাময়ী, ইচ্ছাময়ী, কালভয়হারিণী তাঁকে এক সাধারণ মানবীর কন্যারূপে চিত্রিত করে বড় আনন্দ পেতেন কমলাকান্ত।

একদিন গভীর রাত্রিতে বিভোর হয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো মন্দিরের ভিতর কে যেন বসে তাঁর গান শুনছেন। কমলাকান্ত ছিলেন মন্দিরের দাওয়ার ঠিক নিচে। চমক ভাঙতে কমলাকান্ত মন্দিরে ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না। ভিতরে-বাইরে ভীষণ অন্ধকার। ঘরের প্রদীপটি কখন নিবিয়ে গেছে হাওয়ায়। সন্ধ্যার পর হতে এমনি অন্ধকারে তন্ময় হয়ে বসে মার

নাম গান করেন কমলাকান্ত। কি মনে হলো, কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কে গো ঘরের ভিতর ? কে বাছা অন্ধকারে ?

ঘরের ভিতর হতে নারীকণ্ঠে কে উত্তর দিল, আমি ধর্মদাস গোয়লার মা গো। আমায় চিনতে পারছ না। তোমার গান শুনতে আমি বড় ভালবাসি। তুমি অত খেয়াল কর না, আমি রোজ তোমার গান শুনতে আসি।

মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল কমলাকান্তর দেহ। কারণ তাঁর খেয়াল হলো, ধর্মদাসের মা বহুদিন আগে মারা গেছেন এবং সে বিশালাক্ষী দেবীকেই মা বলে ডাকে। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মন্দিরের ভেতর ছুটে গেলেন কমলাকান্ত। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, না তুই আমার মা। ধর্মদাসের মা অনেক আগেই মারা গেছে। কেন তুই আমায় ছলনা করিস ? তুই আমার মা। আমার মা।

দেবীর বেদীর উপর এ কথা বলতে বলতে আছাড় খেয়ে পড়লেন কমলাকান্ত। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সারা-রাত্রির মধ্যে সে মূর্ছা আর ভাঙল না। স্বপ্নে দেখলেন, শ্যামা মা তাঁকে কোলে নিয়ে বসে আদর করছেন।

পরদিন সকালে অনেককে বললেন, গতরাতে তাঁর শ্যামা মা তাঁকে কোলে নিয়েছিলেন।

কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। কমলাকান্তের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সুদূর অম্বিকে কালনা হতেও দু চারজন আসতে লাগল। তাদের গাঁয়ের ছেলে কমলাকান্ত আজ কতবড় সাধক হয়েছে তা তারা নিজের চোখে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

চান্না হতে বর্ধমান বেশী দূরের পথ নয়। তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন তেজচন্দ্র। কমলাকান্তের শাক্ত পদ রচনা ও তাঁর সাধন ভজনের কথা শুনে তিনি আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। একদিন

তাঁর একজন বিশ্বস্ত লোক কমলাকান্তের কাছে পাঠিয়ে কখন কিভাবে তার সঙ্গে দেখা হবে বিস্তারিত সব বিবরণ জেনে নিলেন।

এই সময় দু'চার জন ঘনিষ্ঠ ভক্ত প্রায়ই আসা যাওয়া করত। তাঁর বাড়ীতেও তারা সাহায্য করত। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে শোধিত কারণ বারিরূপে কিছু কিছু সুরাপান করতেন কমলাকান্ত। কিন্তু এক একদিন সে সুরার মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বেশী হয়ে, গেলেও কিছুতেই বিঘূর্ণিত হত না তাঁর দৃষ্টি বা মন। মদের সমস্ত মাদকতাকে আত্মসাৎ করে নেবার তাঁর অদ্ভুত শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত সকলে। যতই পান করতেন কমলাকান্ত শুধু বারবার বলতেন, পৃথিবীতে যত সুরা আছে সব নিয়ে আয়; আজ আমি সব পান করব। তাতে আমায় কিছুই হবে না। সমস্ত সুরা সুধা হয়ে যাবে। সে সুরা পান করে আমায় কুলকুণ্ডলিনী মা অনন্ত যোগনিদ্রা হতে জেগে উঠবে; সে সুরার আহুতি পেয়ে আমার চিদাগ্নি দ্বিগুণ বেগে স্ফুরিত হবে।

এই সময় মৈথুনকালেও অসামান্য শক্তির পরিচয় দেন কমলাকান্ত। সার্থক কৌলাচারী সাধকের পক্ষে শুক্রপাত একেবারে বর্জনীয়। কমলাকান্ত যখন ঋতুকালে তাঁর স্ত্রীর কাছে শুদ্ধমনে তাকে শক্তির অংশ রূপে জ্ঞান করে গমন করতেন, তখন রেতঃপাত না ঘটিয়ে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে উর্ধ্বরেতা পুরুষের মত সমস্ত রেতঃকে দেহের উর্ধ্ব অংশে আকর্ষণ করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন যোগবলে। উর্ধ্বরেতা পুরুষের লক্ষণস্বরূপ তাঁর মুখমণ্ডল ও দেহগাত্রে এক রক্তাভ লাবণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকত।

নিজের পরিণীতা স্ত্রী ছাড়া কখনো কোন ভৈরবী গ্রহণ করেননি কমলাকান্ত। স্থূল পঞ্চতত্ত্বের শেষ তত্ত্ব মৈথুন সাধনের সময় স্ত্রীকে সাধন ক্ষেত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের কাছে আনা সম্ভব নয়। তাই তিনি কখনো মৈথুনের বিকল্প হিসাবে কতকগুলি ফুলের মিলন

ঘটিয়ে সেই সব ফুল হাতে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান করতেন। আবার কখনো আন্তর মৈথুন সহযোগে যোগময়ী উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

কৈলাসতন্ত্রে কতকগুলি ফুলকে লিঙ্গপুষ্প বলা হয়, যেমন চাঁপা, ধুতরো, করবী। আবার কতকগুলি ফুলকে যোনিপুষ্প বলে, যেমন বক, মরুবক বা মারগ, দ্রোণ। এই দুই জাতের ‘ফুলকে একত্র করে দেবীকে উৎসর্গ করে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন কমলাকান্ত। এইভাবে মৈথুন সাধনের ফল পাওয়া যায়।

আবার কখনো কখনো সূক্ষ্ম বা আন্তর মৈথুন সাধনও করতেন কমলাকান্ত। বাহ্য মৈথুনে যেমন আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অপুলেপন, রমণ ও রেতঃপাত এই ছয়টি অঙ্গ আছে। আন্তর মৈথুনেও তেমনি সাধকেরা এই ছয়টি অঙ্গকে ছয়টি প্রতীক অর্থে গ্রহণ করেন। তাঁদের কাছে আলিঙ্গন হচ্ছে ন্যাস, চুম্বন হচ্ছে ধ্যান, শীৎকার হচ্ছে আবাহন, অনুলেপনের অর্থ নৈবেদ্য, জপকর্মের নাম রমণ এবং বেরঃপাত হলো দক্ষিণা দান।

কমলাকান্ত বলতেন, স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন পঞ্চতত্ত্ব সাধনের লক্ষ্য হলো অন্তরের মধ্যে সেই শক্তিকে জাগানো। তবে স্থূল পঞ্চ-ম-কার যোগে শক্তিকে জাগানোর পর সূক্ষ্ম পঞ্চ-ম-কার সাধন ও পূজা অর্চনা খুব তাড়াতাড়ি সফল হয়।

ভক্তদের আরো সহজভাবে শক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন কললাকান্ত। বলতেন, মানুষের মেরুদণ্ডের দুই ধারে ইড়া ও পিংগলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। তার মাঝখানে আছে সুষুম্না নাড়ী। এই নাড়ীর নিচে মুলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত থাকেন। ইনি সর্পাকারা কুণ্ডলিনী ও কোটি বিদ্যুৎ সমপ্রভা। মুলাধারে অবস্থান কালে ইনি স্বয়ম্ভু শিব লিঙ্গকে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করে নিদ্রাভিভূত থাকেন।

তন্ত্র-সাধকদের কাছে এই শক্তিই তাঁদের আরাধ্যা দেবী। বৈদিক যোগীগণ একেই বলেন আত্মশক্তি। শাস্ত্র মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে নয়টি পদ্ম বা চক্র আছে। সর্বনিম্ন প্রান্তে আছে মূলাধার পদ্ম। তারপর যথাক্রমে আছে স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ললনা, গুরু ও সহস্রার। তন্ত্রমতে এই সহস্রার পদ্মে অবস্থান করেন শিব, বৈদান্তিক যোগে যাকে বলে ব্রহ্ম। এই যোগে যাকে বলে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মের মিলন, তন্ত্রযোগে তাকেই বলে শিব শক্তির মিলন! তন্ত্র সাধকের সাধনার ফলে মূলাধারে নিহিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠে সমস্ত চক্রগুলি একে একে ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। তখনই সিদ্ধি লাভ করে সাধক।

একদিন মহারাজ তেজচন্দ্র বর্ধমান হতে সদলবলে নিজেই চান্নার আশ্রমে এসে হাজির হলেন। বর্ধমান হতে বাদশাহী সড়ক ধরে সোজা এসে কুলচণ্ডীর চটি হতে পাল্কি করে এসেছেন। সঙ্গে বহু লোক লস্কর ও জিনিষ পত্র।

মহারাজ তেজচন্দ্র একটি স্বরচিত শ্যামাসংগীত গাইবার জন্য কমলাকান্তকে করযোড়ে অনুরোধ করলেন। মুখে মুখেই একটি নূতন পদ রচনা করে গাইতে লাগালেন কমলাকান্ত। পদটি মনোদীক্ষা বিষয়ক। মনকে সম্বোধন করে বলছেন, আমার আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে স্থাপন করেছি। হে মন তুমি এস, তোমায় আমায় আমার মাকে প্রাণভরে দেখি। বাইরের আর কেউ যেন দেখতে না পারে। জ্ঞানকে প্রহরীরূপে হৃদয়ের দ্বারে রেখে দাও যাতে সেখানে কোন অবিদ্যা বা অহংকার প্রবেশ করতে না পারে। অন্তরের সব কামনা বাসনাগুলিকেও মাতৃমন্ত্রে এমন ভাবে দীক্ষিত করো যাতে তারাও পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য বস্তু হতে বিরত হয়ে মাকে অনবরত ডাকতে পারে।

একাধারে তন্ত্র সাধনা ও যোগবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন কমলাকান্ত। তাঁর তত্ত্বজ্ঞান, কবিত্বশক্তি ও কণ্ঠের মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন মহারাজ তেজচন্দ্র। শ্রদ্ধায় অবনত হলো তাঁর মাথা। বিদায় কালে মায়ের পূজার জন্য কিছু টাকা ও বহু জিনিষপত্র দান করতে চাইলেন। কিন্তু শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে কমলাকান্ত বললেন, মাপ করবেন মহারাজ, আমি একমাত্র আমার সাধন পথের অনুগামী মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তদের দানই গ্রহণ করি। আপনি আমার গুনমুগ্ধ; কিন্তু আমার মার সঙ্গে আপনার ত কোন আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় নাই। আমি কেমন করে আপনার দান গ্রহণ করব?

মহারাজ তেজচন্দ্র তৎক্ষণাং কমলাকান্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন!

তেজচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা শুনে ভক্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই তেজচন্দ্র বর্ধমান শহরের কাছে কোটালহাটে একটি শ্যামা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে কমলাকান্তকে নিয়ে যান। সেখানে মন্দির নির্মাণ করে কমলাকান্তের সাধন ভজনের সব রকমের সুব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁর আবাল্যের সাধন ক্ষেত্র চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরে চলে আসতেন কমলাকান্ত। সুবিধা অসুবিধা সুব্যবস্থা অব্যবস্থা অভাব ঐশ্বর্য সবই সমান তাঁর কছে।

কোটালহাটে এক দুর্যোগঘন রাত্রিতে শান্ত করুণাময়ী শ্যামা মাকে ভয়ংকরী মূর্তিতে দেখেন কমলাকান্ত। সেদিন অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটি লোক মানত করে একটি মোষ বলি দিতে আসে। দুর্যোগঘন সেই ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে বলিসহ ষোড়শোপচারে পূজার সময় ভীমা করালবদনারূপে দক্ষিণা কালীরূপে মাকে দেখে অভিভূত হয়ে যান কমলাকান্ত। কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডমালায় বিভূষিত গলদরুধিরচর্চিত মহামেঘপ্রভা শ্যামা মায়ের মুক্তকেশী দিগম্বরী মূর্তি

দেখে উপস্থিত সকলে ভীত হয়ে পড়ল। এ দিকে মার ধ্যানে তন্ময় হয়ে পড়েছেন কমলাকান্ত। পরে তিনি সকলকে বললেন, মা কথনো অগ্নি মূর্তি ধারণ করলে সন্তান কি ভীত হয়? মাকেই আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরে। যাতে মার সন্তানরা আরো বেশী করে তাঁকে চায় সেইজন্যইত মা এমনি করে ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন।

প্রথমে মা, তার কিছু দিন পর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও মারা গেলেন। একে একে সংসারের বন্ধনগুলি ছিঁড়ে গেল আপনা হতে। এখন শুধু একমাত্র একমাত্র আত্মীয় বলতে কন্যাটা। কিন্তু সব কিছুতেই নির্বিকার নির্লিপ্ত তাঁর মন। যিনি আদিভূতা সনাতনী সদানন্দময়ী কালীর সন্তান তাঁর কাছে সুখ দুঃখ সবই সমান। তাঁর ধর্ম অধর্ম, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, আত্মীয় পর বলে কিছুই নাই। সবই তিনি মার চরণে অর্পণ করে হয়েছেন মুক্ত পুরুষ। মা তাঁকে যা বলান তিনি তাই বলেন, মা তাঁকে যেমন রাখেন তিনি তেমনি থাকেন।

কমলাকান্তের এএক অদ্ভুত সাধনা। তিনি মুক্তিও চান না। সাধারণতঃ সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি কোন না কোন মুক্তির জন্য সাধকেরা সাধনা করেন। অর্থাৎ আরাধ্য দেবতাকে তাঁরা অন্যতর একটি লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু কমলাকান্তের কাছে তাঁর আরাধ্য দেবীই হচ্ছেন লক্ষ্য। জীবনে অন্য কোন লক্ষ্য নাই। তিনি নির্বাণ চান না, মোক্ষ চান না, স্বর্গবাস পুণ্য কিছুই চান না। তিনি শুধু তাঁর শ্যামা মার রাঙা চরণ দুটি হৃদয়ে রেখে জন্ম জন্মান্তর ধরে নিরীক্ষণ করতে চান।

কোন তীর্থে যেতে যাইতেন না কমলাকান্ত। সার্থক কৌলাচারী সাধকের তীর্থ ভ্রমণ বা পরিব্রাজনের কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে একটি পদ রচনা করে কমলাকান্ত তাঁর মনকে বলেছিলেন,

হে মন, কোনখানে কারো ঘরে যেতে চেও না। নিজে অন্তঃপুরে খোঁজ করে দেখ, সেখানে পরমধন পরশমনি আছে। তীর্থ গমন শুধু দুঃখ ভ্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলাধার পদ্মে যে সদানন্দময়ী মা বিরাজ করছেন তাঁর আনন্দ স্রোতে স্নান করে শীতল হও।

তবু একবার তাঁকে কাশী যেতে হলো। সেখানকার বাঙালী সমাজ ঘটা করে প্রথম কালীপূজো করছে। তারা কিছুতেই ছাড়ল না। দল বেঁধে এসে কমলাকান্তকে নিয়ে গেল। একজন সিদ্ধ কালী সাধক হিসেবে কমলাকান্তের নাম সেখানে অনেক আগেই ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে। এবার অন্ততঃ পুজোটা তাঁকেই করতে হবে। এই সকলের ইচ্ছা। কাশীর বিশ্বনাথ দর্শন করা হয়নি কখনো; তাই কমলাকান্ত ভাবলেন, এক কাজে দুই কাজ হবে।

পুজোয় বসে বিধিমত আচার অনুষ্ঠানগুলি মেনে চলেন না কমলাকান্ত। উল্টো সুরাপান করেন। তাঁর মত সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে এ সব মেনে চলা সম্ভব নয়। যারা তাঁকে জানে তারা কিছু মনে করে না। কিন্তু যারা জানে না তাদের বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

পুজোয় বসে কমলাকান্ত যখন সুরাপান করতে শুরু করলেন তখন কাশীর অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করল। তারা বলল, উনি যদি সত্যি সত্যিই সিদ্ধ পুরুষ হন তাহলে প্রমাণ দিন। দেবীকে জাগ্রত করুন সাধনার বলে।

সুরাপানের ফলে কখনো কোন মাদকতা জাগে না কমলা-কান্তের মনে। পূর্ণ স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হয় না তাঁর এতটুকু। তাঁকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা এই সব বাদ প্রতিবাদ অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলেন তিনি। এবার তিনি ধৈর্য হারালেন।

উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, কই, কে মাকে দেখবে এগিয়ে আসুক। মাকে দেখতে হলে বহু সাধনা করতে হয়।

মন্ত্রসিদ্ধি না হলে দেবী দর্শন হয় না। আর প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা বলছিস ? মা যার অন্তরে জেগে বসে আছেন, সে যে কোন মুহূর্তে যে কোন বস্তুর মধ্যে মায়ের সেই প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ আর এখন বেশী কথা কি।

এই কথা বলার পর বলির খড়্গাটা তুলে প্রতিমার একটি হাতে আস্তে একটু আঘাত করতেই মাটির মূর্তিতেই রক্ত ঝরতে লাগল। বিস্মিত ও ভীত হয়ে সকলে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে সাষ্টাংগ প্রণিপাতে লুটিয়ে পড়ল। কমলাকান্ত যে একজন মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ এ বিষয়ে আর কারো কোন সন্দেহ রইল না। সকলেই তাঁর চরণ বন্দনা করতে লাগল।

এর পর থেকে কমলাকান্তের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদ প্রায়ই কমলাকান্তের কাছে ছুটে আসেন। কোটালহাটের মন্দিরে এসে তাঁর পুজো ও যাগযজ্ঞ দেখেন। এই প্রথম যৌবনেই পুত্রের এই ধর্মপ্রীতি দেখে খুশি হলেন মহারাজ তেজচন্দ্র। কমলাকান্তের উপরেই তাঁকে দীক্ষা দেবার ভার দেন।

দীক্ষা নেবার আগেই কমলাকান্তের অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন প্রতাপচাঁদ। দীক্ষা নেবার পর থেকে কমলাকান্তের কাছেই সব সময় থাকতে লাগলেন। তাঁর সান্নিধ্যের জন্য অনুক্ষণ এক অনিবারণীয় আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। বর্ধমানে রাজবাড়ীতে পর পর তিনটি দিনও কাটাতে পারতেন না। তুচ্ছ মনে হত সমস্ত রাজ সম্পদ ও আরাম উপভোগ।

একদিন প্রতাপচাঁদ বর্ধমান হতে কোটালহাটের আশ্রমে গিয়ে দেখেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু কমলাকান্ত তাঁর ঘরে শায়িত অবস্থায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছেন। দেবীর সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গেছে। মন্দির রক্ষক ও পরিচারক ঘরের দরজা থেকে

ডাকাডাকি করছে। কিন্তু কোন সাড়া নাই। একজন বলল, ঠাকুরের ধ্যানসমাধি হয়েছে। আর একজন বলল, তাহলে বসে থাকতেন; ওভাবে শুয়ে থাকবেন কেন?

প্রতাপচাঁদ সাহস করে ঘরের ভিতর ঢুকে কমলাকান্তের পাশে বসে নত হয়ে তাঁর দেহটাকে ভাল ভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু প্রাণের কোন ক্ষীণতম আভাসও খুঁজে পেলেন না সে দেহের মধ্যে। তখন শিশুর মত আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন প্রতাপচাঁদ। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছেন।

তাঁর দেখাদেখি উপস্থিত সকলেরই চোখে জল এল। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠে বসলেন কমলাকান্ত। যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এলেন পুনর্জন্ম লাভ করে। উপস্থিত সকলের চোখে জল দেখে কমলাকান্তই আশ্চর্য হলেন। বললেন, তোরা কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে?

প্রতাপচাঁদ বলল, স কি বাবা কাঁদব না? দু'ঘণ্টা ধরে আপনার দেহ অসাড় নিশ্চেতন হয়ে পড়ে ছিল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

কমলাকান্ত হেসে সহজভাবে বললেন, তোদের বলা হয় নাই। আমি একবার চান্না গিয়েছিলাম। তোরা হৈ চৈ করবি বলে কাউকে না বলেই চলে গিয়েছিলাম। ভাবলাম একবার ঘুরে আসি। কিন্তু সেই শিমূল গাছের তলায় বসে মায়ের নাম করতে করতে দেরী হয়ে গেল। মা বিশালক্ষ্মীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি আজকের? ওই থানে সাধনার আমার হাতে খড়ি। তাই মাঝে মাঝে খবর নিয়ে আসতে হয়। তা না হলে মা রাগ করবে যে। তবে এখন বয়স হয়েছে এতদূর যাওয়া আসার ধখল সহ্য হবে না। তাই কায়াটা ছেড়ে মাঝে মাঝে সকলের অলক্ষ্যে চলে যাই। যত বিপদ ত শুধু এই দেহটাকে নিয়ে। দেহের খোলটাকে ফেলে

রেখে আত্মা আমার এক মুহূর্তে বায়ুর চেয়ে দ্রুতবেগে সেখানে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে কাজ সেরে চলে আসে। কিন্তু অন্যদিন অতটা দেরী হয় না বলে তোরা বুঝতে পারিস না।

কায়াটাকে খোলার মত ত্যাগ করে আত্মা যাঁর যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোন স্থানে গিয়ে বিচরণ করতে পারে ইচ্ছামত, সেই শক্তিধর মহাসাধকের মুখপানে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সকলে। বাক্য স্ফুরণ হলো না কারো মুখ থেকে।

কমলাকান্ত বললেন, শুধু কি মা বিশালক্ষ্মী, মন্দিরের পরিবেশটারও কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। ছোট থেকে একটা মায়ায় পড়ে গিয়েছি। মন্দিরের উঠোনে বট শিমূলের ছায়ার তলে সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন। চারিদিকে ঘন আম-বন। সেই বনছায়ার ফাঁকে সারাদিন আলোছায়ার খেলা চলে। আর রাত্রিতে সেই গভীর বনান্ধকারে জোনাকিরা আলোর ফুলকি ছড়িয়ে বেড়ায়। ঝিঁঝি পোকাদের একটানা একগুঁয়ে শব্দগুলো যেন মৃত্যুর মত স্তব্ধ জমাট বাঁধা অন্ধকারের শবদেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে থাকে। সেই বনটার চারিপাশে উদার নীল আকাশের নিচে অবারিত মাঠ। আমায় তারা হাতছানি দিয়ে ডাকে মাঝে মাঝে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন প্রতাপচাঁদ। তিনি শুনেছেন, সাধকরা পূর্বজীবনের কথা কাউকে বলেন না। কোন সম্পর্ক রাখেন না বিগত জীবনের সঙ্গে। প্রাকৃত কোন বস্তুর প্রতি কোন মায়ায় তাঁরা জড়িয়ে পড়েন না কখনো।

তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে কমলাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, বুঝেছি তোর মনের কথা। কিন্তু কি জানিস? বৈদান্তিকদের সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাৎ। বেদান্ত জাগতিক যে সব বস্তুকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয় আমরা তারই মধ্যে খুঁজে পাই আমাদের জগজ্জননী মহামায়ার লীলা। সদানন্দময়ী মা আমার এই বিশ্বের

সর্বভূতে সকল বস্তুতে নৃত্য করছেন। মা আমার কোথায় নাই। তাই ত সব কিছুই ভাল লাগে আমার। কোন কিছুই মিথ্যা নয় আমার কাছে। মাঝে মাঝে এক একবার অম্বিকে কালনাতেও চলে যাই। ছেলেবেলায় মাঠের ধারে নির্জনে বসে আপন মনে যেখানে রামপ্রসাদের গান গাইতাম আর শ্যামা মাকে ডাকতাম মনে প্রাণে সেখানে আজো আমার যেতে ইচ্ছা করে।

বয়সে তখনো নবীন যুবক প্রতাপচাঁদ। সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন। উৎসাহের উচ্ছাস আছে যে পরিমাণে, সে পরিমাণে বোধশক্তির গভীরতা নাই। প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তকে ধরে বসলেন, আমাকে যোগবিদ্যা শেখাতে হবে এবার থেকে।

কমলাকান্ত শান্ত কণ্ঠে প্রতাপচাঁদকে বুঝিয়ে বললেন, এ বিদ্যা আয়ত্ত করা বড় কঠিন বাবা। এর জন্য যে কঠোর সাধনা ও মনঃ-সংযমের দরকার তা তোমার জন্য নয়।

কিন্তু প্রতাপ সে কথা শুনলেন না। তিনি বললেন, কেন নয় গুরুদেব, সদ্‌গুরু কাছে থাকলে সাধকের সিদ্ধি লাভে কখনই দেরী হয় না।

শোনা যায়, তন্ত্র সাধনা তখন থেকেই কিছু কিছু শুরু করেন প্রতাপচাঁদ। কিন্তু তবু তার গূঢ় কঠিন পদ্ধতিগুলি তাঁকে শেখাননি কমলাকান্ত। তিনি শুধু প্রতাপচাঁদকে বারবার এক কথা বলে নিরস্ত করতে চাইতেন, আগে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে সংসার-ধর্ম পালন কর, সন্তানজ্ঞানে প্রজাপালন করো। তারপর পুত্রের হাতে সব ভার অর্পণ করে সাধন ভজন যা খুশি করতে পার। সকল ধর্ম কর্ম সকলের জন্য নয় প্রতাপ।

শোধিত কারণ বারিরূপ সুরাপান করতেন কমলাকান্ত। অথচ সে সুরার কোন মাদকতা প্রকাশ পেত না দেহে বা মনে। তাই প্রতাপচাঁদও মাঝে মাঝে একটু করে সুরাপান করতেন। এ খবর মহারাজ তেজচন্দ্রের কাছে যেতে তিনি বড় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন।

চপলমতি যুবক পুত্রের যাতে আত্মিক উন্নতি হয় তারই জন্য গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে নিশ্চিন্তে রেখে দিয়েছেন তাঁর পুত্রকে। তাই সেই পুত্রের শোচনীয় অধঃপতনের কথা শুনে ব্যথিত হয়ে পড়লেন বিশেষভাবে। অভিমান জাগল গুরুদেবের প্রতি। লোকজন নিয়ে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লেন তেজচন্দ্র। তিনি নিজে তদন্ত করে দেখবেন, পুত্র তাঁর কি অবস্থায় আছে।

কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকেই দুঃখে মর্মাহত হলেন তেজচন্দ্র। তিনি দেখলেন, মন্দিরের বিগ্রহের সামনে কমলাকান্ত এক মনে গান গাইছেন। পাশে একটি মাটির হাঁড়িতে মদ রয়েছে আর তার থেকে মাঝে মাঝে এক পাত্র করে খাচ্ছেন কমলাকান্ত। অদূরে যুবরাজ প্রতাপচাঁদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র ধিক্কার দিয়ে গুরুদেবকে বললেন, মাপ করবেন, আপনার এই হীন কাজের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। এখন আমার পুত্রের অধঃপতনের কারণ আমি বুঝতে পারছি। প্রতাপ বাড়ী এসো।

সহসা কমলাকান্ত অধৈর্য হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। চোখ-দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রসনা সংযত করে কথা বল তেজচন্দ্র। তোমার লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধসাধকদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের বিচার করতে এস না।

তারপর মদের হাঁড়িটি নিয়ে এসে তেজচন্দ্রের চোখের সামনে তুলে ধরলেন. এইবার ভাল করে দেখ দেখি, তুমি যাকে সুরা বলছিলে তা সত্যি সত্যিই সুরা কিনা। চক্ষু দ্বারা দর্শন কর, হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ কর। তারপর বল।

তেজচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, এক হাঁড়ি খাঁটি দুধে পরিণত হয়েছে সেই মদ। পরে সেই দুধ থেকে মাখন ও ঘি তৈরি করে দেবীর হোম করলেন এবং সেই হোমানলে আহুতি দিলেন কমলা-কান্ত। এক নিবিড় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তেজচন্দ্র এই ব্রহ্মজ্ঞানী

সাধকের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে লাগলেন। কাঁচা মদের উৎকট গন্ধ ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে রূপান্তরিত খাঁটি গব্য ঘৃতের সুবাসে। এতগুলি লোকের সন্ধানী দৃষ্টিকে বিহ্বল ও বিপর্যস্ত করে কোন শক্তি বলে এই সাধক একটি বস্তুকে সম্পূর্ণ অন্য বস্তুতে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করলেন তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না!

পরে কমলাকান্তর নিজেই এই শক্তিরহস্যের কথাটি সহজ করে বোঝাতে লাগলেন। রক্তবর্ণ ক্রোধান্বিত চোখে ফুটে উঠেছে ক্ষমা সুন্দর এক দৃষ্টি। তাঁর পদতলে তেজচন্দ্র তখন সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে লুটিয়ে পড়লেন।

কমলাকান্ত বললেন সাধকের মন্ত্র চৈতন্য হলে সে অষ্ট সিদ্ধি লাভ করে। সিদ্ধি মানেই ঐশ্বর্য বা বিভূতি। এ বিভূতি যখন তখন প্রকাশ করতে নাই। বশিত্ব এই রকমের এক সিদ্ধি। এর বলে সর্বভূতে সমজ্ঞানী সাধক যে কোন বস্তু স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করে তার ধর্মকে নিজের বশে এনে ইচ্ছামত অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারেন। তিনি তখন হন ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁর কাছে তখন স্বর্ণ আর শূকরবিষ্ঠায় কোন প্রভেদ থাকে না। জীব ও জড়, দেব ও মানবে থাকে না কোন পার্থক্য।

তখন প্রতাপচাঁদ সেদিনকার ঘটনাটির কথা তেজচন্দ্রকে বললেন। নিজের কায়া ত্যাগ করে তিনি কি ভাবে চান্নায় চলে গিয়েছিলেন। আরো বিস্মিত হলেন তেজচন্দ্র।

কমলাকান্ত বললেন, ব্যাপ্তিরূপ যোগবিভূতির বলে সাধকেরা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে কায়া সমেত অবস্থান করতে পারেন। আমি শুধু কায়াটা এক জায়গায় রেখে অশরীরী হয়ে যাই। আসল কথা কি জান, এই সব ক্ষেত্রে আমরা দুটো জিনিষ ভাল ভাবেই বুঝতে পারি। একটা জিনিষ হলো এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ছোট বড় ভাল মন্দ, পবিত্র অপবিত্র কোন বস্তুই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য নয়।

যা কিছুর সৃষ্টি আছে, তারই কোন না কোন সার্থকতা আছে। আর একটা কথা মনে রাখবে, এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণযোগ্য সব বস্তু ও বাস্তব সত্যের ঊর্ধ্বে আত্মা বলে একটা সত্য আছে যা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত। আর সেই আত্মার শক্তি দিয়ে আত্মজ্ঞানী মানুষ পৃথিবীর সব বস্তুকে শাসন করতে পারে, বশীভূত করতে পারে।

কথা বলতে বলতে কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দেবীর ভোগারতির সময় হয়ে গেছে। তবু মন্দিরের পরিচারক কমলাকান্তকে কিছু বলতে পারছে না; তখন বুঝতে পেরে তেজচন্দ্রই মনে পড়িয়ে দিলেন, গুরুদেব মার ভোগের যে সময় হয়ে গেল। কমলাকান্ত বললেন, আমি কৌলাচারী সাধক, বৈধী আচার অনুষ্ঠান আমি আনি না। কেন আমি নাহলে মার খাওয়া হবে না? রোজই ত মাকে সাধ্য সাধনা করে খাওয়াই। আজ মা নিজে থেকে খাক কেন। যোগাড় সবইত ঠিক আছে। দুনিয়ায় মাই ত ছেলেকে খাওয়ায়। আমার সর্বনাশী শ্যামা মায়ের আবার সব উল্টো নিয়ম। ছেলে রোজ মাকে খাওয়াবে। শরীর কি রোজ খাটতে পারে। আর ক'দিনই বা এ দেহ আছে। গাছের শুকনো পাতার মত অশক্ত হয়ে পড়েছে। খসে পড়লেই হলো।

বয়স যথেষ্ট হলেও দেহ আগেকার মতই বেশ হৃষ্টপুষ্ট আছে। সুতরাং তাঁর দেহত্যাগের কথাটার কেউ কোন গুরুত্ব দিল না। সকলেই এক মনে শ্যামা মায়ের সঙ্গে তাঁর মধুর মাতা পুত্রের সম্পর্কের কথাগুলি উপভোগ করতে লাগল।

প্রতাপচাঁদ এক সময় বলে উঠলেন, আচ্ছা বাবা, কাশীতে পূজো করতে গিয়ে আর পাঁচ জনের উপর রেগে আপনার মায়ের হাতে চোট মেরেছিলেন কেন? মার হাত দিয়ে রক্ত পড়েছিল। মা আপনার উপর রাগ করেন নাই?

কমলাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, ছেলে যদি আবদার করে মার

গায়ে মৃদু আঘাত করে তাহলে মা কি আর রাগ করে? তাছাড়া সেদিন মার গায়ে আঘাত করেছি কি আর সাধ করে? মা তার নিজের মহিমায় সবাইকে দেখা দেয় না কেন! মার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে লোকে আমাকে বলবে কেন?

মহারাজ তেজচন্দ্রের বিদায় নেবার সময় কমলাকান্ত বললেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, প্রতাপকে আমি বুঝিয়ে বলছি, ওকে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে হবে। সৎপথে থেকে আগে সংসারধর্ম পালন করুক। পরে সাধন ভজন যা করবার করবে।

কমলাকান্তকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন তেজচন্দ্র। কিন্তু প্রতাপচাঁদ কেঁদে বললেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না গুরুদেব। আমাকে মাপ করবেন।

কমলাকান্ত বললেন, কিন্তু পাগল, আমি আর কদিন থাকব জানিস? আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে।

প্রতাপচাঁদ শিশুর মত সরল অথচ দৃঢ় বিশ্বাসে বললেন, আপনি ইচ্ছা করলেই ত অনেকদিন বাঁচতে পারন।

কমলাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, দেহটাকে হয়তো জোর করে টিকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু আত্মা যে আর থাকতে চাইছেনা দেহের খাঁচার মধ্যে। বলছে, অনেকদিন মাকে ছেড়ে এসেছি।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রতাপচাঁদের কৌতুহল চিরদিনই প্রখর। সেই কৌতুহলের বশেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনি যে বলেন, জগন্মাতা সব জায়গাতেই আছেন। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এই মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যেও আছেন। তা যদি হয় তাহলে কেন আপনি এজগৎ ছেড়ে এ দেহ ত্যাগ করে পরলোকে যাবার কথা ভাবছেন?

কমলাকান্ত শান্তকণ্ঠে উত্তর করলেন, মা যে আমার মহামায়া বাবা। এই আছে এই নাই। সব জায়গাতেই সব ভূতে সব বস্তুতেই আছে আবার খুজে দেখ কোথাও নাই। কত সাধাসাধি

ডাকাডাকি করে এই বিগ্রহের মধ্যে একবার হয়ত বেটিকে ধরে আনলাম। আবার একটু আনমনা হতেই দেখি পালিয়েছে। তাই এবার মাকে ধরবার জন্য এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে গেলে আর কখনো কাছছাড়া হতে হবে না মায়ের।

প্রতাপচাঁদ বুঝলেন যুক্তি দিয়ে আর ঠেকিয়ে রাখা' যাবেনা, এবার দেহত্যাগের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে উঠেছেন 'কমলাকান্ত। বয়স প্রায় আশী হলেও ইচ্ছে করলে আরও বাঁচতে পারতেন। এখনো বেশ শক্ত সমর্থ ই আছেন দেহের দিক থেকে। কিন্তু আর এ জগতে থাকতে চান না তিনি।

কমলাকান্ত আগেকার কথাটার জের টেনে বললেন, তাছাড়া একদিন না একদিন এ দেহ ত্যাগ করতেই হবে বাবা। মানুষের আত্মাই অমর; দেহ ত অমর নয়। দেহ ধারণ করলেই জীর্ণ বাসের মত তা একদিন ত্যাগ করতেই হবে। আত্মার অমরত্ব জানবার জন্যই সাধনা করেন সাধকেরা আর সেই আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলেই মোক্ষলাভ করেন তাঁরা।

প্রতাপচাঁদ কাতরভাবে অনুরোধ করলেন, একান্তই যদি দেহ-ত্যাগ করেন তাহলে আর কিছুদিন দয়া করে অপেক্ষা করুন, বাবাকে খবর দিই। অন্তিম কালে তিনি আপনাকে না দেখতে পেলে সারাজীবন তাঁর খেদ থাকবে। প্রতাপচাঁদের কথামত সত্যি সত্যিই মৃত্যুর গতিকে কিছুকালের জন্য রোধ করলেন কমলাকান্ত। জীবনের জীর্ণ দ্বারপথে মৃত্যু উপস্থিত জেনেও তাকে অধীনস্থ ভৃত্যের মত বসিয়ে রাখলেন। প্রতাপচাঁদ বুঝলেন, যে সে সাধক কখনো ইচ্ছামৃত্যু লাভ করতে পারে না; একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষেরাই মৃত্যুকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে চলতে পারেন। কমলাকান্ত সেই সিদ্ধ পুরুষদের অন্যতম। তাঁকে হারাতে হবে জেনে সুতীব্র বেদনা বোধে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

তেজচন্দ্র যথাসময়ে এলেন। সত্যি সত্যিই তাঁর মৃত্যু দিন-কতকের জন্য স্থগিত রেখেছিলেন। তেজচন্দ্র এসে কমলাকান্তকে কাটোয়ার গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

কমলাকান্ত কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আমি এই মন্দিরের সামনে মুক্ত তৃণভূমির উপর দেহত্যাগ করব। আমার শ্যামা মার মূর্তিখানি দেখতে দেখতে শেষবারের মত চক্ষু-নিমীলিত করব আমি। এক মায়ের ছেলে হয়ে ও সারাজীবন তাঁকে ডেকে শেষ সময়ে অন্য মায়ের কাছে যাব কেন? তাছাড়া আমার মাই বা কম কিসে? তাঁরই মধ্যে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী। গঙ্গা তো দূরের কথা সপ্ত সমুদ্র প্রবাহিত তাঁর শিরায় শিরায়। কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারকার আলো তাঁর ত্রিনয়নে।

শেষ বিকেলের নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে মন্দির প্রাঙ্গনের সবুজ ঘাসের উপর। একবার শুধু বিশালাক্ষী মন্দির ছাড়া সারা জীবনের কোন কথাই মনে পড়লনা কমলাকান্তের। ধ্যান সমাধিতে বসলেন কমলাকান্ত। দেখতে দেখতে এক মহা যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন এইভাবে বহুক্ষণ থাকার পর তাঁর আত্মাহীন অসাড় দেহখানি আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল তৃণভূমির উপর আর সঙ্গে সঙ্গে কোন সে পাতাল গর্ভ থেকে পুন্যতোয়া গঙ্গার একটি ক্ষীণ ধারা মৃত্তিকা ভেদ করে বেরিয়ে এসে কমলাকান্তের দেহগাত্রকে অভিসিঞ্চিত করল, কেউ তা বুঝতে পারল না।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল উপস্থিত সকলে। এমন আশ্চভাবে পূর্ণ হবে মহারাজ তেজচন্দ্রের মনস্কামনা তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

বামা ক্ষ্যাপা

সেদিন ফাল্গুণের শিবচতুর্দশী। আটলা গাঁয়ের সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা হতে এক নিদারুণ উদ্বেগের পর পর রাত্রি ঠিক তৃতীয় প্রহরে স্থির ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের দাওয়ায় বসলেন। বসে বাড়ীর সামনের শূন্য অন্ধকার মাঠটার পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। অন্ধকার গভীর হলেও সে অন্ধকারকে বড় মধুর বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছিল দূর আকাশের নক্ষত্রগুলাকে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। আশা ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতির এক তীব্র দোলায় দুলতে লাগল সর্বানন্দের মনটা। নবজাতকের জন্মতিথিও ক্ষণটি বড় পবিত্র। বলা যায় না, এই পুত্রই হয়ত বা একদিন শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এক খ্যাতিমাণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রূপে তাঁর বংশের ও গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

শিবচতুর্দশীর এই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ব্রত উপবাসকারীরা স্নানান্তে "বামদেবায় নমঃ" বলে দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করে। সর্বানন্দ তাই সখ করে পুত্রের নাম রাখলেন বামাচরণ।

সহসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। আর সেই কথার এক আশ্চর্য পুলকে মৃদু শিহরিত হয়ে উঠল তাঁর সকল অঙ্গ। দেখতে দেখতে সেই পুলকের শিহরণ সঞ্চারিত হলো উঠনের মৃদুবিকম্পিত ঘাসে ঘাসে; সামনের মাঠ জোড়া ঘন অন্ধকারে। নিয়মিত কালীসাধনা না করলেও শাক্তশাস্ত্র কিছু কিছু পড়া আছে সর্বানন্দের। কিন্তু তাই বলে আজ ঠিক

এই মুহূর্তে মাঠের এইশান্ত নরম অন্ধকার দেখে কালীরূপিনী ব্রহ্ম-শক্তির কথা মনে পড়বে, এটা সত্যই অদ্ভুত কথা বলে মনে হলো তাঁর। তাঁর সহসা মনে হলো, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মশক্তি তাঁর বিশাল রাজদন্তের দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় করার পর যে শূন্যতা ও অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল, কালিকা দেবীর কৃষ্ণ মূর্তি তারই প্রতীক। আরও মনে হলো শূন্য মাঠের ওই সঘন অন্ধকার এক বিশাল কালীমূর্তিরূপে তাঁর ক্রন্দনরত নবজাত শিশুপুত্রকে যেন এক আশ্চর্য বরাভয় দান করছে।

তাঁর নবজাত পুত্রের জন্মকালটি লিখে রাখলেন সর্বানন্দ। ১২৪৪ সাল, ১২ই ফাল্গুন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই হতাশ হলেন সর্বানন্দ। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত আশা করেছিলেন তিনি সেই পুত্রের পাঠাভ্যাসে মোটেই মন নেই। এটা ভালকথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য। পাঠাভ্যাসে মন না থাকলেও কোনরূপ চঞ্চলতা নেই এ শিশুর মধ্যে। খেলাধুলাতেও মন নেই। সাধারণতঃ ক্রীড়াচঞ্চলতার জন্যই ছেলেদের পড়াশুনো হয় না। কিন্তু এ শিশু সব সময়ই শান্ত। এত শান্তশিষ্ট ছেলে যেন কেউ কখনো দেখেনি। আর একটা আশ্চর্যের কথা। মানুষের সঙ্গ সব সময় এড়িয়ে চলে এ ছেলে। প্রকৃতিই যেন তার একমাত্র খেলার সাথী। সব সময়েই মাঠে ঘাটে নদীর ধারে থাকতেই সে বেশী ভালবাসে।

গাঁয়ের শেষে মাঠের ধারেই বাড়ী। তবু প্রায়ই গাঁ ছেড়ে দূর মাঠে অথবা দ্বারকা নদীর ধারে ঘন বুনো জাম ও শাল বনের মাঝে গিয়ে বসে থাকে বালক বামাচরণ। দিনের বেলায় দূর আকাশের দিকে এবং রাত্রিবেলায় অন্ধকার নক্ষত্রগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থাণুর মত স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে থাকেন। কিন্তু সর্বানন্দ বুঝতে পারেন না বামাচরণের এই দৈহিক অচঞ্চলতার অন্তরালে চিরচঞ্চল একটি মন মাঠভাঙ্গা বাতাসের মত দ্বারকা

নদীর ঢেউভাঙ্গা জলের মত কিসের খোজে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে অবিরাম।

গাঁয়েই বাড়ীর অদূরে টোল। ব্রাহ্মণ প্রধান গাঁ হিসেবে আটলার একটা খ্যাতি আছে এ অঞ্চলে। সংস্কৃত পণ্ডিতের অভাব নাই। তবু এদেরই মাঝে থেকে সারাজীবন মুর্খ হয়ে রইবেন বামাচরণ। গাঁয়ের কোন কোন ঠোঁটকাটা লোক সর্বানন্দের সামনেই বলেন, বামুনের ছেলে হয়ে শেষকালে গরুর বাগাল্গি করবে।

যে যাই বলুক সর্বানন্দ কিছু চাপ দেন না ছেলের উপর পড়াশুনোর জন্য। শান্তিপ্রিয় অদৃষ্টবাদী লোক তিনি। যার যেটুকু হবার তা ঠিকই হবে, এই তাঁর বিশ্বাস। তাছাড়া ছেলেকে শাসন করবার কোন সংগত অবকাশ খুজে পান না সর্বানন্দ। কোন দৌরাত্ম্য নাই, পরের অনিষ্টসাধন নাই, কলহবিবাদ নাই। তাঁর ছেলের একমাত্র দোষ পড়ায় মন বসাতে পারে না। কিন্তু শুধু কি শাসনের তীব্রতার দ্বারাই তার মনের গতি পরিবর্তিত হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না সর্বানন্দ। তাই চুপ করে থাকেন।

বামার বয়স তখন দশ কি এগার। একদিন তার সম্বন্ধে একটা কথা শুনে বিস্মিত হয়ে উঠল গাঁয়ের সকলে। আটলা গাঁয়ের দক্ষিণ পূর্ব দিকে দ্বারকা নদীর ওপারে বনমধ্যস্থ মহাশ্মশানের শেষে তারাপীঠের যে বিরাট মন্দির চূড়া দেখতে পাওয়া যায়, রোজ একবার করে সেখানে যায় বামা। রুদ্ধদ্বার মন্দিরের সামনে মাথা ঠুকে আকুল কণ্ঠে বলে, আমার কিছু করলে না মা, আমি ত তুমি ছাড়া আর কিছুই জানি না। জ্ঞান, বিদ্যা, যশ, অর্থ কিছুই আমার নাই।

একথা শুনে কিন্তু খুশিই হলেন সর্বানন্দ। এত অল্প বয়সে এত গভীর ধর্মপ্রবণতা ও দেবভক্তি কোন সাধারণ ছেলের মধ্যে দেখাই

যায় না। এ প্রবণতা হয়ত বামাচরণের ভবিষ্যৎ জীবনের কোন মহত্তর পরিণতিকেই সূচিত করছে। লৌকিক বিদ্যায় কৃতী পুরুষ না হলেও তাঁর বামা হয়ত দেবীর অলৌকিক অহেতুক কৃপা লাভ করে এক পরম ভক্ত সন্তানরূপে চিহ্নিত হয়ে উঠবে দেশে। তবু একথা স্পষ্ট করে ভাবতে সাহস হলো না সর্বানন্দর। শুধু সেই অস্পষ্ট ভাবনাটা অতি সংগোপনে অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জরিত হতে লাগল তাঁর মনের নিভৃতে।

একবার একটি ঘটনায় বামাচরণকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো সারাগাঁয়ে।

একদিন দেখা গেল গাঁয়ের মধ্যে একটি খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে। লেলিহান আগুণের শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। গাঁয়ের সব লোক ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে আগুন নেভাতে লাগল। চারিদিকে খড়ের ঘর। সে আগুন একবার কোন ঘরে গিয়ে লাগলে সমস্ত গাঁ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এমন সময় দেখা গেল, সেই খড়ের গাদার একধারে অবিচলিত ও তন্ময় হয়ে বসে কী ভাবছে বামাচরণ। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল।

এই ঘটনাটির দুইরকমের প্রতিক্রিয়া দেখাদিল গাঁয়ের লোকের মনে। একদল বলল, বামাই আগুন লাগিয়েছে। উপরে ভাল মানুষের ভাব দেখায়; ভিতরে মিচকে পোড়া শয়তান।

আর এক দল বলল, তা কখনো হতে পারে না। বামা আগুন লাগালে নিশ্চয় পালাত। সত্যিই ও ভালমানুষ আর ভাবুক। অন্তরে ওর নিশ্চয় কোন বস্তু আছে; তা না হলে এই জ্বলন্ত আগুনের কাছে এমন নির্ভীকভাবে বসে থাকতে পারত না।

এদিকে তারাপীঠের প্রতি বামাচরণের আসক্তি নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। মার প্রতি শিশুর প্রথম আসক্তি যেমন স্তনদেশ হতে ক্রমে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে

ছড়িয়ে পড়ে, তারা মার প্রতি বামার আসক্তিও তেমনি মন্দিরকে কেন্দ্র করে ক্রমে সারা তারাপীঠের নদী, মাঠ, বন, পথ ঘাট সব কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সব কিছুই প্রিয় ও পবিত্র হয়ে উঠল তার কাছে। নদীপারের ঘন জঙ্গল পরিবৃত শ্মশানে অথবা মন্দির প্রাঙ্গনে যখন বসে থাকেন তখন আহার নিদ্রা বা আত্মীয় পরিজনদের স্নেহপ্রীতি সব কিছুর কথা ভুলে যান বামা। আপনা থেকেই বুক তার জুড়িয়ে যায়, মন প্রাণ ভরে ওঠে। এক বৃহত্তর ও মহত্তর পাওয়ার অপার্থিব তৃপ্তিতে উল্লসিত হয়ে ওঠে তাঁর আত্মা।

দেখেশুনে তারাপীঠের তদানীন্তন ভৈরব কৈলাসপতিবাবার দয়া হয়। মাঝে মাঝে তারা মার প্রসাদ দেন বামাকে। এই প্রসাদের মধ্যে বামা খুঁজে পান তারা মার এক অপূর্ব প্রসন্নতার হাসি।

গাঁয়ের নিকট প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার নাটোর রাজ-সরকারের একজন কর্মচারি। তারাপীঠ মৌজা এবং তারা মায়ের মন্দির নাটোর রাজসরকারের অধীন বলে এ মন্দিরের দেখাশোনার ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। তখন তারাপীঠ মন্দিরে দুজন কৌল ছিলেন—মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতিবাবা। দুজনেই প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। মন্দির পরিচালনা কাজের জন্য প্রায়ই কৈলাসপতিবাবাকে যেতে হত আটলার দুর্গাদাস সরকারের বাড়ীতে। এই সুত্রে বামা চরণের সঙ্গে কৈলাসপতিবাবার সম্পর্কটি ধীরে ধীরে বড় ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়ে উঠবার সুযোগ পায়।

মাঝে মাঝে প্রায়ই কৈলাসপতিবাবাকে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেন বামাচরণ তাঁকে দীক্ষা দেবার জন্য। বলেন, আর আমি বাড়ী ফিরে যাব না। আমি অর্থ, আহার নিদ্রা, আরাম ঐশ্বর্য কিছুই চাই না বাবা, আমায় শুধু মার চরণতলে একটুখানি ঠাঁই দেবার ব্যবস্থা করে দিন। এই মন্দিরে অথবা ঐ শিমুলতলে মার পাদপদ্মের কাছে তারা মার ধ্যান করে দিনরাত্রি কাটিয়ে

দেব। ইচ্ছা হয় প্রসাদ দেবেন না হয় না দেবেন। এ দেহ থাকা না থাকা শুধু মার ইচ্ছা। আমি এর জন্য কিছুই ভাবি না।

একথা শুনে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যান কৈলাসপতিবাবা। সামান্য এক কিশোর বালকের মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার এত বড় আর্তি, এত বড় মুমুক্ষা ও এত গভীর ভগবৎবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য হবারই কথা। কিন্তু সে আশ্চর্য বাইরে প্রকাশ করলেন না কৈলাসপতিবাবা। বামাচরণের প্রতি যে শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত স্নেহ তিনি অনুভব করছেন আপন অন্তরে, সে স্নেহের এতটুকুও ফুটিয়ে তুললেন না তাঁর শান্ত-গম্ভীর মুখমণ্ডলে। বামাচরণের অন্তরের আসল ইচ্ছাটি কি, সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে যদিও তা তাঁর অজানা নাই তথাপি তিনি আরও কিছুদিন পরীক্ষা করতে চাইলেন তাকে। তিনি দেখতে চাইলেন, বামাচরণের এই ভক্তিভাব তার অন্তরের স্থায়ী ভাব না বালসুলভ কোন সাময়িক উচ্ছাস। তাই তিনি বামাকে বললেন, এত অল্প বয়সে কাউকে আমরা দীক্ষা দিই না বাবা। এখন কিছুদিন সংসারজীবন যাপন কর, তারপর এস।

যথাযথ বিনয় অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বামা উত্তর দিল, কিন্তু বাবা সংসারে ত আমার মন নাই। আমি তারা মা ছাড়া আর কিছুই জানি না।

কৈলাসপতিবাবা তবু ছাড়ালন না। বললেন, তুমি নিজে সংসার না করলেও এখন বাপমার সংসারই তোমার সংসার। তুমি বাপ মার বড় ছেলে। তোমার বাবার বয়স হয়েছে। এসময় তোমার বাবাকে সংসার যাত্রা নির্বাহে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। অন্য কিছু না হোক, যজমানের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পূজা অর্চনার কাজগুলোও ত করতে পার।

বাড়ী বাড়ী গিয়ে পূজো করতে লাগলেন বটে, কিন্তু যজমানদের মন তাতে সন্তুষ্ট হলো না। পূজোর যাবতীয় বিধিগত আচার অনুষ্ঠান উপচার কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য নাই তাঁর। মন্ত্র তন্ত্রও

সব সময় মনে থাকে না। যে কোন দেবদেবীর মন্ত্র বা ধ্যান স্মরণ করতে গেলেই তারা মায়ের ধ্যান মনে এসে যায়। যে কোন দেব দেবীকে প্রনাম করতে গেলেই তারা মার মূর্তিখানি ভেসে ওঠে তাঁর সামনে। যে অমূল্য সহজাত অধ্যাত্ম সম্পদ এই কিশোর পূজারীর অন্তরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল তার সন্ধান পাওয়া সাধারণ যযমানদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এমন সময় একদিন পিতা সর্বানন্দ পরলোক গমন করলেন। সন্তান হিসাবে বামাচরণ দ্বিতীয় হলেও পুত্র হিসাসে তিনি প্রথম। কনিষ্ঠ রামচরণ তাঁর থেকে অনেক ছোট। বড় বোন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে কিছু দিন সন্ন্যাসিনী হয়ে এখানে সেখানে বেড়িয়ে এখন এই সংসারে এসে বাস করছেন। সংসার খুব একটা বড় না হলেও জমি জমা বিশেষ না থাকায় অভাব অনটন লেগেই আছে।

পিতার মৃত্যুর পর এ সংসারের সমস্ত ভার নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ল বামাচরণের উপর। কিন্তু বামাচরণ নিরুপায়। জীবিকার্জনের কোন কাজই হবেনা তাঁকে দিয়ে। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উপর কোন আস্থাই নাই তাঁর। তাই তিনি একদিন কাতরকণ্ঠে মাকে বললেন, আমাকে তোমরা অব্যাহতি দাও মা। আমি নিশ্চিন্তে তারা মার চরণে গিয়ে আশ্রয় নিই। আমাকে দিয়ে তোমাদের সংসারের কোন কাজই হবে না।

মা রাজকুমারী দেবী রাগে দুঃখে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মার চেয়ে ইষ্টদেবী তোর কাছে বড় হলো?

দিদি জয়কালী দেবী বড় ভক্তিমতী মেয়ে। বাড়ীর মধ্যে এক মাত্র তিনিই সবচেয়ে ভালবাসতেন বামাকে। একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন বামার অন্তর্নিহিত অতুলনীয় অধ্যাত্ম সম্পদের আভাস। বামার সমর্থনে তিনি এগিয়ে এসে মাকে বোঝালেন, তুমি ওকে মুক্তি দাও মা। ওর মধ্যে কি শক্তি লুকিয়ে আছে তোমরা কেউ

জান না। আমি বলছি বামা, মন দিয়ে সাধনা করগে, একদিন না একদিন তুই তোর ইষ্টদেবীকে পাবিই।

মা ও বড় দিদিকে প্রণাম করে বাড়ী হতে বেরিয়ে গেলেন বামাচরণ।

গাঁ ছেড়ে মাঠে এসে দেখলেন দুপুরের রোদ খাঁ খাঁ করছে সারা মাঠে। • মাঠের ওপ্রান্তে দ্বারকা নদীর ঘনশ্যাম বনরেখার মাথার উপরে মন্দিরের সাদা চূড়াটি চকচক করছে। উপরে আকাশ ভরা আলোর এত স্বচ্ছতা, চারিদিকে মাঠভরা রোদের এত উজ্জ্বলতা; তবু চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন বামাচরণ। বড় দিদি তাকে আশ্বাস দিলেও সংশয়ের এক হিমশীতল অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল তাঁর চোখের সামনে। গর্ভধারিণী যে মা পৃথিবী হতে বড়, যে পিতা আকাশ হতে উচু সেই মাতা পিতার মনে দুঃখ দিয়েছেন সুতরাং কোনদিনই হয়ত ইষ্টদেবী লাভ করতে পারবেন না তিনি।

তবু মনকে কেন শান্ত করতে পারছেন না তিনি। মাঠভাঙ্গা উদাস বাতাসের মত দ্বারকা নদীর ঢেউভাঙ্গা গৈরিক জলের মত কেন সে মন কিসের খোঁজে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে। কেন তিনি নিজের অগোচরেই ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন তারাপীঠের সেই মহাশ্মশানের দিকে।

কিন্তু আর কোন সংশয় নয়। এবার সামনে যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন বামাচরণ ততই এক গভীর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে। এতক্ষণ তাঁর দোদুল্যমান চিত্তের যে কুটিল সংশয় নদীপারের ওই ঘন বনকুহেলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ছিল, এখন মন্দিরচূড়ার শুভ্র উজ্জ্বলতা সে সংশয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে তাঁকে বরাভয় দান করে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। আরো এগিয়ে গিয়ে দ্বারকা নদীর গৈরিক জলধারায় মৃদু

কলতানের মধ্যে বামাচরণ শুনতে পেলেন বৈরাগ্যের এক প্রাণ মাতানো সুর।

নদীজলে স্নান করে ভিজে কাপড়েই ওপারে উঠে গিয়ে ঝরা শালপাতায় করে কিছু বুনো ফুল তুললেন। তারপর শ্মশানের ভিতর দিয়েই শিমুলতলায় শিলাসনে রক্ষিত দেবীর পাদপদ্মের দিকে এগিয়ে চললেন।

ঘন বনে ভরা তারাপীঠের শ্মশানভূমিটি বড় বিস্তীর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। এতবড় আশ্চর্য মহাশ্মশান সারা দেশের মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। একই সময়ে মৃতদেহের দাহ এবং সমাধি দান পাশাপাশি চলেছে। এই সিদ্ধ মহাপীঠের কোন না কোন অংশে মৃতদেহের অস্থি রেখে যেতে পারলে মৃতের মুক্তি হয়। সুযোগ পায় না যারা তারা কোন রকমে একটি অগভীর খাল কেটে সমাধি দিয়ে যায়। ফলে এই শ্মশানের নিম্নভূমি যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অজস্র দেহাস্থিতে পরিপূর্ণ, তেমনি গাঢ় বনচ্ছায়াবৃত এর উর্ধ্বদেশ জ্বলন্ত চিতাসংলগ্ন ধূমরাশিতে সতত সমাচ্ছন্ন। খরস্রোতা দ্বারকানদী এখানে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে এই পবিত্র স্থানটির ভৌম অখণ্ডতাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে চলেছে। এই শ্মশানের পূর্বপ্রান্তে শিমূল গাছের তলে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুরাণের বশিষ্ঠদেব তন্ত্র মতে সাধনা করে তারাসিদ্ধ হন।

এই শিমূলগাছের অতি সন্নিকটে একটি আয়ত উন্নত বেদীস্তম্ভের একটি ক্ষুদ্রাকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে আছে শিলাসনোপরি দেবীর পাদপদ্ম। এই পাদপদ্ম ঠিক কখন কার দ্বারা নির্মিত হয় তা কেউ বলতে পারে না। বামাচরণ ক্লান্ত হয়ে সেই বেদীচত্বরের পাদদেশে একটি সিড়ির উপর বসে পড়লেন।

দেবীমন্দিরটি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। শ্মশানসংলগ্ন নদীতট-ভূমিই ক্রমশঃ উচু হয়ে মন্দিরচত্বরের দিকে উঠে গিয়ে আত্মলোপ করছে তার প্রশস্ত পাদদেশে।

এতক্ষণ হয়ত দেবীর ভোগারতি হয়ে গেছে। তবু সেখানে গেলেন না বামাচরণ। তারা মার প্রতি বালসুলভ এক নিবিড় অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরে। এরই মধ্যে ভক্ত ভগবানের আধ্যাত্মিক সম্পর্কটিকে মানবিক অন্তরঙ্গতার রঙে রাঙিয়ে দিতে শুরু করেছেন যেন। মন্দিরে যাবেন না। ইষ্টদেবীর কাছ থেকে কিছুই চাইবেন না তিনি। শুধু তাঁর এই পাদপদ্মখানির পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে দেবেন তাঁর সারাজীবন। তারপর ধীরে ধীরে ধ্যান সমাধির গভীরে গিয়ে দেবীর সর্বব্যাপী ব্রহ্মশক্তির মহাসত্তায় লীন করে দেবেন তাঁর জীবচৈতন্যকে। মহা পূজার অর্ঘরূপে তাঁর এই নরদেহটিকে ত্যাগ করে যাবেন দেবীর এই পাদপদ্মের সামনে।

তখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। আম, জাম, শাল, শিমূল, অর্জুন ও বনকরঞ্জা গাছের ঘন ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে রূপালি রোদের টুকরো টুকরো আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনভূমির এখানে সেখানে। অজস্র পাখির বিচিত্র ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিক হতে। ওদিকে শ্মশান সীমানার বাইরে রাস্তার ওপারে নীল আকাশের নিচে উদার অবারিত মাঠ। বামাচরণের সহসা মনে হলো, শ্মশানভূমির অসংখ্য পচনশীল মৃতদেহকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ শেয়াল ও কুকুরদের কামনাকুটিল চীৎকারকে ছাপিয়ে গাছের মাথার উপর থেকে নিষ্কামকণ্ঠ পাখিদের যে অকারণ কাকলি শোনা যায়, সে কাকলি যেন মানুষের পশুভাবের উর্ধতন স্তরের দেবভাবকেই সূচিত করছে।

কম্পিত হাতে ফুল বেলপাতাগুলিকে পাদপদ্মের সামনে সসংকোচে নিবেদন করে সেদিকে গভীর একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বামাচরণ। যে গর্ভধারিণী মা এই মাটির পৃথিবী হতে বড়, তাঁর ইষ্টদেবী তারা মা যদি তার থেকেও বড় না হয় তবে কেন

তাঁকে ত্রিলোকজননী বলে? তিনি যদি সর্বরূপময়ী, বিশ্বময়ী ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিণী হন, কেন তবে তাঁরই মধ্যে সমস্ত আকাশ পৃথিবী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন সব কিছুই থাকবে না? তিনি যদি তাঁকে ত্রিতাপজ্বালা হতে ত্রাণ করতে না পারেন, কেন তবে তারা নামে অভিহিত হলেন তিনি? "তারকত্বাৎ সদা তারা"।

সহসা অদ্ভুতভাবে তাঁর মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে উঠল মহানির্বাণ-তন্ত্রের একটি ধ্যানের কথা। আকুলকণ্ঠে বামাচরণ বলতে লাগলেন, হে পরমাপ্রকৃতি, তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তুমিই পরমাত্মা, তোমাতেই এই নিখিলভুবন জাত হয়েছে, হে শিবাণী, তুমিই জগৎ-জননী। তুমি ছাড়া আর আমি কিছুই জানি না। কে আমার পিতা, কে আমার মাতা আমি তা জানি না। মন্ত্রতন্ত্র সাধন-ভজনও জানি না। ঋদ্ধিসিদ্ধি, মোক্ষ মুক্তি কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই তোমার পাদপদ্মে একটুখানি আশ্রয়।

দেখতে দেখতে চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন বামাচরণ। হতচেতন দেহটি লুটিয়ে পড়ল সেই সিঁড়ির উপর। চোখের তারা দুটি ঊর্ধ্বে স্থির হয়ে আছে। মুখে ফেনা নির্গত হচ্ছে অবিরাম। নিঃসাড় দেহে অদ্ভুত এক দিব্যোন্মাদের অবস্থা।

এভাবে কতক্ষণ ছিলেন কিছুই হুঁস ছিল না বামাচরণের। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে দেখেন, সামনে কৈলাসপতিবাবা দাঁড়িয়ে। মুখে তাঁর প্রসন্নতার হাসি। হাত ধরে বামাচরণকে উঠিয়ে শান্ত ও স্নেহশীল কণ্ঠে বললেন, ওঠ বামাচরণ; তোমার ভক্তিনিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। মা তোমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

বামাচরণ মুখ তুলে দেখলেন, তখন গোধূলির সব আলো নিবে গেছে। প্রাকসন্ধ্যার তরল অন্ধকার আকাশ থেকে ধীর গতিতে নেমে এসে বনভূমির মাঝখানে ঘন ও জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

মুখর হয়ে উঠেছে ঝিল্লী ও রাতপোকার দল। সারাদিন জলস্পর্শ করেননি, তবু কোন ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করছেন না তিনি।

তাঁর হাত ধরে কৈলাসপতিবাবা শিমূলতলায় বশিষ্ঠদেবের আসনের কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে। একফালি ভূমিখণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এই সেই বশিষ্ঠদেবের মন্ত্রপূত প্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডির আসন যার মধ্যে যুগ যুগ ধরে সমাহিত হয়ে আছে পাঁচটি ভিন্ন জাতীয় মৃত জীবের মস্তক। এ আসন বড় জাগ্রত। একমাত্র শক্তিমান সাধকেরাই এর সন্ধান পান এবং এর উপর বসে সাধনা করতে পারেন। এবার থেকে এর উপর বসেই তুমি ইষ্টবীজ জপ করবে। অবশ্য তার আগে তন্ত্রসাধনার কতকগুলি গূঢ় পদ্ধতিকে জানতে হবে।

নগেন পাণ্ডা দেবীর পাদপদ্মে প্রদীপ জ্বেলে দিতে এলে তাকে বামাচরণের জন্য কিছু আহার্য নিয়ে আনতে বললেন কৈলাসপতি-বাবা।

ক্ষুধার কথা সত্যি সত্যিই একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন বামাচরণ। কৈলাসপতিবাবার খুব নিঃসৃত বাণীগুলিকে অমৃতরূপে পান করছিলেন তিনি যেন। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারেও তাঁর মনে হচ্ছিল, আলোর প্রস্রবণ খেলে যাচ্ছে যেন চারিধারে। পূতিগন্ধময় শ্মশানের এই ধূম্রজালজটিল ও কৃষ্ণকুটিল বনভূমিকে মনে হচ্ছিল স্বর্গের নন্দনকানন।

কৈলাসপতিবাবা বললেন, কথিত আছে বশিষ্ঠদের প্রথমে বেদাচারে তারা সাধনা করে ব্যর্থকাম হয়ে বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি নাকি সুদূর মহাচীনেও গিয়েছিলেন। অবশেষে দৈববাণী হয়. "হে বশিষ্ঠ, বক্রেশ্বর মহাপীঠের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ ধামের পূর্বদিকে, দ্বারকানদীর পূর্ব তীরে যেস্থানে শিমূল-বৃক্ষ আছে তার তলে তুমি সাধনা কর। তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে।" অতঃপর বশিষ্ঠদেব এই উগ্রতারাপীঠের মহাশ্মশানে

পঞ্চমুণ্ডির আসন নির্মাণ করে ও পঞ্চতত্ত্ব সহকারে তারা সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং তারাদেবীর দ্বিভুজা শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

একটু থেমে কৈলাসপতিবাবা আবার বলতে শুরু করলেন, এই স্থানের মাহাত্ম্য যদি আরো শুনতে চাও তাহলে শোনঃ তারাপীঠের সংখ্যা মোট তিনটি। এটি তাদেরি অন্যতম। এখানে সতীদেহের কোন অঙ্গ পড়ে নাই; পড়েছিল তাঁর চোখের একটি মণি বা তারা। সেই অনুসারে এর নাম হয় তারাপীঠ। সতীদেবীর তিন নেত্রমণি বত্রিশ যোজন অন্তর ত্রিভুজাকৃতিভাবে তিনটি স্থানে পড়েছিল। সতীদেবীর বাম নেত্রমণি পড়েছিল মিথিলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ভাগীরথী নদীর উত্তরে ত্রিযুগী নদীর পূর্বতীরে। এটিকে বলা হয় নীল সরস্বতী তারাপীঠ। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে বগুড়া জেলায় পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ নেত্রমণি এবং এটিকে বলে একজটা তারাপীঠ। দেবীর ঊর্ধ্ব নেত্রমণি পড়ে এই মহাশ্মশানের শিমূলবৃক্ষতলে এবং একে বলা হয় উগ্রতারাপীঠ।

পরদিন বামাচরণের মা রাজকুমারী দেবী এসে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তাঁর সেই এক কথা, তুই বড় ছেলে ঘরছাড়া হলে কিকরে চলবে?

কৈলাসপতিবাবা দুর্গাদাসবাবুকে বলে ঠিক করে দিলেন, বামাচরণ এবার হতে দেবীপূজার জন্য ফুল তুলবে ও পূজা উপচার তৈরি করবে। তার জন্য কিছু করে মাসিক বেতন দেয়া হবে রাজ সরকারের তরফ থেকে। সেই বেতন রাজকুমারীদেবীই পাবেন। কিছুটা সাহায্য হবে তাঁর সংসার প্রতিপালনে।

সাধনা শুরু করার আগে দীক্ষা চাই।

কৈলাসপতিবাবা বললেন, তবে শোন। হিন্দুধর্মে বৈদিক এবং তান্ত্রিক ভববৎসাধনার এই ধারা দুটি কোন আবহমান কাল হতে

প্রবহমান। দুটি ধারাই পাশাপাশি চলে আসছে। অনেকে তন্ত্রকে বলেন, পঞ্চম বেদ। সুতরাং তন্ত্রকে অবৈদিক ও অনার্য-সাধনা বলে মনে করবার কোন কারণ নাই। বেদের মত তন্ত্রও অপৌষেয় ও অতি প্রাচীন। তন্ত্রের উদ্‌গাতা হলেন স্বয়ং শিব এবং পার্বতী। শিবের কথাগুলি আগম এবং পার্বতীর কথাগুলিকে নিগম বলা হয়। তন্ত্রশাস্ত্র মতে শক্তি আরাধনা ছাড়া মানুষের মুক্তি নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহতো মহীয়ান হতে শুরু করে অনু পরমানু পর্যন্ত সর্ব চরাচরের প্রতিটি পদার্থে নিত্য চৈতন্যরূপা যে পরমাশক্তি নিরন্তর লীলা করছেন তিনি নিবাকারা, জ্যোতিঃ-স্বরূপা ও ব্রহ্মস্বরূপিণী। তবে তিনি ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ ধারণ করে সাধকের অভীষ্ট পূরণ করেন। এঈ মহাশক্তির দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হলো তারা।

বামাচরণের কিন্তু এক চিন্তা, কিভাবে তিনি দীক্ষালাভ করবেন সিদ্ধপুরুষ কৈলাসপতিবাবার কাছ থেকে। অন্তর্যামীর মত তা জানতে পেরে কৈলাতপতিবাবা বললেন, ব্যস্ত হয়ো না বৎস। যথাসময়ে আমি তোমায় জ্যোতির্দীক্ষা দেব। তুমি তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কোটি তড়িৎ প্রভায় মূর্তিমতী এক জ্যোতিপুঞ্জরূপে দেবী আবির্ভূত হবেন তোমার সামনে।

নীরবে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন বামাচরণ। সেদিনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে শ্মশানভূমিতে। শিবা ও সারমেয় দলের ক্ষুব্ধ চীৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডেকে চলেছে ঝিল্লী ও রাতপোকার দল। ওদিকে বর্ষার স্ফীতকায়া গৌরবর্ণা দ্বারকা নদী শ্মশানভূমির গাত্রদেশকে বিধৌত করে মৃদু কলতানে বয়ে চলেছে তার দূরতম লক্ষ্যাভিমুখে।

আজ থেকে শুরু হবে তাঁর সুকঠোর তপস্যা। কিন্তু তার আগে সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানা চাই

যদিও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের দিকে কোন আসক্তি নাই তাঁর।

কৈলাসপতিবাবা বললেন, তন্ত্রসাধনায় সাধকদের আত্মিক অবস্থা ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে সপ্তবিধ আচার ও ত্রিবিধ ভাবের কথার উল্লেখ আছে। ভাব হচ্ছে সাধকের মানসিক অবস্থা। পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব—এই ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে দিব্যভাবই শ্রেষ্ঠ। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন এবং সর্বভূতে সমজ্ঞান এই ভাবের লক্ষণ। এই ভাবে অথবা মদ্য, মাংস, মৎস, মৈথুন ও মুদ্রা এই পঞ্চ-ম-কার সহযোগে বীরভাবে তারা সাধন তন্ত্রমতে বিধেয়। তন্ত্রমতে চক্রানুষ্ঠান, লতাসাধন, শ্মশান-সাধন, মুণ্ডসাধন ও শব-সাধন প্রভৃতিতে একমাত্র বীরাচারী সাধকেরই অধিকার আছে। দিব্যভাবের সাধকরা নারীস্পর্শ বা স্থূল পঞ্চ-ম-কার সহযোগে চক্রানুষ্ঠান করেন না।

বলতে বলতে বামাচরণের মুখের দিকে চেয়েই তার মনের ভাবটি মুহূর্তে বুঝে নিলেন সিদ্ধ পুরুষ কৈলাসপতিবাবা। বললেন, বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, সিদ্ধান্তচার, দক্ষিণাচার, বামাচার ও কৌলাচার—এই সপ্তবিধ আচারের মধ্যে সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের ও কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত। সপ্ত আচারের মধ্যে বামাচার ও লৌলাচারই শ্রেষ্ঠ। বামাচারী সাধক দিবাকালে ব্রহ্মচর্য পালন ও রাত্রিকালে পঞ্চ-মকার যোগে চক্রানুষ্ঠান করে বাম হাতে দেব পূজা করে থাকে। আর কলাচারী সাধকগণ সর্ব-ভূতে সমজ্ঞান করে, কখনো উন্মাদবৎ, কখননো পিশাচবৎ বা ভ্রষ্টবৎ বিচরণ করে। সাধণার উচ্চস্তরে সাধকগণ সদ্‌গুরুর সাহয্যে স্থূল মকারগুলিকে আন্তর বা সূক্ষ্ম ম-কারে পরিণত করতে পারেন। তবে অবশ্য কৌলাচারীদের কোন নিয়ম নাই তাঁদের কোন স্থান কাল শ্রুতি বা স্মৃতিবিহিত কর্মও নাই। তাঁরা সত্যই নিত্য শুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ, নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ।

এর পর থেকে এক কঠোর সাধনায় মন প্রাণ সমর্পণ করলেন বামাচরণ। ভাবের দিক থেকে কখনো তিনি বীর, কখনো দিব্য-ভাবাবলম্বী। কিন্তু আচারের দিক থেকে তিনি ছিলেন সার্থক কৌলাচারী। ভোগ এবং ত্যাগ তুটোই ছিল তাঁর সমান করায়ত্ত। সাধারণতঃ সাধনার প্রথম স্তরে তন্ত্রসাধকেরা স্থূল পঞ্চ-ম-কার সহযোগেই সাধনা করেন। পরে ধীরে ধীরে এই সব ম-কারগুলিকে সূক্ষ্মতার দিকে নিয়ে যান। কিন্তু বামাচরণ মদ্য এবং মাংস ছাড়া স্থূল পঞ্চ-মকার হতে আর কোন উপাদানই গ্রহণ করলেন না।

কালিকানন্দ ব্রহ্মচারিও কৈলাসপতিবাবার একজন প্রিয় শিষ্য। বামাচরণের কাছে কাছে থাকেন। একই সঙ্গে সাধনা করেন। কালিকানন্দ একদিন বললেন, আচ্ছা বামাচরণ, তুমি স্থূল পঞ্চ-ম-কারের আর কোন উপাদান গ্রহণ করলে না কেন ?

বামাচরণ স্বপ্নাবিষ্টের মত বললেন, তা ত জানি না ভাই, মা আমাকে দিয়ে যা করান আমি তাই করি। আমার নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা সত্তা নাই। খেয়ে আনন্দ পাই তাই খাই। আনন্দই ব্রহ্ম। মূলাধারে সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে সহস্রারে নিহিত ব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে যুক্ত করাই পঞ্চ-ম-কার সাধনের মূল লক্ষ্য। আমি মনে করি এতেই আমার কাজ হবে। মা আমার মধ্যে এমনিতেই আছেন ; তাঁকে জাগাবার জন্য মৎস, মুদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি অন্য কোন উপাদানের দরকার নাই।

ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞানের সব লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে বামাচরণের মধ্যে। কালিকানন্দ ও কৈলাসপতি বাবা বুঝতে পারেন, বামা একজন সাধারণ সাধক নন। সাধারণতঃ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান না হলে কোন সাধক লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শোক জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি, এই অষ্টপাশ হতে মুক্ত হতে পারে না।

কিন্তু সাধনার প্রথম স্তরেই বামাচরণ অষ্টপাশ হতে মুক্ত হয়েছেন বলে মনে হলো তাঁদের। মানস জপে সব সময় বিভোর দিব্যোন্মাদে

উন্মত্ত ও মন্ত্রসিদ্ধ এক সাধকের মত শংকাহীন চিত্তে ইচ্ছামত বিহার করে বেড়ান। কখনো মহাশ্মশানের একপ্রান্তে কখনো মন্দির চত্বরে বসে তারা মার নাম করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সর্বভূতে সর্ব চরাচরে প্রসারিত তাঁর আত্মচৈতন্য এমন ভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে সব কিছুর উপর যাঁতে শুচি অশুচি, ভাল মন্দ সম্বন্ধে সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল তাঁর মন থেকে। বাইরের লোকে তাঁকে পাগল বলে। বলে বামা ক্ষেপা। তাঁর যাবতীয় আচরণকে উন্মাদের আচরণ বলে তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেয়।

একদিন বামাচরণের কনিষ্ঠ ভাই রামচরণ এসে খবর দিল, মা আজ মৃত্যুমুখে পতিত। অন্তিমকালে তাঁকে অন্তত একবার দেখা দিয়ে শেষবারের মত মনে একটু শান্তি দেয়া দরকার।

বামাচরণ কিন্তু নির্বিকার। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রূঢ়ভাবে তিনি বললেন, কে আমার মা? জগজ্জননী তারা মা যিনি সবার মা, তিনিই আমার মা। তারা মা ছাড়া আমার আর কেউ নাই।

রামচরণ ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেলেন।

দিনকতক পরের কথা। তখন বর্ষাকাল। স্ফীতকায়া গৈরিকবর্ণা দ্বারকা নদী খরবেগে দুই কুল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে দ্বারকায় স্নান করা অভ্যাস বামাচরণের। অন্য দিনকার মত সেদিও স্নান করতে গিয়েছিলেন দ্বারকার শ্মশান ঘাটে। কিন্তু সহসা নদীর ওপার হতে সমবেত কণ্ঠের জোর 'হরিবোল' শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। তাঁর বুঝতে দেরী হলো না, তাঁরই মার মৃতদেহ দাহ করতে এসেছে তাঁর গাঁয়ের প্রতিবেশীরা। সঙ্গে রয়েছে রামচরণ। প্রবল বন্যায় নদী পার হয়ে মৃতদেহ তারাপীঠের মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা সম্ভব নয় বলেই তারা ওপারেই শবদাহের ব্যবস্থা করছে। সহসা

তাঁর গর্ভধারিণী মার প্রতি অদ্ভুত এক ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বামাচরণের মধ্যে। ভুলে গেলেন তিনি সাধক, পূর্বজীবন হতে বিচ্ছিন্ন। 'মা 'মা' বলে ঝড়ের বেগে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে একটা কাপড়ে করে মার মৃত দেহটিকে পিঠে বেঁধে অবলীলাক্রমে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে এ পারের মহাশ্মশানে চলে এলেন বামাচরণ।

মার শ্রাদ্ধের আগে রামচরণকে বারবার অভয় দিয়ে বললেন বামাচরণ, কোন ভয় নাই। তুমি আয়োজন কর, পঞ্চগ্রামী নিমন্ত্রণ করতে হবে। মার শ্রাদ্ধের যেন কোন ত্রুটি না হয়। কোন ভয় নাই, তারা মা আছে।

শ্রাদ্ধের দিন আশ্চর্য হয়ে গেলেন রামচরণ। আশ পাশের গাঁ হতে অজস্র লোক বহু জিনিষপত্র বয়ে দিয়ে যেতে লাগল। ব্রাহ্মণ ভোজনের কিছু আগে অপ্রত্যাশিতভাবে বামাচরণ নিজেও এসে হাজির হলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা যেমন অনেক, আয়োজিত দ্রব্যের পরিমাণও তেমনি প্রচুর।

কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে চমকে উঠল সবাই। বর্ষার বাদল মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে সারা আকাশ জুড়ে। মন্থর বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে আসন্ন বৃষ্টির আভাস। সবাই বলছে, এ মেঘে বৃষ্টি হবেই। রামচরণ কাতর কণ্ঠে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, একি বিধির বাদ সাধা। একেই বলে দাতা দেয় ত বিধাতা দেয় না। সব পণ্ড হয়ে গেল।

বামাচরণ কিন্তু একেবারে নিঃশংক ও নির্বিকার। তাঁর মুখে সেই এক কথা, আমার তারা মা আছেন; কোন ভয় নাই। যার ভাবনা সেই ভাববে। কিন্তু রামচরণ অতিশয় বিচলিত হয়ে উঠতে উদাত্ত কণ্ঠে তারা মার ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন বামাচরণ। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল, শ্রাদ্ধবাসরের অনতিদূরে আটলা-মৌলার

বিস্তৃত মাঠ বৃষ্টির জলে ভেসে যাচ্ছে, অথচ শ্রাদ্ধবাসরে বা তার চারিপাশের সংলগ্ন স্থানগুলিতে এক ফোঁটাও বৃষ্টি নাই।

মন্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের এই অলৌকিক বিভূতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল অভ্যাগতদের সকলে। একমাত্র মন্ত্রসিদ্ধ হলেই তবে সাধক আরাধ্য দেবীর দর্শন লাভ করেন এবং দেবীর এই ধরণের কৃপালাভে সমর্থ হন।

কৈলাসপতি বাবা দেখলেন, বামাচরণ সত্যি সত্যিই সিদ্ধিলাভ করেছেন। সুতরাং তাঁর আর এখানে থাকা চলে না। এক সিদ্ধিপীঠে দুইজন সাধকের থাকা উচিত নয়। মোক্ষদানন্দ আগেই মরদেহ ত্যাগ করেছেন। এবার বামাকে এখানে রেখে তাঁর নিজেরই এ পীঠ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ কৈলাসপতি বাবা তারাপীঠ ছেড়ে হিমালয়ের পথে চলে যেতেই প্রধান কৌলের পদে কাকে বরণ করা হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা গেল পাণ্ডাদের মধ্যে।

ইতিমধ্যে অদ্ভুত এক কাজ করে বসলেন বামাচরণ। মন্দিরে ভোগ দেবার সময় একদিন বামদেব পূজা শেষ না হতেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পূজার নৈবেদ্যগুলি খেতে লাগলেন। পাণ্ডারা চারিদিকে হতে ছুটে তাঁকে জোর করে বার করে নিয়ে গেল ঘর হতে। পাণ্ডাদের অজস্র প্রশ্নবানের উত্তরে তিনি শুধু একই কথা বার বার বলতে লাগলেন, বেশ করেছি, খেয়েছি। আমার মায়ের ভাগ থেকে কেড়ে খেয়েছি, আমি বুঝব মার সঙ্গে।

কিন্তু তারা মার সঙ্গে বামদেবের এই মধুর অত্মীয়তার সম্পর্ক বাইরের কোন লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। পাণ্ডারা রেগে আগুন। সব পাণ্ডারা এক মত হয়ে বামদেবকে প্রসাদ দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

দিনের পর দিন অনাহারে কেটে যেতে লাগল বামদেবের।

তবু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তিন চার দিনের মধ্যে একবারও কাউকে কোন অনুরোধ বা উপরোধ করলেন না প্রসাদ বা আহার্যের জন্য। দিনরাত কণ্ঠে যাঁর নাম, মনেতে যাঁর চিন্তা, হৃদয়ে যাঁর ধ্যানমূর্তি সেই তারা মাকে পাওয়ার এক পরম তৃপ্তি তাঁর দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে যেন!

হঠাৎ একদিন নাটোরের রাজ সরকারের তরফ হতে একজন কর্মচারি এসে হাজির। রাণীমার তরফ থেকে দেওয়ান বাহাদুর নিজে এসে বামদেবের খোঁজ করতে লাগলেন। তারা মা একদিন গভীর রাত্রিতে রাণীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, বামদেব তাঁর আদরের সন্তান। বামদের তাঁকে আপন মায়ের মত দেখে বলেই ত তাঁর ভোগ আরতির নৈবেদ্য নিজের হাতে নিয়ে খেয়েছে। কিন্তু তার জন্য তার গায়ে হাত দেয়া অন্যায়। কিন্তু সাবধান। মনে রাখবে, এই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি ঘটলে আর আমি ওখানে থাকব না।

নাটোরের রাণী তাই রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন এই অশুভ ঘটনার প্রতিকারের জন্য। তারপর তিনি নিজে এসে তদারক করে দেখবেন। তাঁর তারা মার মন্দিরে এমন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন, এজন্য তিনি ভাগ্যবতী মনে করছেন নিজেকে।

রাজ সরকারের দেওয়ান ও কর্মচারিরা সকলে বামদেবের কাছে রাণীর পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে এই মহাপীঠের প্রধান কৌলের পদে নিযুক্ত করলেন। পাণ্ডারা অবাক হয়ে গেল সকলে। এক বিস্ময়-বিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় তারা সকলে মাথা নত করল বামদেবের কাছে।

তখন ১২৭৪ সাল। বামদেদেবের বয়স তখন তিরিশ। অমাবস্যার গভীর রাত্রি। শ্মশানের কাছে শিলাসন বেদীর প্রথম

সিঁড়িতে বসে দেবীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে ছিলেন বামদেব। বামদেবের অবিরাম সহচর কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীও অদূরেই বসে ছিলেন। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে চমকে উঠলেন কালিকানন্দ।

ত্রাস্তভাবে উঠে গিয়ে দেখলেন, শিলাসনে রক্ষিত দেবীর পাদপদ্ম হতে নির্গত হয়ে অত্যুজ্জ্বল একচাপ জ্যোতিপুঞ্জ একবার পদ্মাসনে সমাধিস্থ বামদেবের কপাল স্পর্শ করছে আবার ফিরে এসে তার উৎসদেশের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকের নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে সচল একটি জ্যোতিপুঞ্জের এই অদ্ভুত আনাগোনা দেখে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন কালিকানন্দ।

চেতনা ফিরে পেয়ে কালিকানন্দ দেখলেন তখন ভোর হয়ে এসেছে। অচেতন অবস্থায় বামদেব সিড়ির সেই প্রথম ধাপেই পড়ে রয়েছেন। কালিকানন্দ বুঝলেন, মন্ত্রচৈতন্য হয়ে পূর্ণসিদ্ধিলাভ করেছেন বামদেব। হৃদয়গ্রন্থিভেদ হওয়ায় আনন্দাশ্রু ঝরছে দু চোখে; সর্বাবয়ব বর্ধনের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে; পুলকের রোমাঞ্চ ফুটে উঠেছে সারা দেহে। কোনরূপ বাহ্য বা বাচিক্ পুজা না করে একমাত্র অন্তর্যোগাত্মিকা পূজার সাহায্যেই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বামদেব।

দিনে দিনে দিব্যোন্মাদের ভাব ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল বামদেবের। সুরাপানের মাত্রাও বেড়ে যেতে লাগল। অবশ্য সাধারণ সুরা নয়, শোধিত কারণবারি। তিনি বলতেন, তিনি ত সুরা পান করছেন না; ব্রহ্মস্থান অর্থাৎ সহস্রার পদ্ম হতে উৎসারিত শুভ্রাংশুকলা যে সুধা, সেই সুধা তিনি তাঁর কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উপর আহুতি স্বরূপ নিক্ষেপ করেন শুধুমাত্র। এক এক দিন গলিত শবের মাংসই সুরার আনুষঙ্গিকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, সমস্ত কর্ম তারা মাকে সমর্পণ করাই হলো প্রকৃত মাংস সাধন। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ নাশ করাই হলো

দ্বিতীয় তত্ত্ব সাধনের লক্ষ্য। সঙ্গীরূপে সব সময়ই থাকে কেলো ও ভুলো নামে দুটি কুকুর। তাদের সঙ্গে একই পাত্রে আহার করেন বামদেব। অনেক সময় এক অকুণ্ঠ স্পর্ধায় তারা বামদেবের খাবার কেড়ে খায়।

মন্ত্রসিদ্ধির আরো কতকগুলি লক্ষণ ফুটে উঠল বামদেবের মধ্যে যেমন, দেবী, দর্শন, দেবীর সঙ্গে বাক্যালাপ, অষ্টবিভূতিলাভ। তান্ত্রিক বা বৈদান্তিক পদ্ধতিতে কোন সাধক যোগবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করলে এই অষ্টবিভূতির অধিকারী হয়। অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাসায়িত্ব—পরম যোগী শিবের এই রকম আটটি অলৌকিক ঐশ্বর্য ছিল। তন্ত্রমতে তাই মন্ত্রসিদ্ধ সাধক হচ্ছে শিবতুল্য।

যোগীরা কিন্তু এই সব বিভূতি লাভ করেও বহির্জীবনে লোকসমক্ষে বিশেষ কোন অপরিহার্য কারণ না ঘটলে তা প্রকাশ করেন না। আটটির মধ্যে মাত্র দুই তিনটি বিভূতির প্রকাশ কখনো কেমনে দেখা যেত বামদেবের জীবনে।

কিন্তু তাঁর আলৌকিক বিভূতির কথা এরই মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে লোকমুখে। শুধু আশপাশের গাঁ হতে নয়, বহু দূর দূরান্ত হতে অজস্র লোক আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন কামনা পূরণের আশায়। তারা আসে; বামদেবকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিভরে প্রনাম করে। প্রনামীস্বরূপ টাকা পয়সা সঙ্গে যা আনে পাণ্ডাদের কাছে দিয়ে যায়। বামদেব নিজের হাতে কোনদিন তা গ্রহণ করেন না। তাদের কারো আশা পূরণ হয়। কারো হয় না। 'আত্মভোলা মহাসাধকের উদাসীন কৃপাদৃষ্টি কখন কার উপর পড়বে কিছুই তার ঠিক নাই।

এর মধ্যে বামদেবের ছোট ভাই রামচরণের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বিধবা স্ত্রী কয়েকট কন্যা সন্তান নিয়ে বড় বিপদে পড়েছেন। জমিজমা বেশী নাই। তার উপর আবার তা দেখবার লোকনাই।

ফলে দিন আর চলে না। তাই মাঝে মাঝে তিনি আসেন তারা-পীঠের মন্দিরে কিছু সাহায্যের জন্য। মন্দিরের পাণ্ডারাও বামদেবের ভাতৃবধূ হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। বামদেব স্বয়ং একেবারে নির্বিকার এ বিষয়ে। আত্মভোলা গৃহত্যাগী শিবতুল্য মহাসাধককে সংসারিক দুঃখকষ্টের কথা বলা বৃথা। এ যেন শান্ত সমাহিত মহাসমুদ্রে সামান্য একটি উপলখণ্ড নিক্ষেপের দ্বারা তরঙ্গসৃষ্টি করার চেষ্টা।

বামদেবের প্রণামীর টাকা থেকে কিছু রামচরণের স্ত্রীকে দিতে গিয়ে পাণ্ডারা দেখে বামদেবের নিত্য সঙ্গী নগেন পাণ্ডা সব টাকা পয়সা হাত করেছে। বামদেবের গঞ্জিকা ও কারণবারির জন্য সামান্যই কিছু খরচ হয়। বাকী সব এমনি করে নগেন পাণ্ডা নিয়ে নেয়। পাণ্ডারা রেগে গিয়ে রাজসরকারের কর্মচারিদের জানাতে তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিস এসে নগেন পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করে সদর মহুকুমা রামপুরহাটে নিয়ে গিয়ে আদালতে অভিযুক্ত করে।

এদিকে গাঁজা সেবার সময় নিত্যসঙ্গী নগেনকাকাকে দেখতে না পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠলেন বামদেব। উপস্থিত সকলে তাঁকে বোঝান নগেন তাঁর টাকা চুরি করার জন্য পুলিস হাজতে আছে; তার বিচার হবে।

সহসা ভীষণ রেগে গিলেন বামদেব। রক্তচক্ষু করে বললেন, আমার টাকা নিয়েছে আমি বুঝব, পুলিসের কি। আমি এই মুহূর্ত্তে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনব।

নদীতে তখন প্রবল বান; জোর বর্ষার জন্য দ্বারকানদীর জলোচ্ছাস দুকুল প্লাবিত করে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সকলে সবিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল, অষ্টবিভূতির অন্যতম বিভূতি লঘিমার সাহায্যে সমস্ত শরীরটিকে আশ্চর্য রকমের লঘু করে উচ্ছ্বসিত নদীজলরাশির উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে যাচ্ছেন

বামদেব। পরণে মাত্র এক টুকরো কৌপীন, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, হাতে ত্রিশূল। নদী পার হয়ে তীরবেগে ধাবিত হলেন রামপুর হাটের পথে। তাঁর সে গতিবেগ এতই দ্রুত যে কোন মানুষের পক্ষে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চলা দূরের কথা, দৃষ্টি নিয়ে তার অনুসরণ করাও সম্ভব নয়।

হাকিমকে বলে সেইদিনই নগেনপাণ্ডাকে আদালত হতে মুক্ত করে আনেন বামদেব। বশিত্ব ও ব্যাপ্তিরূপ শক্তিবিভূতিরও দুই একটি পরিচয় পাওয়া যায় বামদেবের জীবনে।

তখন দ্বারকা-নদীর দুই তীরেই ছিল শালগাছের ঘন জংগল। মাঝে মাঝে বাঘ আসত ও অঞ্চলে। রাত্রিকালে মানুষ ঘর হতে বড় একটা একা একা বার হত না। বাঘ যেদিন আসত আশ পাশ গাঁ হতে প্রায়ই দুই একটা গরু বাছুর ধরে নিয়ে যেত।

একদিন গভীর রাত্রিতে এক বিকট হুঙ্কার ছেড়ে একটি বাঘ এসে পড়ল বামদেবের সামনে। এসে চঞ্চলভাবে গর্জন করতে লাগল মুহূর্মুহু। এদিকে শ্মশানের পাশে বামদেব তখন তারামার চিন্তায় বিভোর। দেবীর ধ্যানতন্ময়তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার জন্য বামদেব তাঁর হাতের চিমটে দিয়ে মৃদু শাসনের ভংগীতে তাড়িয়ে দিলেন বাঘটিকে। বাঘটি বিনা প্রতিবাদে শান্ত শিশুর মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। এইভাবে বশিত্বরূপ শক্তিবলে সর্বজীব ও সর্বভূতকে বশীভূত করতে পারতেন বামদেব।

পরদিন সকালে কি মনে হলো, একবার নিজের গাঁয়ে চলে গেলেন বামদেব। পুরনো জীবনে প্রত্যাবৃত্তির কোন মোহ নাই তার। তবু কখনো কেমনে এক একবার গাঁয়ে জন্মভিটের পাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী তাঁর তারা মা এসে তাঁর জন্মভিটেসমেত গোটা গাঁখানাকেই

যেন গ্রাস করে ফেলেন। ভীত হয়ে আবার তারাপীঠে ফিরে আসেন বামদেব।

সেদিন আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকা হলো না বামদেবের। গাঁয়ের বাইরে আশু মণ্ডলের ছেলে হরি মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন বামদেব। হরি সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কি হলো খুড়ো ?

বামদেব এবার সহজভাবে বললেন, কিছু নয়, গতকাল রাত্রে আমাদের শ্মশানের কাছে একটা বাঘ এসেছিল ; আমি তাকে চিমটে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বাঘটা নদীর ধার দিয়ে ডাবুকের পথে চলে গিয়েছিল। আজ এইমাত্র সেখানে একটা লোককে ধরল। লোকটা শৌচকর্মের জন্য সকালে উঠেই নদীর ধারে এসেছিল।

আর সেখানে মা দাঁড়িয়ে তারাপীঠে ফিরে এলেন বামদেব। স্তব্ধ বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল হরি। পরে জানা গেল সত্যিসত্যিই সেই সময়ে ডাবুকের একটি লোককে বাঘে খেয়েছে।

একমাত্র সিদ্ধ মহাযোগীরাই এই ব্যাপ্তিরূপ শক্তিবিভূতিলাভে সমর্থ হন। বামদেবও মাঝে মাঝে এমনি করে এই শক্তিবিভূতির সাহায্যে একই সময়ে একই সঙ্গে সর্বত্র অথবা বিশ্বের যে কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে সেখানকার খবর বলে দিতে পারতেন। তাঁর পরম ভক্ত রামপুহাটের ডাক্তার হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যার মৃত্যুর কথাও এইভাবেই জানতে পেরেছিলেন তিনি।

প্রকৃতিজগতে ক্ষুদ্র ও বৃহতের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত রকমের এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ছোট ছোট আগাছার মাঝখানে যখন ধীরে ধীরে মাথা তুলে ওঠে এক বিরাট বনস্পতি, তখন তার বিরাটত্ব দেখে কখনো হিংসা করে না আগাছারা। কিন্তু মানুষের জগতে তা হয় না। যারা সত্যি সত্যিই ক্ষুদ্র, যারা নীচ

তাদের মাঝখানে কেউ যদি বড় হয়ে ওঠে তাহলে কখনই তারা ভাল চোখে দেখতে পারে না তার উন্নতিকে। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামদেবের এই অভাবনীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখে মন্দিরের কোন কোন পাণ্ডা ও আশপাশ গাঁয়ের দু'একজন লোক হিংসায় ফেটে পড়ল। তাঁর মহত্ত্বকে খর্ব করবার চেষ্টা করতে লাগল তলে তলে।

তারাপীঠের অদূরে সিনে বোষ্টমী নামে একটি অসচ্চরিত্রা মেয়ে বাস করে। একজন বামদেবকে অনেক করে শেখাল, বাবা, সিনে বোষ্টমী আপনার সঙ্গে পীরিত করতে চায়। তার বাড়ী আপনাকে এখনি যেতে হবে। রোজ একবার করে যাবেন। পথে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন, আমি সিনে বোষ্টমীর সঙ্গে পীরিত করতে যাচ্ছি।

পীরিত কিরে শালা? গর্জন করে উঠলেন বামদেব। লৌকিক জীবনের সকল সম্পর্কের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন যেন আত্মভোলা এই মহাসাধক। লোকটি অনেক কয়ে বোঝাল, পীরিত খুব ভাল জিনিষ, সিনে আপনার সেবা করবে। নিজের হাতে আপনাকে খাওয়াবে। কত যত্ন করবে।

লোকটি ভাবল, কোনরকমে একবার নিয়ে যেতে পারলেই হলো। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন অপবাদ দিতে আর কতক্ষণ।

কিন্তু আশ্চর্য! বামদেবকে চোখের সামনে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বকল্পিত সমস্ত কুমতলবের কথা একেবারে ভুলে গেল সিনে বোষ্টমী। বামদেবের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে কাতরকণ্ঠে বলতে লাগল, দয়া করে যদি আমার ঘরে এসেছ বাবা ত, তোমার পায়ে একটু ঠাঁই দাও। আমি তোমার মেয়ে, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই।

এইভাবে পিতা কন্যার এক পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সিনে বোষ্টমীর সঙ্গে। সিনের মৃত্যুকালে আর একবার তার বাড়ী

গিয়েছিলেন বামদেব। কিছুতেই প্রাণ বার হচ্ছিল না। এক দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বামদেবকেই মনে মনে কাতরভাবে ডাকছিল সিনে বোষ্টমী। কিন্তু বামদেব যে সত্যি সত্যিই দূর থেকে অন্তর্যামীর মত তার এই অনুচ্চারিত প্রার্থনার কথা শুনতে পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হবেন তার সামনে তা ভাবতেই পারেনি।

মন্দির চত্বরে বসে থকেতে থাকতে হঠাৎ ভক্তদের বলে উঠলেন বামদেব, তোরা শুনতে পাচ্ছিস না, সিনে আমায় ডাকছে। তার সময় হয়েছে।

বামদেব সেখানে যেতেই এক তীব্র আবেগে বিছানার উপর উঠে বসল সিনে। তারপর অতিকষ্টে বলল, জীবনে অনেক পাপ করেছি, প্রাণ যে বেরোচ্ছে না বাবা। এখন তুমিই আমার অগতির গতি।

বামদেব অভয় দিয়ে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে বেটি, এখন মন প্রাণ দিয়ে তারা মার নাম কর।

এই বলে সিনের মাথার উপর ডান পা খড়ম সমেত চাপিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সিনের ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

ষড়যন্ত্রকারীরা এ দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে এক বেদনার্ত বিস্ময়ে।

তারাপীঠে মাঝে মাঝে এক একজন ভৈরবী আসে। তন্ত্র-সাধকদের পঞ্চতত্ত্বের শেষতত্ত্ব সাধনের জন্য ভৈরবীর প্রয়োজন হয়। নির্বিকার নির্বিকল্প উর্ধ্বরেতা পুরুষ রেতঃপাত না ঘটিয়ে দিব্য-ভাবাপন্ন হয়ে মৈথুন করতে করতে ভোগস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করে সমস্ত প্রাণমনকে কেন্দ্রীভূত করে থাকেন ইষ্টদেবীর ধ্যানের মধ্যে।

তারা-সাধনার দুইটি ক্রম আছে—নীলক্রম ও চীনক্রম। নীলক্রম অনুসারে বাহ্য শক্তিগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্রমমতে আন্তরমৈথুন ও স্বশক্তিই শ্রেষ্ঠা। কোন কোন শক্তিমান

সাধক সূক্ষ্ম যোগক্রিয়ার দ্বারা অন্তর্নিহিত কুলকুণ্ডলিণী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করতে পারেন।

কিন্তু চীণক্রমমতে স্থূল পঞ্চতত্ত্ব সাধন দ্বারা প্রথমে কুলকুণ্ডলিণী শক্তিকে জাগাতে হয়। শক্তি না জাগলে সূক্ষ্ম পঞ্চ-ম-কার সাধন সম্ভব নয়। মেরুদণ্ডের দুধারে ইড়া ও পিংগলা এবং মধ্যভাগে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, ঠিক তার নিচেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আছে সর্পাকার কুণ্ডলিনী শক্তি। ইড়া ও পিংগলাতে প্রবাহিত প্রাণবায়ুকে পঞ্চ-ম-কার সহযোগে সুষুম্না নাড়ীতে সংযুক্ত করলে তবে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়। বৈদিক যোগ সাধনায় এই শক্তি সাধকের আত্মশক্তি জাগায় এবং এই শক্তির সম্যক বিকাশ সাধককে সহস্রারনিহিত ব্রহ্মজ্ঞান দান করে। তন্ত্রসাধনায় এই শক্তিই সাধকের উপাস্য ইষ্টদেবী রূপে তার মনোরথ সিদ্ধ করে।

একজন ভৈরবী একবার বামদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গ কামনা করে। বামদেব বলেন, আমার নিজের শক্তিই স্বতঃ প্রবুদ্ধ ; বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন নাই।

ভৈরবী কিন্তু তবু ছাড়ল না। যুক্তি খাড়া করে বলল, জগন্মাতার অংশসম্ভূতা যে নারী তার অঙ্গে সর্বতীর্থ বিরাজ করে। সেই নারী সন্নিধানেই জপ, তপ ও পূজাদি কার্য সম্পন্ন করলে সাধনায় সর্বাধিক ফললাভ হয়। মৈথুন সাধনায় নারীর চিন্তায় নর হবে মহাযোগী এবং নরের চিন্তায় নারী হবে মহাযোগীনি। এইভাবে সাধনা করলে কুণ্ডলিনী অতি সহজে এবং শীঘ্র জাগরিত হয়ে শিবের সঙ্গে মিলিত হন।

রাত্রির অন্ধকার তখন গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে সেই জনমানবহীন মহাশ্মশানে। দেবীর পাদপদ্মের বেদীতলে একা ছিলেন বামদেব। নির্বিকারভাবে তিনি বললেন, তুমি বুঝতে পারবে না গো, তারামাই আমার ভৈরবী। বাইরের কোন

ভৈরবীর আমার দরকার নাই। তিনি আগে হতেই নিজে নিজেই জেগে বসে আছেন। নিজেকে তিনি নিজেই জাগিয়েছেন।

ভৈরবীটি কোন কথা শুনবে না। তার আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজের দুর্বার কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা, নির্জনে কথা বলতে বলতে আরো দুর্বার হয়ে উঠেছে সে প্রবৃত্তি। সহসা কথা, থামিয়ে উন্মত্তের মত বামদেবকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পুরুষাঙ্গটির খোঁজ করতে লাগল।

সজোরে "মা" 'মা' শব্দ করে এক বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বামদেব। তাঁর পুরুষাঙ্গটি ছিল এমনিতেই খুব ছোট, ঠিক নবজাত শিশুর মত অপুষ্ট ও সংকুচিত। সেদিন কিন্তু ভৈরবীটি তাও খুঁজে পেল না বামদেবের দেহের মধ্যে। শুধু তাই নয়, সহসা এক আশ্চর্য বিস্মরণের অতল গর্ভে তার কাম ও কামনার সকল উচ্ছাস তলিয়ে গেল নিঃশেষে। সে স্পষ্ট অনুভব করল, তার যোনিদেশের মধ্যে কোন গহ্বর নাই, তার স্তনদেশে নারী-সুলভ কোন উচ্চতা বা মেদুরতা নাই, কোন উন্মাদনা নাই তার অঙ্গের কোন জীবকোষে।

ভক্তিভাবে বামদেবকে প্রণাম করে সরে এল ভৈরবী। এদিকে তারামার ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন বামদেব। ধ্যানমৌন বামদেবকে দেখে ভৈরবীর সহসা মনে হলো, বামদেব নন, মহাযোগী স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব যেন পদ্মাসনে যোগনিরত। একটু আগে ভস্মীভূত হয়ে গেছে অভিশপ্ত মদন। ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার ফুলশর। এই শ্মশানসংলগ্ন সমস্ত বনভূমি যেন এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার দেহভস্মের ধূসর অনুলেপনে। কামগর্বিতা পার্বতী লজ্জায় ও অনুতাপে অন্তর্হিত হয়েছেন কোথায় যেন।

ভাবাবিষ্ট ভৈরবীর আরো মনে হলো, কোথায় যেন পারিজাত ও কর্ণিকার ফুল ফুটেছে। এটা পূতিগন্ধময় শ্মশানভূমি

নয়, এ হচ্ছে মহেশ্বরের তপোভূমি শুচিশুদ্ধ কৈলাস। এখানে কোন শিবা বা সারমেয়, শকুনি বা গৃধিণীর ক্ষুব্ধ চীৎকার নাই, এক অটল শুদ্ধতায় চিরসমাহিত এ স্থান। এখানে কোন কামগন্ধ নাই, পারিজাত ও কণিকার কুসুমের স্বর্গীয় সুরভিতে আমোদিত এখানকার আকাশ বাতাস। এখানে কোন অন্ধকার নাই। এক অনলপ্রভ দিব্যজ্যোতিতে সতত সমুদ্ভাসিত এখানকার সমগ্র পরিবেশ।

কাউকে দীক্ষা দান করতে চাইতেন না বামদেব। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর এই নীতির তিনি পরিবর্তন করেন। মাত্র তিনজন ভক্ত তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ধন্য হন। তাঁরা হচ্ছেন, ভক্ত তারা ক্ষেপা, নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং হরিচরণ শাস্ত্রী। এঁদের মধ্যে নলিনীকান্ত তারাপীঠে এসে বামদেবের মন্ত্রশিষ্যরূপে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ ও ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎলাভ করে ধন্য হন।

কোন এক অন্ধকার মহানিশার শেষ যামে শ্মশানের পাশে সেই শিমূলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, ধ্যানমগ্ন থাকার সময় ইষ্টদেবী তারা মা যখন নলিনীকান্তের সামনে মোহিনীমূর্তিতে আবির্ভূত হন, তখনকার অভিজ্ঞতাটি নিজের মুখে চমৎকারভাবে বলে গেছেন নলিনীকান্ত। তাঁর অন্তরে ও বাইরে এক নিরন্ধ্র নিবিড় অন্ধকারে জমাট বেঁধে আছে যখন সব কিছু, ঠিক তখনি সহসা বড় মধুর ও মেদুর একরাশ আলোর এক ঢেউ খেলানো ঝলকানি খেলে গেল তাঁর সামনে। চোখ মেলে দেখেন এক সৌম্যসুন্দর মাতৃমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। নলিনীকান্তের এক বিহ্বল প্রশ্নের উত্তরে সে মূর্তি শান্তকণ্ঠে তাঁর ইষ্টদেবী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। নলিনীকান্ত তখন তাঁকে তাঁর নিজমূর্তিতে দেখতে চাইলে

দেবী আবার কিছুক্ষণ পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিণী ভীষণামূর্তিতে আবির্ভূত হন।

সে মূর্তি দেখতে ঠিক কেমন সে কথা ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি নলিনীকান্ত। বলবেন কি, সে মূর্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি তাঁর আসন থেকে। চেতনা ফিরে পেয়ে দেখেন, বামদেব তাঁকে কোঁলে করে ধরে রেখেছেন।

এই নলিনীকান্তই পরে পরম বৈদান্তিক সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করে ধীরে ধীরে বৈদান্তিক জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

বশিত্বরূপ বিভূতি বলে বামদেব সর্বভূতকে বশীভূত করে ইচ্ছামত তাদের রূপান্তরিত করতে পারতেন অন্যবস্তুতে। একবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল নব্য যুবক কোন এক শহর থেকে পরীক্ষা করতে আসেন বামদেবকে। এসে দেখে, মন্দির চত্বরে একটি কুকুরের সঙ্গে একপাত্রে প্রসাদ খাচ্ছেন বামদেব। দেখে তাচ্ছিল্যভরে উপহাস করতে লাগল তারা।

বামদেব শুধু নীরবে একবার হাসলেন। হেসে যুবকদলের নেতাকে কাছে ডেকে তার মেরুদণ্ডের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ডান হাতটি বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির সর্বাঙ্গ প্রবল ভাবে কেঁপে উঠল এবং সে অবাক বিস্ময়ে দেখল, বামদেব যে কুকুরটির সঙ্গে খাচ্ছিলেন সেই কুকুরটি মানুষে পরিণত হয়ে উঠেছে এবং সে নিজে ও তাদের দলের সবাই এক একটি জন্তুতে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়েছে শেয়াল, কেউ কুকুর, কেউ সাপ আর কেউ শকুনি। যুবকটি দেখতে দেখতে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তার জ্ঞান ফিরলে বামদেব, সস্নেহ ও শান্তকণ্ঠে বললেন, সর্ব

জীবকে শিবজ্ঞানে দেখি আমরা। এক ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত সর্বভূতে। তোরা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন বলে তা দেখতে পাস না। কখনো ছোট বলে কোন প্রাণীকে ঘৃণা করবি না।

বামদেবের সেই উপদেশ জীবনে কখনো ভোলেনি সেই যুবকরা।

তন্ত্রসাধকের দেহমধ্যস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি যখন জেগে উঠে ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত ও একাত্ম হয়, তখন এই বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্মময় দেখেন সেই সাধক। তখন তাঁর তারা মা ব্রহ্মময়ীরূপে যুগপৎ বিরাজ করতে থাকেন সর্ব চরাচরের স্থাবর ও জাগম সকল বস্তুতে। এক বিরাট সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যে সব কিছু এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে কোন ভেদ খুঁজে পান না তিনি কোন বস্তুর মধ্যে। তখন গলিত শবের মাংসই হয়ে ওঠে তাঁর পরম সুখাদ্য। তখন রক্ত শোষণকারী ইষ্ট কীটের মধ্যে খুঁজে পান সেই পরম ব্রহ্মশক্তির লীলা।

একবার বামদেবের একটি হাতে খারাপ ঘা হয় তাতে পোকা হয় এবং সারাদিন মাছি বসতে থাকে। কিন্তু বামদেব কখনো মাছিগুলি তাড়াতেন না। পোকাগুলিকেও বার করবার চেষ্টা করতেন না। কেবল বলতেন, খা, শালারা খা, খুবখা। এই বলে এক তীক্ষ্ণ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের কুটিল গতিপ্রকৃতিগুলিকে লক্ষ্য করতেন।

হঠাৎ একদিন সুদূর কামরূপ কামাখ্যা হতে একজন তন্ত্রসাধক তাঁর একদল শিষ্যকে সঙ্গে করে তারাপীঠে এসে হাজির হন। তিনি এসেই গর্বের সঙ্গে প্রচার করলেন তাঁর চেয়ে বড় তন্ত্রসাধক দেশে আর নাই। সেই রাত্রিতেই এক চক্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে বসলেন সাধকটি।

কোন এক অমাবস্যার মহানিশাই চক্রানুষ্ঠানের উপযুক্ত সময়। আটজনের অনধিক সাধক তাঁদের নিজ নিজ শক্তিকে নিয়ে পৃথক

আসনে যুগ্মভাবে চক্রাকারে অথবা পঙক্তির আকারে বসে কুলতত্ত্ব, কুলদ্রব্য ও কুলামৃত সহযোগে ইষ্টদেবতার পূজা করেন। তবে একমাত্র ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠানেই শক্তির প্রয়োজন, তত্ত্বচক্রে ভৈরবী বা শক্তির প্রয়োজন নাই। বীরাচারী ও দিব্যাচারী সাধকেরাই শুধু চক্রানুষ্ঠান করে থাকেন। বীরাচারীরা ভৈরবীচক্র ও দিব্যাচারীরা তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করেন।

সন্ধ্যা হতেই সেই সাধকটি বামদেবকে বললেন, আজ আমরা যে চক্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আপনাকে হতে হবে তার চক্রেশ্বর। কারণ একমাত্র সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ সাধকই চক্রেশ্বর হবার যোগ্য।

বামদেবের কোনদিন চক্রসাধনের প্রয়োজন হয় নি। তথাপি ইষ্টদেবীর আশীর্বাদধন্য তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলে যে কোন ভাব বা আচারের সাধনা অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তবু একবার তিনি তাঁর তারা মাকে জিজ্ঞাসা না করে কথা দেবেন না। তাই বললেন, তারা মাকে শুধিয়ে দেখি। বলেন ত করব।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, ঠিক আছে।

সাধকটি তখন পঞ্চতত্ত্ব অনুসারে পানীয় ও ভোজ্য যোগাড় করতে বললেন বামদেবকে। মুহূর্তমধ্যে বামদেব এক হাঁড়ি গলিত শবদেহের পচনশীল মাংস তারাশোধণ করে নিয়ে এলেন। এবার চক্রেশ্বর হিসাবে তিনি যা গ্রহণ করবেন পরে তারই অবশিষ্টাংশ প্রসাদরূপে গ্রহণ করবেন অন্য সাধকেরা। সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, তারা তারা বলে বামদেব অবলীলাক্রমে সেই গলিত পচা নরমাংস খেয়ে কারণ বারি পান করতে লাগলেন।

এবার সেই সাধকের পালা। কিন্তু ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত সে মাংস খাওয়া ত দূরের কথা, মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বমণ শুরু হলো। মনে হলো, সারাদিনের সমস্ত ভক্ষিত দ্রব্য নাড়ী ছিঁড়ে সব উঠে এল। কিন্তু সর্বনাশ। তারা শোধন করা কোন ভোজ্য বা

পানীয় মাটিতে পড়া একেবারে নিষিদ্ধ। তাই বামদেব ছুটে গিয়ে সেই সাধকের মুখ হতে নির্গত সমস্ত বমণ দু হাতের অঞ্জলিতে ধারণ করে খেয়ে ফেললেন পরম তৃপ্তি সহকারে।

কামরূপের সাধকটি এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না। সমস্ত অহংকার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বামদেবের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে মহাসাধক, ধন্য আপনি। নিজ গুণে আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। আমি আপনার দাসানুদাস।

'তারা' 'তারা' বলে সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কোথায় বামদেব। সেদিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সকলে! কী অদ্ভুত শক্তি এই মহাসাধকের। যে পথে তিনি যান, সে পথের প্রতিটি ধূলিকণা সজীব হয়ে ওঠে তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে। মৃদু রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে দুপাশের তৃণগুচ্ছ। সামনের অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসে দিব্য জ্যোতির এক ঝর্ণাধারা। শিবা সারমেয়র দল তাদের ক্ষুধিত চীৎকার থামিয়ে সব কামনার কথা ভুলে গিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। সরীসৃপ ভুলে যায় তার সকল কুচিন্তা। তাঁর পদশব্দে সহসা স্তব্ধ হয়ে যায় শকুনি গৃধিনীদের ডানা ঝাপটানি। অমৃত ঝরে যেন তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে। তাঁর পুণ্য দেহগাত্রের কোন অংশের স্পর্শ কোন রকমে কোন মৃতের দেহাস্থি বা কংকাল করোটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতত্বলাভ করে সেই মৃতের আত্মা।

কামরূপ কামাখ্যা গয়া, গঙ্গা, বারাণসী সকল তীর্থের সার এই তারাপীঠের মহা শ্মশান। এ শ্মশান ছেড়ে কোনদিন কোথাও পরিব্রাজনে বা তীর্থ পর্যটনে যাননা বামদেব। সেই শ্মশানভূমির পবিত্র মৃত্তিকা মাথায় নিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন সেই অমুতপ্তচিত্ত সাধকের দল।

কত মৃতপ্রায় মানুষকে অকালমৃত্যুর কবল থেকে টেনে এনেছেন বামদেব তার ইয়ত্তা নাই। তাঁর হাতের বা পায়ের সামান্য স্পর্শমাত্র কত রোগীর কত দুরারোগ্য রোগ সেরে গেছে। কারো তল পেটে পা দিয়ে জোরে লাথি মেরে তার হার্ণিয়া রোগ সারিয়ে দিয়েছেন। আবার মুমূর্ষু যক্ষা রোগীকে তার বিগত জীবনের পাপকর্মের জন্য তিরস্কার করতে করতে তার গলাটা জোরে টিপে ধরেছেন। আর অমনি রোগীটি যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ; কিন্তু পরমমুহূর্তেই দেখা গেছে, রোগীটি আরোগ্য লাভ করেছে সেই ভয়াবহ ক্ষয় রোগ থেকে।

ক্রমাগত ইন্দ্রিয় বিগ্রহ আর আত্মসংযম পালন করতে করতে করতে সাধকেরা এক অসাধারণ যোগবিভূ'ত লাভ করেন যার নাম কামাবসায়িত্ব। এই বিভূতিবলে তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। অবশ্য কোন মরদেহকে চিরদিনের জন্য অক্ষয় বা অমর করে রাখতে পারেন না ; কিন্তু ইচ্ছা করলে কারো জীবনীশক্তিকে দীর্ঘায়িত করে তার মরদেহটাকে অকাল মৃত্যু বা দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন।

একদিন কোথা হতে হঠাৎ এক সাধু এসে হাজির। তিন দিন আগে সাধুটি ত্রিবেণীতে যখন গঙ্গাস্নান করছিলেন তখন একজন জ্যোতিষ তাঁকে বলে, তাঁর নাকি সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে এবং তিন দিন পরেই তার মৃত্যু যোগ আছে। প্রাণভয়ে যেখানে সে গেছে সকলেই একবাক্যে বামদেবের নাম করেছে। তাই সাধুটি তারাপীঠে চলে এসেছে। সাধুটি বয়সে তরুণ। সাধনা সবেমাত্র শুরু করেছে, এখনো উচ্চ মার্গে উঠতে পারেনি। তাই মৃত্যুভয়ে এমন ভীত ত্রস্ত।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শ্মশান সংলগ্ন গাছেপালায় ও ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার জটিল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কেউ

প্রথমে কোন রোগ সারানো বা প্রাণ বাঁচানোর কথা বললেই ভীষণ চটে উঠতেন বামদেব। বলতেন, শালারা ডাক্তারের কাছে যা, আমার কাছে এসেছিস কেন?

সাধুটির কাতর আবেদনে কিছুটা নরম হলেন বামদেব। বললেন, ঠিক আছে, এই মুহূর্তে তুই ওই দ্বারকা নদী হতে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়। কাছেই ঘাট। দেরি করিস না।

সাধুটি আরো ভীত হয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কারণ ঘাটের পথের দুপাশেই আগাছার জংগল। ভাবল, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে জেনেই যেন সে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন বামদেব। তাকে ঠেলে দিচ্ছেন তাই অন্ধকার বন পথে যেখানে সাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বামদেব বললেন, যা, যা বলছি কর। কোন ভয় নাই।

অভয় পেয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সাধুটি। ভয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। সাধুটি দেখল, একটি ঘোর কালো বিষধর সাপ কুটিল মন্থর গতিতে বামদেবের সামনে এসে ফণাটা নাচাতে লাগল। বামদেব সঙ্গে সঙ্গে তার গলাটা এক হাতে ধরে আর একটা হাত দিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর বললেন, তুই ঠিকই এসেছিস নিয়তিরূপে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে।

তারপর সাপটি শান্তভাবে তেমনি মন্থর গতিতে চলে গেল বনের মধ্যে।

একবার কলকাতার কয়েকজন শিষ্য বামদেবকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। সাধারণতঃ তিনি কোথাও যেতে চাইতেন না। অনেক ধরাধরির পর রাজী হলেন।

যাবার দিন ভক্তদের সঙ্গে স্টেশনে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখা গেল, ট্রেন এসে গেছে। ভক্তরা চঞ্চল হয়ে উঠতে হেসে

বামদেব বললেন, কোন ভয় নেই। আমি না গেলে ট্রেন ছাড়বে না।

সত্যিই দেখা গেল, নির্দিষ্ট সময় হয়ে যাওয়ার আধঘণ্টা পরেও ট্রেন ছাড়ছেনা। অথচ তার কারণ কেউ ধরতে পারছে না। বামদেব গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসতেই গাড়ী চলতে লাগল। পরে যাত্রীরা সবাই বলতে লাগল, এ হচ্ছে সিদ্ধপুরুষ বামদেবের লীলা।

বামদেবের এবার চুয়াত্তর বছর বয়স পূর্ণ হয়ে গেছে। দেহটা কেমন যেন অশক্ত ও অপটু হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। ইহ জীবনে দীর্ঘ মরদেহে আর যেন বাঁচতে চান না তিনি। আজকাল তারাপীঠের শ্মশানে বা মন্দিরে মন যেন তাঁর আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। বহুদিন পর আমার সে মন মাঠ ডাঙ্গা বাতাসের মত ঢেউ ভাঙ্গা নদী জলের মত কোথায় কোন অসীমের পানে ছুটে যেতে চায়। আজকাল নিজের দেহমধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর মধ্যেই বামদেব শুনতে পান মহাবায়ুর কম্পন। সে কম্পনে তাঁর দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু নেচে ওঠে এক অজানা আনন্দে। মৃত্যুর ঘনায়মান করাল ছায়ার মধ্যে তিনি দেখতে পান দূর অমৃত লোকের এক আলোকতীর্থ।

আজকাল প্রায়ই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন বামদেব। ভক্তদের কথার খুব কম জবাব দেন। তাঁর মনে হয়, আকাশের ওপার হতে তারা মা তাঁকে ডাকছেন। তাঁর যে তারা মা এতদিন মন্দিরের মধ্যে ক্ষুদ্র শরীরী মূর্তিতে আবদ্ধ ছিলেন আজ তিনি অনন্ত ও অশরীরী সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন আকাশে বাতাসে জলে স্থলে। আকাশ নীলবর্ণ। নীলবর্ণ অসীমের প্রতীক। তাঁর নীলবর্ণা তারা মার তাই আদিগন্ত পঞ্চ আকাশ জোড়া আসন পাতা।

১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। সেদিন সমাধিতে বসলেন বামদেব। আগের দিন সারা দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজ সকাল হতে আকাশ একেবারে পরিষ্কার। সোনালি আলোর ঝর্ণা ঝরছে স্বচ্ছ নীল আকাশ হতে। সকাল হতে ভক্তরা কাঁদতে শুরু করেছে। অন্তিম সমাধিতে বসবার একটু আগে এক মধুর ভৎর্সনার সুরে সবাইকে বললেন, আমি আমার মার কাছে যাচ্ছি। তু শালাদের তাতে কি? তোদের জ্বালায় আমি মার কাছে যেতে পাব না? কাঁদবি ত চিমটে দিয়ে মারব। কেলো, আমার চিমটে আর ত্রিশূলটা নিয়ে আয় ত।

কেলো নামে কালো রঙের কুকুরটিও যেন বুঝতে পেরেছিল তার প্রিয় প্রভুর জীবনাবসানের কথা। ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ মনে কেলো ত্রিশূলটা মুখে করে নিয়ে এল।

বামদেব আবার তাদের বোঝালেন, তোরা দেখতে পাচ্ছিস না, নীলবর্ণা মা আমার আকাশের ওপার হতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ সূর্য ঝলসিয়ে উঠছে। কণ্ঠে তার বজ্রের সঙ্গে বরাভয়। তোরা সে ডাক শুনতে পাচ্ছিস না?

তারপর এক গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন বামদেব।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

হ্যাঁগো! তোমরা ভগবানকে কেউ চোখে দেখেছ? তিনি এই জগতের পিতা না মাতা? কালী না কৃষ্ণ? আমাদের বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ মূর্তি আছে। আমার বাবা মা সেই বিগ্রহকেই ভগবান বলে পুজো করে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না।

শান্তিপুরের পথে ঘাটে কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই তাদের ধরে ধরে আকুলভাবে এই সব প্রশ্ন করেন বালক বিজয়কৃষ্ণ।

সাধুরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন বিজয়কৃষ্ণের মুখপানে। কি উত্তর দেবে খুঁজে পায় না। অবশেষে বলে, আমরা ত বাবা তোমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। বড় হও; তখন নিজে নিজেই এ সব বুঝতে পারবে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন ভীষণ রেগে যান। চীৎকার করে বলে ওঠেন পারবে না ত সাধু হয়েছে কেন? ভগবানকে যদি দেখতে না পেলে ত কিসের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যত সব ভণ্ড কোথাকার, সাধুর বেশ ধরে লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাধুরা কিন্তু রাগ করেন না বালক বিজকৃষ্ণের কথায়। তাঁরা তাঁরা বুঝিয়ে বলেন, তাঁকে দেখতে এখনো পাই নাই বলেই ত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি বাবা। কখন পাব তাও জানি না। হয়ত এ জন্মে এজীবনে পাবই না। হয়ত আরো কত জন্ম কেটে যাবে।

বড় বয়সে কে কেমন হবে ছেলেবেলাতেই তার একটা আভাস পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতরূপ দিনে দিনে

বিস্ফুরিত হতে থাকে বাল্যকালের বিচিত্র লীলায়। নিতান্ত বাল্যকাল হতেই ভক্তিভাবের এক অফুরন্ত উৎস ছিল বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যেত না। নীরস যুক্তিবোধের এক কঠিন আবরণে ঢাকা ছিল যেন সেই উৎসমুখটি। তীক্ষ্ণতর কোন যুক্তির আঘাত না পেলে সে মুখটি যেন খুলবে না। অর্থাৎ কেউ যদি উপযুক্ত যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে না পারে দেবতার অস্তিত্ব, সঠিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তাঁর মহিমাকে, তাহলে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস বা ভক্তি করবেন না সে দেবতাকে।

বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ। বাবা মা প্রায়ই ঠাকুর ঘরে বিজয়কে নিয়ে গিয়ে বলতেন, নমো কর। প্রথম প্রথম যখন শিশু ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ তখন বাবা মার কথামত কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতেন, আবার কখনো বা নত হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রনাম করতেন। কিন্তু শৈশব থেকে বাল্যকালে প্রবেশ করতেই নমো করবার কথা বলতেই রীতিমত অসন্তোষ প্রকাশ করতেন তিনি। বলতেন, খালি নমো করো আর নমো করো। তোমাদের ঠাকুর, তোমরা নমো করগে যাও। আমি কেন খালি খালি নমো করতে যাব।

বাবা মা একসঙ্গেই তখন বিজয়কে বোঝাতেন, ওকথা বলতে নাই বাবা। ঠাকুর কি কারো একার? যিনি আমাদের ঠাকুর, তিনিই আবার সবার ঠাকুর।

মা অমনি তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রনাম করে বেদী হতে মাটি নিয়ে বিজয়ের মাথায় দিয়ে দিতেন। সেই মাটি তারপর ঠাকুরের উদ্দেশে বলতেন, অপরাধ নিও না ঠাকুর। ছোটছেলে, ওর জ্ঞান নাই।

বাবা বলেন, তুমি কৃষ্ণের দাস। বিখ্যাত অদ্বৈত বংশের সন্তান আমরা। তুমি ঝুলন পূর্ণিমার দিন জন্মলাভ করেছ। তুমি

ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছি মনে মনে।

সেদিনটির কথা আজো মনে আছে আনন্দচন্দ্রের। সেদিন শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমা। ১৮৪১ সাল ভরা পূর্ণিমার সময় বিষয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হতেই আনন্দচন্দ্রের সহসা মনে হলো, এ যেন সাধারণ ছেলে নয়। নতুন করে মুখ উজ্জ্বল করবে গোস্বামী বংশের।

হোলি ঝুলন আর রাস—এই তিনটি দিন বড় আনন্দের বৈষ্ণবদের কাছে। উপনিষদের মতে আত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও ব্রহ্ম,কার্য ও কারণ এক এবং অভিন্ন। কিন্তু বৈষ্ণবমতে আত্মাও পরমাত্মা প্রথমে অভিন্ন ছিল, পরে ভিন্ন হয়েছে। নির্বিশেষ নির্বিকল্প ব্রহ্ম কোন এক মধুর চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে যোগমায়াশ্রিত হয়ে আপন লীলারস আস্বাদন করবার জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করেন। অখিল রসামৃতস্বরূপ অখণ্ড অবিচ্ছন্ন পরমাত্মা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন অজস্র জীবের মধ্যে। সকল জীবাত্মাই পরমাত্মার সঙ্গে নিরন্তর মিলিত হতে চাইছে।

বৈষ্ণবমতে রাধা হচ্ছে এই জীবাত্মার এবং কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হলো, এমন এক পরব্রহ্মরূপী পরমানন্দ সত্তা যিনি জীবজগৎকে সমস্ত কর্ম হতে নিবৃত্ত করে তাঁর দিকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছেন। পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি রাধার ব্যাকুলতা হলো পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মারই ব্যাকুলতা। বৃন্দাবনের ভৌগলিক অস্তিত্বটা বড় কথা নয়, জীবের অন্তরই হলো প্রকৃত বৃন্দাবন; তাদের বক্ষস্থলই হলো ব্রজধাম। এই অন্তর বৃন্দাবনে মাঝে মাঝে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটলেও এ মিলন চিরস্থায়ী হতে পারে না কখনো। অতৃপ্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাকে চিরতরে চরিতার্থ করবার জন্য এক বিষণ্ণ ব্যাকুলতায় রাধা তাই চির অভিসারিণী। এই অভিসারের শেষ নাই।

বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, দোল, ঝুলন আর রাস এই তিনটি পূর্ণিমার

তিথিতে কৃষ্ণ রাধাকে তার সঙ্গদান করে কিছুকালের জন্য মিলিত হয়েছিলেন দুজনে। অনন্ত রসামৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম মূর্ত হয়ে এসে নিবৃত্ত করেন রসপিপাসু জীবের অতৃপ্ত রসপিপাসা। তাই এই তিনটি দিন পরম পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈষ্ণবদের কাছে।

এমনি এক পবিত্র পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যাকালে পরম বৈষ্ণব আনন্দচন্দ্রের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছিল সহসা। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপন অথচ ব্যাকুল কামনায় ফেটে পড়েছিল তাঁর অন্তর। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের বিগ্রহের কাছে এক কাতর মিনতি জানিয়ে বলেছিলেন, এইদিন তুমি জীবের রসপিপাসাকে তৃপ্ত করেছিলে। তোমার সাহচর্যরূপ অমৃত লাভ ধন্য হয়েছিল আমাদের মহাভাবস্বরূপিণী রাধা। আজ তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর ঠাকুর। আজ তুমি আমায় এমন এক সন্তান দান কর যে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে; তোমার নাম প্রচার করে মোহান্ধ জীবকে দান করতে পারে মুক্তির আলো।

এ আবেদন সত্যি সত্যিই সার্থক হয়েছিল আনন্দচন্দ্রের।

আনন্দচন্দ্র ছেলের নাম রাখলেন বিজয়কৃষ্ণ। বালকৃষ্ণের মতই ছিল তাঁর নধর ঘনশ্যাম কান্তি। কৃষ্ণের মতই ছিলেন দুরন্ত এবং উদ্দাম। পথে ঘাটে। অবিরত ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। কিন্তু কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেননি বিজয়কৃষ্ণ; বরং সুযোগ পেলে পরের উপকার করতেন প্রচুর। বাড়ী থেকে অনেক জিনিষ অনেক সময় দেখিয়ে ও লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের গরীব লোকদের দিয়ে দিতেন। মা স্বর্ণময়ী দেবীও অত্যন্ত দানশীল রমণী ছিলেন। আনন্দচন্দ্র যজমানদের বাড়ী থেকে যে সব জিনিষ পেতেন সেই সব জিনিস তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিতেন ভিখারীদের মধ্যে।

যথাসময়েই পাঠশালাতে ভর্তি হয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ মেধারও পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু পড়াশুনোত

কখনো মন বসাতে পারতেন না বেশীক্ষণ। তবে কোন পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি কোন মোহ না থাকলেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক প্রবল সত্যসন্ধিৎসা ছিল তাঁর। ছোট থেকেই তাঁর মন ছিল যেমন বস্তুনিষ্ঠ, তেমনি যুক্তিবাদী। ভালভাবে না দেখে অথবা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে সত্য বলে মেনে নিতে পারতেন না কোন কিছুকে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে উঠতেন পাঠশালার শিক্ষকরা।

সবচেয়ে মুস্কিলে পড়তেন তাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, তিনি জগতের পিতা না মাতা সেই প্রশ্নের উত্তর আদায় না করে কিছুতেই ছাঁড়তেন না বিজয়কৃষ্ণ। যে প্রশ্নের আঘাতে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে আলোড়িত ও মথিত হয়ে উঠত তাঁর সমস্ত অন্তর, সেই প্রশ্নের জ্বলন্ত ঢেউটাকে তিনি যেন ছড়িয়ে দিতে চাইতেন সারা পৃথিবীতে।

সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল আনন্দচন্দ্রের। তাই তিনি স্থির করেছিলেন, গাঁয়ের পড়া শেষ হলেই তিনি ছেলেকে পাঠাবেন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে।

কিন্তু পাঠশালা হতে টোলে বিজয়কৃষ্ণ ভর্তি হতেই আনন্দচন্দ্র মারা গেলেন অকালে।

টোলের পড়া হয়ে গেলেই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন মা। বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন ষোল কি সতের। মা স্বর্ণময়ী দেবী নিজে ছেলেকে কলকাতায় কোন এক যজমানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। একটিমাত্র ছেলে। তাকে যেমন করে হোক মানুষ করে তুলতেই হবে।

কলকাতার পথে পথে ও গঙ্গার ঘাটে ভিখিরি দেখে মা ও ছেলে দুজনেরই মন বিচলিত হয়ে উঠল। অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে

হাতের সঞ্চয় সব দিয়ে দিতে লাগলেন অকাতরে। বিজয়কৃষ্ণ একদিন মাকে বললেন, ভগবান তোমার বিগ্রহমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নাই মা ; তিনি আছেন বহুরূপে এই সব মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে।

মা স্বর্ণময়ীও স্বভাবতই দয়াবতী ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমিও তাই মনে করি। আমাদের বিগ্রহ মূর্তির মধ্যে যে কৃষ্ণ আছেন, সব জীবের মধ্যেও আছেন সেই এক কৃষ্ণ। তোমার বাবাও বলতেন, কৃষ্ণ কখনো কারো একার হয়ে এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে নাই। কৃষ্ণ যখন রাধার সঙ্গে রাস নৃত্য করতেন, তখন মণ্ডলাকারে নৃত্যরতা ষোড়শ সহস্র প্রতিটি গোপিনী দেখত, কৃষ্ণ তারই পাশে থেকে নৃত্য করছেন।

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু পড়াতে মন বসাতে পারলেন না। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুন এই প্রশ্ন মথিত ও আন্দোলিত করতে লাগল তাঁর হৃদয়কে। এক বিরাট বিপ্লব চলেছে তখন বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তখন। বহু শিক্ষিত বাঙালী ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করছে। তখন বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে যে ঝড় বইছিল তার আঘাতে বিজয়কৃষ্ণের মনও বিচলিত হয়ে উঠল ভীষণভাবে। প্রকৃত সত্যধর্ম কি, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, কে দেবে প্রকৃত পথের সন্ধান—বিজয়কৃষ্ণ তা উদ্‌ভ্রান্তভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন আপন মনে।

কলকাতার পথে ঘাটে কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখতে পেলেই যেমন এই সব প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে বিজয়কৃষ্ণের, তেমনি গাঁয়ের

বাড়ীতে গেলে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ মূর্তির সামনেও জেগে ওঠে সেই সব প্রশ্ন। অথচ দিনের পর দিন চলে যায় শুধু; কোন সমাধানই খুঁজে পান না।

বাড়ীতে গেলে মা বিভিন্ন যজমানদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন বিজয়কৃষ্ণকে। বহু যজমান ও শিষ্য ছিল আনন্দচন্দ্রের। বৎসরান্তে প্রত্যেকের বাড়ীতে একবার করে যাওয়া দরকার। মার অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ যান। কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তি তাতে বেড়েই ওঠে। তাঁর মনে হয়, তিনি যেন প্রতারণা করেছেন নিজের সঙ্গে। উত্তরাধিকার সূত্রে কখনো গুরু হওয়ার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। যিনি অখণ্ড ও মণ্ডলাকার রূপে সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে ব্যাপ্ত করে আছেন তাঁর পাদপদ্মকে যিনি দর্শন করিয়ে দিতে পারেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত গুরু! যুক্তিনিষ্ঠ সত্যান্বেষী যুবক বিজয়কৃষ্ণের মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি নিজে কি সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দর্শন করতে পেরেছেন? তা যদি না পারেন, তবে কেমন করে তিনি তা অপরকে দর্শন করাবেন?

ঠিক এমন সময়ে কোন এক বৃদ্ধা শিষ্যা তাঁর এই প্রশ্নটিকে আরো তীক্ষ্ণ ও প্রবল করে তোলে মনের মধ্যে। বৃদ্ধার কেউ কোথাও নাই। কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে। কিন্তু তা রক্ষণাবেক্ষণে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে দৈহিক ও বৈষয়িক চিন্তা, অন্যদিকে মুক্তির আকাংক্ষা। বৃদ্ধা তাই আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন বিজয়কৃষ্ণের কাছে, আমি দিনরাত নানা জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি বাবা। আমায় তুমি মুক্ত কর। আমাকে মুক্তির পথ তোমায় দেখিয়ে দিতেই হবে। কিছুতেই ছাড়ব না বাবা।

প্রকৃত মুক্ত কে? গীতায় অভ্যাসযোগে বিজয়কৃষ্ণ পড়েছেন, মন সকল সময় অস্থির ও চঞ্চল। এই মন যে যে বিষয়ে

ছুটে যায় সেই সেই বিষয় হতে মনকে ফিরিয়ে এনে আপন আত্মার মধ্যে যিনি স্থির রাখতে পারেন, রজোগুণ দূর করে মনকে যিনি শান্ত ও সংযত করতে পারেন তিনিই জীবন্মুক্ত হন। তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

কিন্তু তিনি কি তা পেয়েছেন? এ প্রশ্ন বহুবার নিজেকে নিজে করেছেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু কোন উত্তর পাননি। আজও পেলেন না। তাই বৃদ্ধাকে কোন কথা গোপন না করে অকপটে বললেন, আমায় আপনি ক্ষমা করুন মা। আমি নিজেই এখনো মুক্ত হতে পারিনি; কেমন করে আপনাকে মুক্ত করব?

সেই দিনই গুরুগিরি ত্যাগ করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

কলকাতায় ফিরে এসে সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু মনের কোন পরিবর্তনই হলো না তাতে। সংস্কৃত কলেজে প্রাচীন শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাকরণ পড়তে যেমন তাঁর ভাল লাগত না, তেমনি মেডিকেল কলেজে দেহ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা পড়তেও খুব একটা উৎসাহ খুঁজে পেলেন না বিজয়কৃষ্ণ। সংস্কৃত কলেজে যেমন তাঁর প্রায়ই মনে হত, শাস্ত্রের মধ্যে সত্য কখনো আবদ্ধ নাই, তেমনি মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে প্রায়ই মনে হতে লাগল, বিজ্ঞান কখনো দেহের সব রহস্যকে ধরতে পারে না; দেহের সব রোগকে বিজ্ঞান দূর করতে পারে না; ব্যাধি যেখানে আত্মিক বা অধ্যাত্মিক সেখানে বিজ্ঞান তাকে দূর করবে কোন শক্তিতে।

বিজয়কৃষ্ণের একান্ত ভাবে মনে হলো, তিনি আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে সত্যি সত্যিই ভুগছেন। এই সময় গীতা পাঠ করতে করতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি শ্লোক পাঠ করে মনে জোর পেলেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥

আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে। আত্মাকে কখনো অবসাদগ্রস্ত হতে দিলে চলবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু; আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। আত্মাকে দিয়ে যিনি নিজেকে বশীভূত করতে পারেন, তিনি আত্মার বন্ধু; আর যিনি আত্মার দ্বারা নিজেকে বশীভূত করতে পারেন না, তিনি নিজেই নিজের কাছে শত্রু।

বিজয়কৃষ্ণের মনে হলো, তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাধি অনেকখানি নিরাময় হয়ে গেছে। পড়াশুনো যথারীতি করে চললেন। ভাবলেন, গুরুগিরি ছেড়েছেন। সংসারে আয় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিদ্যা শুরু করলে সংসার পালনের ভাবনা হবে না। আবার তার সঙ্গে জনসেবার কাজও হবে। তাছাড়া বহু দুঃস্থ ও আর্ত ব্যক্তির বিনা খরচে তিনি চিকিৎসা করতে পারবেন।

একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পথে বেড়াতে ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বিজয়কৃষ্ণ। ব্রাহ্মরা বলেন, 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম।

কার্যালয়ের ভিতরে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ দেখলেন, সামনে এক বেদীতে বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত সকলকে ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শোনাচ্ছেন। বিজয়কৃষ্ণও ভক্তিভরে বসে সকলের সঙ্গে মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

মহর্ষির উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁর ভাষার ওজঃ গুণ, তাঁর স্বচ্ছগভীর উপলব্ধি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সব কিছু মিলে বড় হৃদয়সংবেদ্য করে তুলেছিল তাঁর উপদেশাবলীকে। সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণ। তবু যুক্তিবোধকে সজাগ রেখে দিলেন মনের কোণে। ভাবলেন, ভাল করে সব কথা না শুনে বা বুঝে এঁদের কথা সত্য বলে কখনই মেনে নেব না।

মহর্ষি তখন বলছিলেন, "যাঁহা হইতে ভূতসকল ও অখিল বিশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাঁহা দ্বারা এই চরাচরস্থ জীবাদি সকলেই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহা যাহা জন্মিয়াছে সেই সকলই যাহাতে লয় পাইয়া থাকে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। হৃদয় মধ্যে আকাশস্থানে সত্যস্বরূপ সদানন্দময় সূক্ষ্ম দীপ্তিময় ব্রহ্ম দীপ্তি পাইতেছেন। সমস্ত শ্রুতিই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। যিনি অণু হইতে অণুতম এবং মহৎ হইতেও মহত্তম সেই আত্মা জীবগণের দেহাভ্যন্তরে গুহায় অর্থাৎ নিভৃত স্থানে নিহিত আছেন। সেই অদ্ভুতস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করিয়া বিগতশোক হও অর্থাৎ মুক্তিলাভ কর। মনে রাখিবে এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়; সর্বভূতে সর্বজীবে সেই এক ব্রহ্ম অজস্র মায়িকরূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব চরাচরে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্ম অন্ন নন, প্রাণ নন, মম নন, জ্ঞান নন, বিজ্ঞান নন, ইনি একমাত্র আনন্দ স্বরূপ। আনন্দরূপ অমৃতের মধ্য দিয়াই ইনি প্রতিভাত হন।"

এবার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল বিজয়কৃষ্ণের মন হতে। মনে মনে ঠিক এইটিই যেন চাইছিলেন। আমরা যাকে ঈশ্বর বলি, তিনি যেই হোন, তাঁর বিরাটতম অলৌকিক সত্তা কখনো মানবাকৃতি একটি বিগ্রহ মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাঁর মনে হলো, মহর্ষি ঠিকই বলেছেন. ব্রহ্মই হচ্ছে একমাত্র পরম সত্য। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনন্ত, অখণ্ড ও মণ্ডলাকার।

অবিলম্বে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে দেবেন্দ্র নাথ ও কেশব সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণসমাজের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। অল্পদিনের মধ্যেই একজন নিষ্ঠাবান বুদ্ধিমান সুযোগ্য কর্মীরূপে তাঁদের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেন।

দেবেন্দ্রনাথ একবার প্রচারকদের জন্য কিছু করে মাসিক

বৃত্তির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণ তা গ্রহণ করেননি। বরং তার ঘোর আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে যে সত্য আদর্শ আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি তাই মানুষের কাছে প্রচার করে অবিদ্যার অন্ধকার হতে তাদের আলোর পথে নিয়ে আসব—এটা আমাদের সামাজিক কর্তব্য। এর জন্য পয়সা নেয়া কখনই উচিত বলে মনে করি না আমি।

অবশেষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন বরাবর চরমপন্থী। তিনি যখনি যা কিছু করতেন, তা নিখুঁতভাবেই করতে চাইতেন। তাঁর সকল কর্ম ও চিন্তাকে তিনি এক সার্বিক ও অখণ্ড পরিপূর্ণতা দান করতে চাইতেন। তাঁর হঠাৎ একদিন মনে হলো, আমরা যদি জাতিভেদ না মানি, তাহলে উপবীত ধারণ করছি কেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে তখনো কিছুটা দ্বিধা ছিল। ধর্মাচরণের দিক থেকে এতটা বিপ্লবী তিনি তখনো হয়ে উঠতে পারেননি। বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু সেইদিনই উপবীত ত্যাগ করলেন। জ্ঞাতিদের অপমান, সমাজের শাসন কোন কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি।

কিছুদিন আগেই মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তখনকার দিনে খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হত। বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র আঠারো। এ বিষয়ে ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না তাঁর মনে। পরিণামদর্শিতার স্বচ্ছ আলোর ভিতর দিয়ে ভবিষৎ জীবনের কোন ধারণা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তাঁর মনে। সুতরাং প্রতিবাদ করবার মত কোন যুক্তি খুঁজে পাননি তিনি।

এবার সংসারের অভাব বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। মা আর স্ত্রী শান্তিপুরের বাড়ীতেই থাকেন। সেখান থেকে প্রায়ই টাকা পাঠাবার জন্য চিঠি আসে। বিজয়কৃষ্ণ কোন রকমে নিজের ভরণ পোষণ চালান কলকাতায়। ধর্ম প্রচারের মধ্যেও

অতিকষ্টে মেডিকেল কলেজের পড়াটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এতদিন। কিন্তু শেষ পরীক্ষার মাসকতক আগেই সহসা পড়া ছেড়ে যশোহরের এক গ্রামে প্রচারের কাজে দীর্ঘদিনের জন্য চলে গেলেন।

ফিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ দেখলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন ও নব্যপন্থী-দের মধ্যে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিজয়কৃষ্ণ বরাবরই নব্য এবং চরমপন্থী; সুতরাং কেশব সেনের দলে যোগ দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে রয়ে গেলেন। ধর্ম আন্দোলন নিয়ে এই ভেদাভেদ বাদ বিসম্বাদ ও তর্ক বিতর্কের উত্তেজনা দেখে বড় মর্মাহত হলেন বিজয়কৃষ্ণ। এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আগের থেকে অনেক কমে গেল।

এই সময় মন যখন তাঁর প্রায় চিন্তায় চঞ্চল ও উত্তেজনায় উষ্ণ থাকত তখন এক একদিন রাত্রিতে তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে স্বপ্ন দেখতেন বিজয়কৃষ্ণ। মনোহর মূর্তিতে শ্যাম-সুন্দর স্বপ্নে তাঁর কাছে এসে কত কথা বলতেন। বিজয়কৃষ্ণ ভাবতেন, এসব হচ্ছে তাঁর চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্কের অসংলগ্ন সৃষ্টি। তিনি শ্যামসুন্দরকে বিশ্বাস করেন না; ঔপনিষদিক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে মানেন না।

একবার কিছুদিনের বিশ্রাম নেবার জন্য শান্তিপুরের বাড়ীতে গিয়ে থাকেন বিজয়কৃষ্ণ। এই সময় গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের সঙ্গে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এ বিষয়ে দুটি অলৌকিক কাহিনীর কথা বলেন।

এর থেকে বোঝা যায় তিনি শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ মূর্তিকে বিশ্বাস না করলেও কেমন অযাচিতভাবে শ্যামসুন্দরের অহেতুক কৃপা লাভ করে ধন্য হন তিনি। এই ভাবে এক বিরাট রূপান্তর শুরু হয় তাঁর ধর্মজীবনের। জ্ঞানমার্গীয় সাধনার শুকনো নীরস ক্ষেত্রটি ভক্তিরসে আপ্লুত ও উর্বর হয়ে উঠতে শুরু করে সহসা।

একবার শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণের কাছে জল চেয়েছিলেন। আর একবার চেয়েছিবেন সোনার চূড়ো।

একদিন দুপুরবেলায় খাওয়ার পর বিশ্রাম করছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। এমন সময় শ্যামসুন্দর তাঁকে মানুষের মত গলায় স্পষ্ট করে বললেন, এই দেখ আমাকে এরা খেতে দিয়েছে; কিন্তু জল দেয়নি।

বিজয়কৃষ্ণের এক কাকিমা পুজোর দেখাশোনা করতেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে গিয়ে বলতেই কাকিমা কথটা তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিলেন। উপহাসের সুরে বললেন, শ্যামসুন্দর আর জল চাই-বার লোক পেলেন না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক ছাড়া ঠাকুর কারো সঙ্গে কথা বলে না। তুই কি ব্রহ্মজ্ঞানী? ঠাকুর, তাই তোর সঙ্গে কথা বলতে যাবে?

বিজয়কৃষ্ণ তখন বললেন, আচ্ছা, তুমি ঠাকুর ঘরে গিয়ে খোঁজ করে দেখ, ভোগের সময় ঠাকুরকে জল দেয়া হয়েছে কি না। আমি ত আর ভোগের সময় ছিলাম না।

কাকিমা গিয়ে দেখলেন, সত্যি সত্যিই ভোগের সময় সেদিন জল দেয়া হয়নি।

আর একদিন শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণকে বলেছিলেন, আমায় সোনার চূড়ো গড়িয়ে দেনা। আমার পরতে সাধ হয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন রসিকতার সুরে বললেন, সাধ হয়েছে তা আমাকে বলছ কেন? আমি ত তোমায় বিশ্বাস করি না, জান ত আমি ব্রাহ্ম, পুতুলপুজো মানি না। তোমার ভক্তদের তুমি বল, তারা ঠিক দেবে।

শ্যামসুন্দর তার উত্তরে বললেন, তোর কাকিমাকে বলগে, তার ঝাঁপির ভিতর টাকা আছে।

একথা বিজয়কৃষ্ণ কাকিমাকে বলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, শ্যামসুন্দর আমাকেও স্বপ্নে ঐ কথা বলেছিলেন।

আমার ঝাঁপির ভিতর যে সাতবট্টিটি টাকা আছে তা বাইরের কেউ জানে না। প্রভু শ্যামসুন্দর আমার যথার্থ অন্তর্যামী কিনা, তাই তাঁর কাছে কিছুই গোপন রাখা সম্ভব নয়। তুই ধন্য বিজয়! এ তোর বহুজন্মের তপস্যার ফল। আমরা এতদিন সেবা ও জপতপ করে যা না পেলাম তুই না চাইতেই তা পেয়ে গেলি। তুই আমাদের শ্যামসুন্দরের মনের মানুষ হয়ে উঠলি।

ঘটনাটির এইখানেই শেষ হয়নি। কাকিমার টাকায় বিজয়-কৃষ্ণ চূড়ো গড়িয়ে এনে দিলে শ্যামসুন্দর একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে তাঁকে ডেকে বলেন, একবার দেখে যা, চূড়ো পরে আমায় কেমন মানিয়েছে।

সন্ধ্যার একটু আগে ছাদের উপর একা একা পায়চারি করছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। শান্ত নরম অন্ধকার তখনো শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে ওঠেনি গাছেপালায়। এমন সময় তাঁর সহসা মনে হলো, সিড়ির দরজার কাছে কে যেন উকি মারছে। বিজয়কৃষ্ণ সেদিকে ফিরে চাইতেই কে যেন মানুষের গলায় বলল, আয় আয়, একবার দেখবি আয়। দেখে যা আমায় কেমন সেজেছে সোনার চূড়ো পরে।

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমায় দেখব কেন। কি হবে, আমি ত তোমায় বিশ্বাস করি না।

শ্যামসুন্দর তেমনি মানুষের গলায় সিড়ির ভিতর অদৃশ্য থেকে বললেন, নাই বা বিশ্বাস করলি; একবার শুধু চোখে দেখতে দোষ কি?

বিজয়কৃষ্ণ এবার উঠে গিয়ে সোজা ঘরে গেলেন। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ মূর্তির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারলেন না। এমন রূপলাবণ্য কোন মানুষের দেহে কখনো তিনি দেখেননি। এমন ভূমার ব্যঞ্জনা কখনো খুঁজে পাননি তিনি কোন মানুষের মুখে।

শ্যামসুন্দর তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, তুই যে

একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলি। কিন্তু তা কেমন করে হয়, যার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করিস না তা তোকে মুগ্ধ করতে পারে কেমন করে?

বিজয়কৃষ্ণ কিছুটা লজ্জা অনুভব করলেন। এক প্রবল আলোড়ন অনুভব করলেন অন্তরে। ভক্তিভাবের এক প্রবল বন্যা এসে এক ভয়ংকর আঘাত হেনে টলিয়ে দিল তাঁর যুক্তিবোধের অটল ভিত্তিটাকে। তাঁর মনে হলো, এতদিন যেন ভুল পথে চলে এসেছেন এবং আজ এই মুহূর্তে শ্যামসুন্দরের পায়ের উপর নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কোন-রূপে সামলে নিয়ে স্থির হলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সহসা গীতার ভক্তিযোগের একটি কথা মনে পড়ল বিজয়কৃষ্ণের। অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁরা সমস্ত কর্ম তোমাতেই অর্পণ করে তোমার সেবা করেন আর যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কারা?

তখন শ্রীভগবান উত্তর করলেন,

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমাতেই প্রাণমন সমর্পণ করে সর্বদা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার সেবা করেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

মনের মধ্যে এতদিন ধরে যে অশান্তির আগুন জ্বলছিল, সিগ্ধ ভক্তিভাবরসসিঞ্চনে যে আগুন প্রশমিত হলো অনেকখানি; তবু একেবারে নিবল না। ভক্তিভাবের প্রেরণায় চারিদিকে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্ম একে একে ছেড়ে দিতে লাগলেন।

এবার দীক্ষা নেবার বাসনা জাগল তাঁর মনে। উপযুক্ত সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়ে যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ঈশ্বর প্রাপ্তির পরম লক্ষ্যের দিকে। তাঁর এই সময়কার ভক্তিভাব-

রসসিদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ।

কেশবচন্দ্র স্পষ্ট মন্তব্য করেন, গোঁসাই ভক্তিসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর এই ভক্তিভাবের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এইভাবে তাঁরা যেন নীরস জ্ঞানমার্গের ক্ষেত্রে ভক্তিভাবের প্রয়োজনীয়তার কথাটি প্রথম উপলব্ধি করতে শুরু করেন বিজয়-কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ শুনলেন বিজয়কৃষ্ণ। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বকথাগুলিকে দৈনন্দিন জীবনের কত ঘটনা ও বস্তুর উপমা সহযোগে মানুষকে বুঝিয়ে দেন ঠাকুর। জ্ঞানমার্গের উত্তুঙ্গ হৈমশিখরে আবদ্ধ জমাট বাঁধা ধর্মরসের ধারাটিকে উপলব্ধির উত্তাপে গলিয়ে সাধারণ মানুষের বোধশক্তির সহজ সমতলে নামিয়ে আনতে চান তিনি যেন।

তবু তৃপ্ত ও ঠিকমত শান্ত হলো না বিজয়কৃষ্ণের মন। তিনি যেন আরো কি চান।

ভক্তিভাবের সাধনায় বৈষ্ণব সাধকেরা স্বভাবতঃই সিদ্ধ। তাই তখনকার দিনে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকদেব সঙ্গে দেখা করলেন বিজয়কৃষ্ণ। প্রথমে গেলেন নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীর কাছে। চৈতন্যদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। চৈতন্যোত্তর বাংলাদেশে এত বড় সিদ্ধ পুরুষ খুব কমই এসেছেন। তবু এতটুকু অহমিকা নাই মনে। দীনতার যেন মূর্ত প্রতীক।

বিজয়কৃষ্ণ সহসা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবাজী, ভক্তি কিসে হয় অর্থাৎ কিভাবে সহজে ভক্তিভাব জন্মে মানুষের অন্তরে বলতে পারেন?

চৈতন্যদাসবাবাজী উত্তর করলেন, একথা তোমার মুখে সাজে

না গোঁসাই। তুমি বিখ্যাত অদ্বৈত বংশের সন্তান। তবে একটা কথা মনে রেখো গোঁসাই, দীন হীন কাঙাল না সাজলে বা সমস্ত রকমের অভিমান মন থেকে দূর করতে না পারলে ভক্তিভাব স্থায়ী হয় না অন্তরে।

এই কথা বলার পর বিজয়কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন দীনতার প্রতিমূর্তি চৈতন্যদাসবাবাজী।

আর কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে চলে এলেন বিজয়কৃষ্ণ।

এরপর একদিন কালনায় ভগবান দাসবাবাজীর কাছে যান। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে আশ্রমে পৌঁছেই জল চাইলেন বিজয়কৃষ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান দাস বাবাজী নিজে তাঁর কমণ্ডলুটি এগিয়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, আপনি একি করছেন ? আপনার নিজের ব্যবহারের কমণ্ডলুটি আমাকে কেন দিচ্ছেন ?

ভগবান দাস বাবাজী শান্ত ও নম্রমধুর কণ্ঠে উত্তর করলেন, মনের মধ্যে সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত না হলে ত ভক্তিভাব জাগবে না প্রভু। আপনি আমাকে আর পরীক্ষা করবেন না। জলপান করুন প্রভু।

এইভাবে দুই সিদ্ধ মহামানবের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার মধ্যে সার্থক ভক্তিভাবের জীবন্ত ও মূর্ত বিকাশ দেখে এক আশ্চর্য তৃপ্তি লাভ করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

আর একদিন কলকাতায় একটি পথে চামার বেশধারী এক সাধকের মধ্যে আশ্চর্য ভক্তির বিকাশ দেখে ভক্তিভাব আরো প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর মনে।

একদিন মেছোবাজার স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর জুতো ছিঁড়ে যায়। রাস্তার উপর একটি চামারকে দেখে সেখানে জুতো সেলাই করতে গেলেন। লোকটি পয়সা চুক্তি না করেই জুতোটি সেলাই করে দিল এবং অতি সামান্য পয়সা নিল। তার-

পর তার যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে গেল। বিজয়কৃষ্ণের মনে বিস্ময় জাগল বেশ কিছুটা। লোকটি কোথায় যায় তা দেখবার জন্য তিনিও তার পিছু নিলেন। অবশেষে লোকটি একটি আশ্রমে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ দেখলেন, লোকটি সেই আখড়ার মোহান্ত। বহু শিষ্যের গুরু। বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ঠাকুর ঘরে। লোকটি ব্রাহ্মণ এবং তিনিই পূজা করেন। বিজয়কৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জুতো সেলাই-এর কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি জলভরা চোখে শান্ত ও সিক্ত কণ্ঠে বললেন গুরুবাক্য যাতে মিথ্যা না হয় সেই জন্যই আমি এই কাজ করেছি। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার আগেই আমি দুর্মতিবশতঃ নিজে আহার করেছিলাম ; তাই আমার গুরুদেব আমায় বললেন, তুই সাধু হলি কেন, তুই হচ্ছিস চামার।

আমার গুরুবাক্য যাতে আমার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয় তার জন্যই সেইদিন হতেই আমি চামারি করে আমার জীবিকা অর্জন করি। সারাদিন জুতো সেলাই করে আমার আহারের উপযোগী মাত্র চার আনা পয়সা পেলেই আমি চলে আসি। গুরুদেবের আমার দয়ার নন্ত নাই। যাবার কালে তিনি আমার মত অযোগ্য হতভাগ্যকেই তাঁর এই আখড়া ও বিগ্রহ সেবার ভার দিয়ে গেছেন। সাধ্যমত আমি তাঁর সত্যবাক্যের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর সেবা করে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই ভাবে আমি গুরুর আদেশ পালন করে যেতে পারি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত!

মানুষের উপরকার আকার ও বেশভূষা দেখে মানুষকে চেনবার উপায় নাই। কোন দীন হীন কঙালের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোন মহামানব গোপনে আসন পেতে বসে আছেন উপর থেকে তা বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের চর্মচক্ষুর দৃষ্টি ও বাস্তব-বুদ্ধির সীমা তাঁর কখনো নাগাল পায় না। তাই সেইদিন হতে

পথের দুধারে যত নর-নারী দেখেন ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকেই মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে চলেন বিজয়কৃষ্ণ। অখণ্ড অমৃত যে পরমাত্মা বিভাজিত হয়ে ছড়িয়ে-আছেন অজস্র মানুষের জীবাত্মার মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যে জানান নিবিড়তম প্রণতি।

এবার সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠল বিজয় কৃষ্ণের মনে। আর বৃথা কালক্ষেপ করা চলে না। প্রকৃত সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে পরমার্থ লাভের জন্য নিয়মিত সাধনকার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। এক একটি দিন কেটে যায় আর ব্যর্থতার এক মর্মজ্বালা অনুভব করেন বিজয়কৃষ্ণ। মনে হয়, কিছুই হলো না, বৃথাই কেটে গেল একটা অমূল্য দিন। পথে কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই মনে হয়, ইনিই হয়ত তাঁর গুরু।

একদিন মির্জাপুর স্ট্রীটে একজন দীর্ঘদেহী সাধু দেখে তার কাছে গিয়ে নমস্কার করলেন বিজয়কৃষ্ণ। সাধুটি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেই তাঁর সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। তাঁর মনে হলো, কে যেন এক বরফের স্তুপ চাপিয়ে দিয়েছে মাথায়।

সাধুর পিছু পিছু মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। ইডেন গার্ডেনে যাবার পর একটি গাছের তলায় বসলেন সাধুটি। তিনি বারবার গুরুর কথা বলতে লাগলেন। প্রকৃত সদ্‌গুরু ছাড়া কিছুই হয় না। বিজয়কৃষ্ণ তখন তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন আকুলভাবে। কিন্তু তিনি বললেন, তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন। সময় হলেই তাঁর দেখা পাবে।

এই বলে সেখানে আর অপেক্ষা না করে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন সাধুটি। সম্মোহিতের মত বিজয়কৃষ্ণও তাঁর পিছু পিছু অনুসরণ করতে হাগলেন। কিন্তু হাওড়ার পোলের উপর গিয়ে আর তাঁর দেখা পেলেন না।

মনের দুঃখ মনে নিয়েই ফিরে এলেন বিজয়কৃষ্ণ। তীব্র

ব্যাকুলতার এক অসহ্য উত্তাপে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ হতে লাগল তাঁর মনের সেই অতৃপ্ত বাসনাটি। বিধি নির্দিষ্ট প্রকৃত সদ্গুরুকে খুঁজে বার করতেই হবে। ঈশ্বর দর্শন করতেই হবে।

আর একদিন ঠনঠনিয়ার মোড়ে একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছেও ছুটে যান বিজয়কৃষ্ণ। সন্ন্যাসী তার মনের বাসনাটি বুঝতে পেরে বললেন, আকাশে কেউ ইচ্ছা করলেই ইমারৎ গড়তে পারে না। প্রথমে গুরু করতে হবে। কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নাই। সময় হলেই গুরু মিলে যাবে।

একবার এক যোগীর সন্ধান পেয়ে দার্জিলিংএর কাছে এক গভীর অরণ্যে গিয়ে উপস্থিত হন বিজয়কৃষ্ণ। দেখলেন, এক বৌদ্ধযোগী পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছেন; এক জ্যোতিপুঞ্জ বিরাজ করছে তাঁর মাথার উপরে। ধীরে ধীরে বহু যোগবিভূতির পরিচয় পেলেন তাঁর। অবশেষে তাঁকে দীক্ষা দেবার জন্য সকরুণ মিনতি জানালেন তাঁর কাছে। কিন্তু যোগী উত্তর করলেন, আমি আদিষ্ট না হয়ে কাউকে দীক্ষা দিই না। তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন। তুমি এখন নর্মদা তীরে যাও।

বিজয়কৃষ্ণ নর্মদা তীরে গিয়ে দেখলেন সত্য সত্যই সেখানে এক সাধক রয়েছেন। কিন্তু তিনিও দীক্ষা দিলেন না। বললেন, আমিও তোমার নির্দিষ্ট গুরু নই। তিনি যথাসময়ে তোমার সামনে আবির্ভূত হবেন অথবা তোমাকে তাঁর কাছে টেনে নেবেন।

এর পর বিজয়কৃষ্ণ কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে যান। তাঁর সেখানে পবিত্র সাহচর্যে বেশ কিছুদিন থেকে মনে বড় শান্তি লাভ করেন।

একদিন বিজয়কৃষ্ণ যখন মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে ছিলেন তখন সহসা গঙ্গা থেকে উঠে এসে স্বামিজী বললেন, স্নান করে আয়; আজ তোকে একটা মন্ত্র দেবো।

যে মহাযোগীকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে তাঁর মাথায় গঙ্গাজল বেল-

পাতা দিয়ে পুজো করে তিনি আজ নিজে নিজে থেকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে চেয়েছেন, এটা পরম ভাগ্যের কথা। তবু কোন খুশির আবেগে এতটুকু বিচলিত হলেন না বিজয়কৃষ্ণ। যে দীক্ষা গ্রহণের জন্য কতবার কত কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন কত সাধু সন্ন্যাসীর কাছে, আজ সেই দীক্ষাগ্রহণের পথে কোথায় যেন সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ বাধা অনুভব করলেন তিনি। তাঁর আজ সহসা মনে হলো, আজো যেন উপযুক্ত বিশ্বাসের রসে সিক্ত হয়ে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি তাঁর আধ্যাত্ম সাধনার ভূমিটি। নিবিড় আত্ম সমর্পণের সুরে আজো সাধা হয়নি তাঁর জীবনের বীণাটি। আজো তাঁর মনের জমিটি রয়ে গেছে অবিশ্বাসে উষর, অহংবোধে অন্ধকার।

কিন্তু তিনি ত অসত্য বলতে পারেন না। মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে তিনি ত প্রতারণা করতে পারেন না কারো সঙ্গে। তাই বিজয়কৃষ্ণ সবিনয়ে হাতজোড় করে বললেন, প্রভু, আমার মন্ত্র তন্ত্রে এখনো তেমন বিশ্বাস জন্মেনি; তাছাড়া আমার মার কাছে আমার প্রাথমিক দীক্ষা হয়ে গেছে।

স্বামীজীও ছাড়বেন না; তিনি হেসে বললেন, আমি তোর দীক্ষাগুরু নই; অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দেখা পাবি। তবে তোর শরীর শুদ্ধির জন্য এ মন্ত্রের প্রয়োজন আছে।

তারপর মন্ত্রদান করলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী। এই মন্ত্র বহুদিন জপ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। এ মন্ত্র জপ করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অতি সূক্ষ্ম এক শুচিতা অনুভব করতেন সমগ্র দেহ মনে। মনে হত, দেহ মনের সমস্ত মলিনতা মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকে।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটি অনেক ক্ষীণ হয়ে গেলেও তখনো তা একেবারে ছিঁড়ে দেননি বিজয়কৃষ্ণ। প্রচারকার্যের জন্য এখানে সেখানে প্রায়ই যেতে হত তাঁকে। মুখে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার করলেও নির্গুণ ব্রহ্মের পরিবর্তে সগুণ ঈশ্বরের প্রতি এক তীব্র আকুতি জেগেছে তাঁর অন্তরে। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত রক্ত

ভক্তিরসে রূপান্তরিত হয়ে এক সগুণ ঈশ্বরের কল্পনায় নিবিড় উচ্ছাসে ফুলে ফুলে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। তিনি চান সদ্‌গুরু, পরা-ভক্তি, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের সগুণ বিশেষিত রূপ।

সেবার গয়া গিয়ে শুনলেন, গয়ার কাছে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সিদ্ধ রামাইৎ সাধু রঘুবরদাস বাবাজী আশ্রম স্থাপন করে আছেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়ে রঘুবরদাস বাবাজীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণ। এবার দীক্ষা নয়। তিনি চাইলেন পরাভক্তি।

রঘুবরদাস বাবাজী আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমার সদ্‌গুরু লাভে আর দেরী নাই।

বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু অন্য কোথাও না গিয়ে সেই আশ্রমেই রয়ে গেলেন। প্রেমভক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন দেখলেন রঘুবরদাসজীর জীবনে। মুখে অনবরত রামনাম লেগেই আছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় জড়িয়ে আছে রামের ধ্যান। আরাধ্য দেবতাকে কোন মানুষ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিতে পারে নিজের জীবনের সঙ্গে এর আগে সে বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না বিজয়কৃষ্ণের। তাছাড়া আরাধ্য দেবতার প্রতি সেই গভীর প্রেমভক্তির প্রবাহকে কত সহজে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও জীবের উপর। চারি-পাশের গভীর বনের হিংস্র পশুরাও রঘুবরদাসজীর প্রেমে বশীভূত। তারাও তাঁর কথায় ওঠে বসে।

জীবনে এক পরম শিক্ষালাভ করলেন বিজয়কৃষ্ণ। এই সময় একদিন এক সাধকের সন্ধানে ব্রহ্মযোগী পাহাড়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরবার পথে এই পাহাড়ের পাদদেশে গোরখোয়ায় কিছু-ক্ষণ অবস্থান করেন। তিনি লোক মুখে শুনেছিলেন, এইখানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন। তাই এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাবের এক প্রবল বন্যা উদ্বেলিত হয়ে

উঠল তাঁর অন্তরে। ইষ্টদেবতা দর্শনের জন্য আকুল হয়ে উঠল তাঁর প্রাণ মন। তাঁর মনে হলো, পাহাড়ের প্রতিটি পাথরের টুকরো ও গাছপালা সহসা সিক্ত ও সজীব হয়ে উঠেছে তাঁর সেই অকৃত্রিম ভক্তিভাবরসে।

সত্যি সত্যিই সদ্‌গুরু পেতে আর দেরি হলো না বিজয়কৃষ্ণের। আকাশগঙ্গা পাহাড়ের শীর্ষদেশেই একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা পেয়ে গেলেন এক পরমহংস মহাপুরুষের। এই মহা-পুরুষকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জন্মার্জিত সাত্বিক সংস্কার জেগে উঠল তাঁর মনে। নদী যেমন তার পাহাড়ী প্রাণের কঠিন শপথ নিয়ে অজস্র বাধাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমুদ্রের মাঝে ছুটে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে পরম শান্তি লাভ করে, বিজয়কৃষ্ণও তেমনি এই মহাপুরুষের চরণতলে সমস্ত চিন্তার বোঝা নামিয়ে এক অধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করলেন। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন যুগ যুগ ধরে এই মহাপুরুষের জন্যই প্রতীক্ষা করে আছেন। এঁকেই খুঁজে আসছেন অজস্র সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে।

এতদিনে বাসনা পূর্ণ হলো বিজয়কৃষ্ণের। তিনি দীক্ষা লাভ করলেন ব্রহ্মানন্দস্বামী পরমহংসজীর কাছে। কিন্তু তাঁর মন্ত্র জপ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা হারিয়ে গুরুদেবের চরণে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। অনেকক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলেন, গুরুদেব নাই। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হলেন গুরুদেব! চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ংকর অনুশোচনা জাগল তাঁর মনে। গুরুদেবের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কোন কারণই খুঁজে পেলেন না। কেবলি মনে হতে লাগল, হয়ত বা তাঁরই কোন ত্রুটি বা পাপের জন্য গুরুদেব তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন।

অন্ধকারের মাঝে চকিত আলোর এক স্বর্ণরেখা চোখের

সামনে ফুটে উঠেই মুহূর্তে তা মিলিয়ে গেল। ফলে অন্ধকার আবার নিবিড়তর হয়ে উঠল চারিদিকে। অনাহারে অনিদ্রায় বনে পাহাড়ে জংগলে পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। গুরুদেব দীক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু সাধনপদ্ধতি বলে দেননি। সুতরাং বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়নি। যেমন করে হোক গুরুদেবকে খুঁজে বার করতেই হবে।

জীবনে একটার পর একটা করে বাধা যত নিবিড় হয়ে আসে, ততই প্রবল হয়ে ওঠে বিজয়কৃষ্ণের প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিকূল অবস্থার কাছে কোনদিন মাথা নত করেন নি; জীবনে কোনদিন করবেনও না। যে অদম্য প্রাণশক্তিকে তিনি অধ্যাত্ম সাধনার কাজে নিয়োজিত করেছেন, তা কোন দিনই দমবে না। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণ তাই একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। এত বিরুদ্ধ অবস্থার আঘাত, এত অন্তর্দ্বন্দ্ব এত অর্থকষ্ট ভারতের আর কান সাধককে সহ্য করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। সাধারণতঃ অন্য সব সাধকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধনার আকুতিটি অন্তরে দানা বেঁধে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প চেষ্টার পর বিধিনির্দিষ্ট সদ্‌গুরু লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে গুরু প্রদর্শিত পথে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু সদ্‌গুরু লাভের জন্য বিজয়কৃষ্ণের সংগ্রাম ও সাধনার যেন সীমা নাই শেষ নাই।

হঠাৎ একদিন রামশিলা পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে গুরুদেবের দেখা পেয়ে গেলেন বিজয়কৃষ্ণ। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুতাপ ও অভিমান দূর হয়ে গেল। তাঁর মনে হলো, গুরুদেব হয়ত পরীক্ষা করছিলেন তাঁকে। তাঁর ভক্তির গভীরতা ও সাধনার নিষ্ঠা যাচাই করবার জন্যই যেন অন্তর্হিত হয়েছিলেন গুরুদেব। গুরুদেব আশ্বাসের হাসি হেসে বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নাই, খুব জোর সাধন ভজন করে চল। সিদ্ধিলাভে আর বিশেষ দেরি হবে না।

মন তবু শান্ত হয় না। সিদ্ধি পরের কথা। প্রথমে তিনি চান গুরুদেবের অবিরাম পুণ্য সাহচর্য। এই সাহচর্য পেলেই সাধনার সিদ্ধিলাভে দেরি হবে না। বিজয়কৃষ্ণের আকুলতা দেখে পরমহংসজী বললেন, আমার নির্দেশমত সাধনা করে চলবে; যখনি দরকার হবে, আমাকে মনে প্রাণে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দেখা পাবে। মনে রাখবে গুরুর দেহগত সঙ্গলাভটাই বড় কথা নয়। যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু। তিনি দূরে থেকেও শিষ্যের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেন। কোন বিষয়ে প্রয়োজন হলেই শিষ্যের মানসপটে আবির্ভূত হয়ে তাকে নির্দেশ দিয়ে যান।

বিজয়কৃষ্ণ তখন বিনীতভাবে বললেন, তবু আপনার স্থায়ী সাধন স্থানটি কোথায় তা জানতে ইচ্ছা করছে প্রভু। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমি নিজেই গিয়ে আপনার দর্শন লাভ করব। আপনাকে না দেখে আমি খুব বেশীদিন থাকতে পারব না। কোন প্রয়োজন না থাকলেও মাঝে মাঝে আমি সেখানে যাব।

স্বামিজী বলতে লাগলেন, আমার দেশ হচ্ছে পাঞ্জাব। প্রথমে সেইখানেই একটি আশ্রমে নানকপন্থীদের মতে সাধনা শুরু করি। তারপর এক বৈদান্তিক মহাযোগীর সংস্পর্শে এসে তাঁর নির্দেশে বেদান্ত মতে ব্রহ্মসাধনা করি। বর্তমানে আমার সাধনস্থল হিমালয়ে মানস সরোবরের তীরে। আসল মানস সরোবর হচ্ছে এই ভৌগলিক মানস সরোবর হতে দূরে। সেখানে যোগশক্তি-সম্পন্ন সাধক ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারে না। তবে আমি কখন কোথায় থাকি তার কিছুই ঠিক নাই।

সহসা এক কৌতুহল জাগল বিজয়কৃষ্ণের মনে। বললেন, আচ্ছা স্বামীজী, আপনি ব্রহ্মকে কোনদিন দেখেছেন?

স্বামীজী তখন উপনিষদের একটি উদ্ধৃত শ্লোক করে বললেন,

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়॥

ব্রহ্মকে কি কখনো এক জন্মের সাধনায় পাওয়া যায়? তাঁকে দেখবার জন্যই জন্ম জন্মান্তর ধরে রূপে রূপে এই পৃথিবীতে আসছি। তাঁকে পেয়ে গেলে আর আসতে হবে না। মন দিয়ে সাধনা করে যা, একদিন না একদিন তাঁকে পাবি।

মনে ভক্তি ভাব লেগেছে বিজয়কৃষ্ণের মনে। কিন্তু এই ভক্তিভাবের বন্যায় মন হতে যুক্তিবোধ তখনো ভেসে যায়নি। সাধক ও যোগীদের প্রতি ভক্তি থাকলেও তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি বিশ্বাস করতেন না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার বশে সব কিছুকে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে চিরে চিরে বিচার করতেন। আর অন্তরে যা বিশ্বাস করতেন না, বাইরে তা কখনই গোপন করতেন না। একদিন কথায় কথায় এই সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর অবিশ্বাসের কথা স্পষ্ট প্রকাশ করে বসলেন বিজয়কৃষ্ণ।

স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, বাস্তব বুদ্ধি এবং যুক্তি দ্বারা সত্যের একটা অংশকে মাত্র পেতে পার। পূর্ণ অখণ্ড সত্যকে কখনো তা দিয়ে লাভ করা যায় না। যোগীদের এই সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারাও অবশ্য পরম সত্যকে জানা যায় না। কিন্তু এ সব থেকে একটা জিনিষ বোঝা যায়, সেটা হলো এই যে, বাস্তব জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত আত্মার একটা সত্য আছে যে সত্য কখনো কোন পার্থির নিয়ম মেনে চলে না; বরং এই সত্য মাঝে মাঝে পার্থিব বস্তু জগতের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে।

এই কথা বলার পর স্বামীজী একে একে অষ্ট বৈদিক যোগ এবং অষ্ট যোগের অষ্ট সিদ্ধি গুলি দেখালেন বিজয়কৃষ্ণকে। তিনি দেখালেন কেমন করে যোগীরা অনিমা লঘিমা ও মহিমা রূপ সিদ্ধির দ্বারা নিজের দেহকে ইচ্ছামত ছোট বড় ও লঘু করতে পারেন। ব্যাপ্তিরূপ সিদ্ধিবলে তাঁরা একই সময়ে সর্বত্র অবস্থান

করতে পারেন ও প্রাকাম্য দ্বারা যে কোন ভোগের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। ঈশিত্ব ও বশিত্ব শক্তির বলে নিজের আত্মাও সর্বভূতকে বশীভূত করতে পারেন এবং কামবসায়িত্ব শক্তিবলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

সব কিছু দেখে শুনে আশ্চর্য হয়ে যান বিজয়কৃষ্ণ। আজ জীবনে প্রথম তিনি এমন সব ক্রিয়াকাণ্ড দেখলেন যা বুদ্ধি বা যুক্তি দ্বারা কখনো ব্যাখ্যা করতে পারবেন না তিনি। সব শেষে স্বামীজীর একটি ক্রিয়া দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ের চারিদিকেই ঘন বন। সেই বনের এক প্রান্তে তাঁরা দেখলেন একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। স্বামীজী সহসা ধ্যানতন্ময় হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগশক্তিবলে নিজের প্রাণশক্তি সেই মৃতদেহের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটি জীবন্ত হয়ে উঠে বসল বিজয়কৃষ্ণের সামনে। এতবড় অলৌকিক ঘটনা জীবনে তিনি কখনো দেখা ত দূরের কথা কানেও শোনেন নি।

দেখতে দেখতে একেবারে শিথিল হয়ে পড়ল তাঁর সমস্ত যুক্তিবোধ ও বাস্তব জ্ঞানের অহমিকা। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকার পর বিজয়কৃষ্ণ দেখলেন, শবটি আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তর্থাৎ স্বামীজী তাঁর যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন সেই শবদেহের মধ্যে আবার সেই প্রাণশক্তি পাকর্ষণ করে নিলেন নিজের মধ্যে।

এবার লজ্জিত হলেন বিজয়কৃষ্ণ গুরুদেবের কাছে। সমস্ত অবিশ্বাস ও সংশয় নিঃশেষে দূর হয়ে গেল অন্তর থেকে। গুরুর কাছে নিবিড়তম আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মনে প্রাণে হাল্‌কা হয়ে উঠলেন একেবারে। এই সময় একদিন গুরুর আদেশে কোন এক তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রে যোগদান করে তন্ত্র সাধনার কতকগুলি

গঢ় সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তান্ত্রিক একজন মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ।

ভৈরবীচক্র হতে ফিরে এসে স্বামীজী বললেন, সকল সাধন পদ্ধতির মধ্যেই শেখবার অনেক কিছু ওাছে। কোন একটি বিশেষ ধর্মমত বা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামি থাকা উচিত নয়। তন্ত্রশাস্ত্রে চক্রসাধনের লক্ষ্য হলো অন্তরের মধ্যে সুপ্ত কূল কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করা। আমাদের ব্রহ্মের সঙ্গে সেই শক্তির মূলগত কোন ভেদ নাই। আবার বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের এই নির্বিশেষ নির্গুন ব্রহ্মেরই রসমূর্তি। সুতরাং হরিণাম সংকীর্তনও মাঝে মাঝে করবে। তাতে মনে বল পাবে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এবার ব্রাহ্মসমাজ কি ত্যাগ করব ?

পরমহংসজী বললেন, ত্যাগ করবার কি দরকার। বলেছি ত সকল ধর্মসমাজ ও পদ্ধতির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে। তবে এমন একটা সময় আসবে যখন মন চলে যাবে সকল সম্প্রদায় মত ও পথের উর্ধ্বে। তখন আপনা থেকে সব খসে যাবে। ঘটা করে ত্যাগ করবার দরকার হবে না।

এই বলে গুরুদেব অন্তর্হিত হলেন। বিজয়কৃষ্ণ এবার আকাশগঙ্গা পাহাড়ের গহন বনে গভীর তপস্যায় ডুবে গেলেন। পরিধানে গৈরিক বসন; জটাজালে পরিণত হয়েছে মাথার কেশপাশ। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর শুষ্কপ্রায়। তবু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এক আসনে এক মনে দিনের পর দিন সাধনা করে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ। এই সময় রঘুবরদাস বাবাজী যথেষ্ট লক্ষ্য রাখেন তাঁর দিকে।

একদিন সহসা গয়া থেকে কাশী যাবার নির্দেশ পেলেন গুরুদেবের কাছ থেকে। সেখানে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে

সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে। নূতন নাম হলো অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ত্যাগের বাসনা জাগল মনে।

কিন্তু গুরুদেব তাতে সায় দিলেন। কাশীতে একদিন হঠাৎ আর্বিভূত হয়ে বললেন, সংসার ত্যাগ করবে না। সংসারে থেকেই সাধনা করে চলো। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমাকে সংসারে থাকতে হবে।

কাশী থেকে আবার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরে এসে নূতন করে সাধনা শুরু করলেন বিজয়কৃষ্ণ। এবার কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে উঠল তাঁর সাধনার ধারা। রঘুবরদাস বাবাজী আগের মতই লক্ষ্য রাখতে লাগালন তাঁর শরীরের প্রতি। তাঁর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের কঠোরতার কথা শুনতে পেয়ে আত্মীয় বন্ধুরা ছুটে এসে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। তেমনিই সাধনা করে যেতে লাগলেন। এটাই তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সংকল্প করে যখনি যে কাজ শুরু করেন প্রাণ মনের সমস্ত নিষ্ঠা ও উদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করেন সে কাজে। সে কাজ সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত চলে তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা।

আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে ফল্গু নদী পার হয়ে রামগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। রামগয়ায় নৃসিংহ মন্দিরে ঢুকেই সহসা তাঁর পূর্বজন্মের একটি কথা মনে পড়ে যায়। গত জন্মে এই মন্দিরে আরো দুই তিনজন সাধুর সঙ্গে তপস্যা করতেন। তাঁর আরো মতে পড়ল, এই মন্দিরের কাছাকাছি একটি বটগাছে 'ওঁ রাম' এই মন্ত্রটি লিখে রেখেছিলেন। তিনি খোঁজ করে দেখলেন, সত্যিই মন্দির সংলগ্ন একটি বটগাছে সেই মন্ত্রটি আজো খোদাই করা রয়েছে।

এই অঞ্চলের একটি পাহাড়ে একদিন বৌদ্ধ যোগী

গম্ভীরনাথজীর সঙ্গে দেখা হয় বিজয়কৃষ্ণের। যে কোন মতের অনুযায়ী হোক না কেন, সব যোগপদ্ধতির মধ্যে শেখবার অনেক কিছু আছে—তাঁর গুরুদেবের এই বাণীটি স্মরণ করেই নাথপন্থী এই বৌদ্ধযোগীর কাছ থেকে বৌদ্ধ যোগ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন তিনি।

এই সময় কঠোর যোগ সাধনার ফলস্বরূপ এক অদ্ভুত আত্মশক্তি লাভ করেন বিজয়কৃষ্ণ। চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক দিব্য জ্যোতি। সহসা একদিন কলকাতা যাবার বাসনা মনে জাগতেই মনে মনে অনুমতি প্রার্থনা করলেন গুরুদেবের কাছে। অনুমতি লাভ করে কলকাতা রওনা হলেন।

কলকাতায় পা দিয়েই প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিজয়কৃষ্ণ। দেখা হওয়ার সঙ্গে মহর্ষিকে প্রণাম করলেন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে। মহর্ষি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন তাঁর যোগবিভূতির কথা। বললেন, আজ তোমায় নতুন মানুষ দেখছি। নিশ্চয় কোন অমুল্য বস্তু পেয়েছ; কোথায় পেলে?

বিজয়কৃষ্ণ উত্তর করলেন, গয়ার এক পাহাড়ে। এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ দয়া করে কিছু দিয়েছেন।

মহর্ষি বললেন, যে বস্তু তুমি পেয়েছ তাতে তুমি ধন্য হবে। এ বস্তু কখনো ত্যাগ করো না।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা যায়। তখন বিজয়কৃষ্ণকে অবলম্বন করে অন্য নেতারা সাধারণ ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশব সেনের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তাঁকে তাঁরা বাদ দেন। বিজয়কৃষ্ণকে পূর্ববঙ্গে প্রচারের জন্যে যেতে হয়। এই প্রচারকার্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার কোন বিরোধ ছিল না। সারাদিন প্রচারকার্যের পর সন্ধ্যা থেকে

শুরু হত তাঁর কঠোর তপস্যা। ঢাকার সেগুরিয়া আশ্রমে কিছুকাল থাকেন বিজয়কৃষ্ণ।

শোনা যায় এই আশ্রমে থাকাকালে তাঁর তপস্যা ক্রমশঃই খুব কঠোর হয়ে ওঠে এবং সেই কঠোরতর তপস্যার ফলস্বরূপ তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। চিত্তদ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তার নাম ধ্যান। কিন্তু পাঁচ রকমের ধ্যানের কথা বলা হয়েছে। এই ধ্যান প্রধানতঃ দুই রকমের—নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুন ধ্যান একই রকমের; কিন্তু সগুণ ধ্যান চার রকমের। আত্মজ্ঞান দ্বারা অব্যয় অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী অদৃশ্য অপ্রমেয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানা ও আমিও সেই ব্রহ্মময় এইরূপ অনুভব করাকেই নির্গুণ ধ্যান বলে। সগুণ ধ্যানে সাধকগণ নারায়ণ, আদিত্য, বৈশ্বানর বা অগ্নি অথবা শিবের রূপকল্পনা করে থাকেন আপন আপন মর্মস্থানে। বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সগুণ ধ্যানকেই পছন্দ করতেন এবং তিনি নারায়ণকেই পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করতেন। কন্দমধ্য হতে ওঠা বারো আঙুল পরিমাণ নল বিশিষ্ট ও চার আঙুল পরিমাণ উর্ধ্বমুখ অষ্টদল হৃদয়পদ্ম আছে। এই হৃদয় পদ্মকে প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা প্রফুল্লিত ও প্রস্ফুটিত করতেন প্রথমে। পরে সেই প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্মে চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী কেয়ুর ও কিরীটশোভিত, পদ্মপত্রানন পীতবসন, সমস্ত জীবগণের হৃদয়স্থিত, পুরুষোত্তম বাসুদেব পরব্রহ্ম নারায়ণকে ধ্যান করে 'সেই পরব্রহ্ম' নারায়ণই আমি এইরূপ মনে করতে করতে অপরিসীম অলৌকিক আত্মশক্তি লাভ করতেন বিজয়কৃষ্ণ।

একদিন সত্যি সত্যিই তাঁর সমস্ত অন্তরকে অনন্ত জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত করে নারায়ণ আবির্ভূত হলেন। বিজয়কৃষ্ণের মনে হলো, এই নারায়ণ চতুভুজাকৃতি হলেও তাঁর মুখমণ্ডল তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের মত। শ্যামসুন্দর যেন হাসছেন তাঁর

দিকে চেয়ে। তাঁর নির্মল স্ফটিকের মত স্বচ্ছস্মিত হাসির ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মাথায় ময়ূরপুচ্ছটি ঠিকই আছে। এই পুচ্ছটি জগদ্‌যোনির প্রতীক অর্থাৎ এই জগতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ। তিনিই সব কিছুর কারণ। অথচ তিনি অন্য কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি; তিনি স্বয়ম্ভু।

মূর্ছিত হয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর দেহ মনের পরিমিত আধারে সেই অমিত তেজ ধারণ করে সহ্য করতে পারলেন না যেন।

এবার গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে জীবকল্যাণের জন্য আচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বললেন। বললেন, এবার তুমি দীক্ষা নিতে পার। অবশ্য আমি তোমায় সাহায্য করব এ কাজে।

ব্রাহ্মসমাজের সহকর্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। দীক্ষার সময় নগেন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখেন, গোস্বামীজীর পিছনে দীর্ঘদেহী শুভ্রকেশ দিব্যজ্যোতিসমন্বিত এক পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের বিস্ময় বিমোহিত ভাব দেখে প্রভুপাদ গোস্বামীজী বললেন, উনি আমার গুরুদেব পরমহংসজী। দীক্ষা-দানের কালে যাতে আমার মনের মধ্যে কোন অহমিকা না জন্মে সেজন্য আমি গুরুদেবকে স্মরণ করি। তিনি আমার দেহের উপর ভর করেন; তবে আমি দীক্ষা দিই। তাঁরই নির্দ্দেশে আমি এ কাজ যন্ত্রের মত করি।

জটিল দৃঢ় যোগসাধনা সকলের জন্য নয়। গৃহী লোকদের জন্য তাই তিনি খুব সহজ ও সরল সাধন প্রণালীর নির্দ্দেশ দিতেন। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রটি জপ করতে হত শুধু। তিনি উপদেশ দিতেন, ধর্ম কখনো সংসারজীবন বহির্ভূত নয়। সুখে দুঃখে সম্পদে আপদে জীবনকে যা ধারণ করে রাখে, অধঃপতন হতে রক্ষা করে চলে তাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত কাজ হলো মানুষকে সৎকর্ম ও সদাচারে প্রবৃত্ত করা এবং অসৎকর্ম হতে

নিবৃত্ত করা। যথাসম্ভব কর্মফলের আকাংখ্যাকে ত্যাগ করে ইষ্টদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করে আপন আপন কর্তব্য কর্মকে করে যাওয়ার জন্য সকল গৃহী শিষ্যদের উপদেশ দিতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি গীতার মোক্ষযোগ হতে তিন রকমের ত্যাগের কথা উল্লেখ করতেন।

আলস্য বা ভুলবুদ্ধিবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করা হলো তামসিক ত্যাগ। শরীরের দিক থেকে কোন কর্ম কষ্টকর হবে ভেবে তা ত্যাগ করাকে বলে রাজসিক ত্যাগ। যিনি সাত্বিক ত্যাগ করতে পারেন, তিনি কোন দুঃখজনক কাজেও কষ্ট পান না; আবার সুখকর কাজেও অতিরিক্ত আনন্দ পান না। সব সময়ে অবিচলিত চিত্তে কর্তব্য ভেবে নিরাসক্তভাবে যত কাজ করে যান। পৃথিবীতে শরীর ধারণ করে বেঁচে থাকতে হলে কাজ অবশ্যই করতে হবে। কর্ম একেবারে ত্যাগ করা যায় না। যিনি কর্মফল ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ত্যাগী। যাঁর যাঁর মনে আমি করি বলিয়া কোন অভিমান নাই, যিনি কোন কাজের নিজের আত্মাকেই প্রকৃত কর্তা বলে মনে করেন না, তিনি কখনো যে কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন না।

গুরুদেব পরমহংসজী একদিন ঠিকই বলেছিলেন। ধীরে ধীরে সাধনমার্গের এমন এক উচ্চ স্তরে উঠে এলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ যেখানে ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের কোন ভেদ স্পর্শ করতে পারেনা তাঁকে। সমস্ত সমাজ ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানবতার মহত্তর সত্য ও তাৎপর্যকে আজ উপলব্ধি করতে পেয়েছেন তিনি। তাই আজ কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পেলেন না। এবার ব্রাহ্মসমাজ তিনি ত্যাগ করলেন।

দীক্ষা দেবার ব্যাপারে শ্রেণীগত কোন বাছবিচার নাই তাঁর। দীক্ষা দানের কাজকে তিনি নিতান্তই ভগবানের দান ও অহেতুকী

কৃপা বলে মনে করতেন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই দীক্ষালাভ করতে পারে না। কারো চিত্তভূমি প্রস্তুত না হলে সেখানে দীক্ষার বীজ বপন করা যায় না। আবার কারো চিত্তভূমি প্রস্তুত হয়েছে কিনা তা ঈশ্বরই বলে দেবেন। সব কিছুই বিধিনির্দিষ্ট।

একবার একটি দীক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর শিষ্যরা বিশেষ আশ্চর্যবোধ করেন। একদিন কোন এক বাড়ীর পরিচারিকাকে দীক্ষা দান করলেন। অথচ কোন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি যুবককে দীক্ষাদান না করে প্রত্যাখ্যান করলেন।

মুক্তির এক অদম্য আকাংখা ও আকুলতা নিয়ে কত নরনারী যে প্রতিদিন আসত তার আর ইয়ত্তা নাই। কাউকে দীক্ষা দিতেন, কাউকে দিতেন না। কিন্তু অনেককেই অমূল্য উপদেশ দানে প্রীতি করতেন। তাঁর মধুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনে অনেকের চিত্ত হতে ত্রিতাপজ্বালা দূর হয়ে যেত। এইভাবে অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বহু অন্তরে এনে দিতেন সাত্ত্বিক জ্ঞানের আলো আর সাত্ত্বিক কর্মের প্রেরণা।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের সাধকজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর সময়ে ভারতে এমন কোন উচ্চকোটির সাধক ছিলেন না যাঁর সংস্পর্শে তিনি আসেননি অথবা যাঁর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন না। ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বৌদ্ধযোগী গম্ভীরনাথ, ভাস্করানন্দ সরস্বতী, লোকনাথ ব্রহ্মচারি, ভোলানাথ গিরি, রামদাস কাঠিয়া বাবা,—ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল সিদ্ধ সাধকপুরুষই তাঁর আধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন।

একবার গোস্বামীজী কাশীতে ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে দেখা গিয়েছিলেন কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে। তখন ভাস্করানন্দের যোগ ঐশ্বর্যের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্রমে গিয়ে গোস্বামীজী শুনলেন, ধ্যানমগ্ন আছেন ভাস্করানন্দ।

একথা শুনে আশ্রমের বাইরে একটি গাছের তলায় শিষ্যদের সঙ্গে বসে রইলেন গোস্বামীজী। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন সে কাজ সম্পন্ন না করে তিনি কখনই ফিরে যাবেন না।

এদিকে তাঁর উপস্থিতি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাসাধক ভাস্করানন্দ নিজে থেকেই জানতে পেরেছেন। ধ্যানের মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন তাঁকে। তাই ধ্যান ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে উপবিষ্ট শিষ্যদের বললেন, বাগানের একটি গাছের তলায় এক শক্তিমান মহাসাধক বসে আছেন। চল এখনি আমরা সেখানে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনার দ্বারা তাঁকে প্রীত করি।

ভোলানাথ গিরি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে বলতেন, বাংলার আশুতোষ।

লোকনাথ ব্রহ্মাচারি তাঁকে বলতেন জীবন্ত গৌরাঙ্গ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী তাঁর সম্পর্কে বলতেন, জীবনে বহু সাধু আমি দেখেছি, কিন্তু এই বাঙালী সাধুর মত কোন সাধু আমি দেখি নাই।

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের এই সব সাধকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার একটি কারণও ছিল। সেটি হলো এই যে, সকল ধর্মমত ও পথকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বিজয়কৃষ্ণ। কখনো তিনি হতেন ব্রাহ্ম, কখনো বৈষ্ণব, আবার কখনো বা হতেন শৈব। কখনো খোল করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন; আবার কখনো কোন শিবমন্দিরে গিয়ে 'বমভোলা' শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলতেন। কোন একটি বিশেষ বিগ্রহ মূর্তির মধ্যে ঈশ্বরকে কখনো আবদ্ধ দেখতেন না তিনি। তিনি বলতেন, এভাবে ঈশ্বরকে দেখা মানে ঈশ্বরকে খণ্ড করে ছোট করে রেখা। এ দেখাকে গীতায় বলা হয়েছে তামসিক জ্ঞান। একটি বিশেষ বিগ্রহ মূর্তির মধ্যে আমার যে ইষ্টদেবতাকে দেখছি, সেই দেবতাকে

বিশ্বের সর্বভূতে ব্যাপ্ত করে দেখতে হবে। আমি এইভাবেই আমার ইষ্টদেবতার পূজা ও ধ্যান করি।

সদ্‌গুরুর অকৃত্রিম স্নেহ এবং অহেতুক কৃপা ছাড়া কোন সাধকই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না জীবনে। মা যেমন সন্তানকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখেন, সদ্‌গুরুরাও তেমনি তাঁর শিষ্যকে সব সময় তাঁর সজাগ সচেতন দৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করে চলেন।

একবার দ্বারভাঙ্গায় থাকাকালে গোস্বামীজী অম্লশূলে আক্রান্ত হন। অসুখ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। অবশেষে প্রতিকারের অতীত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকগণ আশা ত্যাগ করেন। এমন সময় একদিন দেখা গেল, গোস্বামীজী যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের বারান্দায় এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসে রয়েছেন।

তখন দুপুরবেলা। কে সে সন্ন্যাসী, কোথা হতে এসেছেন —শিষ্যরা সকলে খোঁজ করতে যেতেই দেখলেন, সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন সে সন্ন্যাসী। বহু খোঁজাখুজি করেও তাঁর আর দেখা পাওয়া গেল না।

কিন্তু আশ্চর্য। বিকাল থেকে দেখা গেল, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের আর কোন রোগ নাই। কোন ইন্দ্রজাল বলে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই আরোগ্য লাভ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়। সকলকে আরো বিস্মিত করে দিয়ে সন্ধ্যার সময় এক হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে শুরু করলেন। এক নূতনতর প্রাণ শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে যেন তাঁর দেহমন।

রাত্রিকালে এ বিষয়ে শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার গুরুদেব পরমহংস স্বামীজী এসে আমার রোগ নিরাময় করে দিয়ে গেলেন।

তাঁর গুরুদেব পরমহংসজী যেমন তাঁর দিকে সব সময় লক্ষ্য রেখে চলতেন, তেমনি তিনিও তাঁর শিষ্যদের বিপদে আপদে তাদের রক্ষা করে চলতেন।

সেবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ মিত্র নামে কোন শিষ্যকে এক বিশেষ কাজে ঢাকা হতে কলকাতায় পাঠান। কলকাতায় পোঁছে বড়বাজার দিয়ে যাবার সময় মহেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করেন। তাঁর কাছে তখন মাত্র চারটি পয়সা ছিল। ঐ পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় দুধ কিনে খাবার উদ্যোগ করতেই তাঁর সামনে এক সাধু এসে ভিক্ষা চাইলেন। একে অতিথি নারায়ণ তাতে আবার তিনি ক্ষুধার্ত। সুতরাং তাঁর সেবা করা আগে কর্তব্য এই ভেবে পয়সা চারটি সাধুটির হাতে তখনি দিয়ে দিলেন মহেন্দ্রনাথ।

মহেন্দ্রনাথ কাজ সেরে ঢাকায় ফিরে গেলে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, পয়সা চারটি সাধুকে দিয়ে সেদিন ভালই করেছ।

মহেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সুদূর ঢাকা থেকে কি করে গুরুদেব কলকাতার সেই ঘটনাটির কথা জানতে পারলেন, তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। বিজয়কৃষ্ণ তখন শিষ্যদের সকলকে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। বললেন, মহেন্দ্রনাথ পয়সা চারটি দিয়ে একটি দোকান থেকে দুধ কিনতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঐ দুধ খেলে ওর সঙ্গে সঙ্গে কলেরা হত। তাই ধ্যানযোগে আমি এক সাধুকে নির্দেশ দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে পয়সা কটি কেড়ে নিয়ে ওর প্রাণ বাঁচাই।

বিজয়কৃষ্ণ কখনো তাঁর যোগবিভূতি দেখাতে চাইতেন না। সেদিন নিতান্ত প্রয়োজনবোধে শিষ্যের মংগলের জন্য ব্যাপ্তিরূপ যোগ শক্তিবলে এক জায়গা হতে সুদূরের একটি ঘটনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সকলকে অবাক করে দেন।

তবে তিনি তা না চাইলেও বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটত তাঁর যোগসিদ্ধ জীবনে। অনেক বিভূতি তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনা হতেই দেখা দিত।

একবার আশ্রমের উঠোনে আমগাছ হতে মধু ঝরতে থাকে। সকলে আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোস্বামী-ঠাকুর বললেন, শুধু আমগাছ কেন. যে সব গাছের তলায় বহুদিন ধরে যাগযজ্ঞ, সাধন ভজন, ও জপ তপ করা হয় অথবা সে গব গাছের নিচে সিদ্ধ সাধকদের আসন থাকে সেই সব গাছ মধুময় হয়ে যায় এবং সেই র্সব গাছ থেকে মধুক্ষরণ হতে থাকে।

ঠাকুর আরো বললেন, খুব ভক্তির সঙ্গে পুজো করলে জলও মধু হয়ে যায়। একবার শান্তিপুরে গঙ্গাজলে মধু-পোকা দেখে সেই জল খেয়ে দেখি তাতে মিষ্টি মধুর গন্ধ। বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ থেকেও মধু ঝরতে দেখেছি। পরে অনুসন্ধান করে জেনেছি, সেই সব গাছের তলায় সিদ্ধ সাধকপুরুষদের আসন ছিল।

গোস্বামী ঠাকুরের কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় শিষ্যরা সকলে। একবার গোস্বামী ঠাকুরের নিজের গা হতেই মধু ঝরতে থাকে। কোন সাধকের গা হতে মধু ঝরে তা কেউ কখনো দেখেনি, বা শোনেনি। অনেকে বলেন, একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভু গা হতে ঘামের মত মধু ঝরত।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারি নিজের চোখে ঘটনাটি দেখে তা লিখে রেখে গেছেন, তাঁর রচিত শ্রীশ্রীসদগুরু প্রসঙ্গ বইখানিতে।

লিখেছেন, কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সর্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখে আসছি। বেগে বাতাস করতে তা শুকোয় না দেখে সময়ে সময়ে সন্দেহ জন্মেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজে গামছা

নিয়ে নিজেই গা মুছে থাকেন, পিঠে হাত চলে না বলে আমি পিঠ মুছে দিই। প্রচুর পরিমাণে তেল মেখে স্নান করলে যেমন দেখায়, ঠকুরকে কয়েকদিন ধরে সেই রকম দেখেছি। মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বার হয়—কোথাও শুনিনি, কোন পুস্তকেও পড়িনি। ঠাকুরের এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখছি।

স্নিগ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্বদাই ঘরটি আমোদিত হয়ে রয়েছে। বোল্‌তা, প্রজাপতি, মৌমাছি ঘরে ঢুকে ঠাকুরের মাথার উপরে দু-চার পাক ঘুরে বার হয়ে যাচ্ছে। হাত পাখার ঝাপটা হাওয়াতে বসতে পাচ্ছে না। অসংখ্য পিঁপড়েও ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে এসে পড়ছে দেখলেই তা ঝেড়ে সরিয়ে দিচ্ছি।

ঠাকুর মাথা নত করে চোখ মুজে বসে আছেন। তৈল-ধারার মত অবিরল অশ্রুবর্ষণে ঠাকুরের বক্ষস্থল ভেসে কৌপীন বহির্বসণ ভিজে যাচ্ছে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঠাকুরের মাথা শ্বাস-প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝুঁকে বাঁ দিকের হাঁটুর উপরে এসে পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় আট-দশ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠে বসেন। বারবার এইভাবে পড়ে-উঠে বিকাল চারটা পর্যন্ত কাটিয়ে দেন। এই সময় ঠাকুরের দেহে যে সব অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তা আমার ব্যক্ত করবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম কৃপাতে দর্শন করে ধন্য হয়ে যাচ্ছি।

একদিন কুলদানন্দ আর একটি অলৌকিক ঘটনা দেখেন। ঘটনাটি সত্যিই বড় অদ্ভুত এবং ভয়ংকর। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কুলদানন্দ তখন গোস্বামী ঠাকুরের ঘরেই শুতেন। সেদিন শেষ রাত্রিতে সহসা দেখলেন, একটি কালো সাপ ঠাকুরের বাম অঙ্গ বেয়ে মাথায় একটু ফণা বিস্তার করে রইল। পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বেয়ে আবার নেমে গেল।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে বললেন, ইনি আসনের জাত সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন; জটা বেয়ে মাথায় উঠে কপালে উপরে কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান।

ঠাকুর আরো বললেন, সরুনালে এই প্রাণায়াম যখন স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে তখন তাতে যে একটি সুন্দর শব্দ হয়, সাপ সেই শব্দ শুনতে ভালবাসে। বাড়ীর যেখানেই সাপ থাক না কেন, দূর হতে তা শুনতে পেয়ে তাতে আকৃষ্ট হয়। সাপ এসে ঐ সুর ধরতে গিয়ে গায়ে মাথায় ঘাড়ে উঠে পড়ে। নাকের পাশে কপালের উপর ফণা বিস্তার করে স্থির হয়ে ঐ সুর শুনতে থাকে। কোন অনিষ্ট করে না। সময়ে সময়ে নিজের শিস্‌ও তাতে মিশিয়ে দিয়ে বড় আনন্দ পায়। মহাযোগী মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় এইজন্যই সাপ থাকে। সাধন ঠিক মত চললে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে। এরা ছো মারে না; বরং এদের থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। প্রাণায়াম হয়ে গেলেই চলে যায়।

আর একটি অলৌকিক ঘটনা প্রায়ই ঠাকুরের জীবনে দেখা যেত। তা হচ্ছে অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার। হরিণামে মাতোয়ারা হয়ে যখনি উদ্দণ্ড নৃত্য করতেন, তখনি অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি ভাবের বিকাশ প্রকটিত হয়ে উঠত তাঁর দেহে। যে সাত্ত্বিক ভাববিকার কৃষ্ণের জন্য রাধার অঙ্গে জাগত, যে ভাব চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহে জাগত, সেই স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ প্রায়ই ঘটত তাঁর ভক্তি সিদ্ধ দেহে।

মুখে শুধু হরিণাম। অন্তরে সদাই হরির ধ্যান। জ্ঞান নয়, তর্ক নয়, কেবল চাই পরাভক্তি। অকুণ্ঠ ও নিঃশেষিত আত্মসমর্পণ। কলিকালে তারকব্রহ্ম হরিণামই হচ্ছে জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়। তাই শত খোল করতাল সহযোগে ও অজস্র ভক্তের মিলিত কণ্ঠে এই নামই

পথে পথে প্রচার করে যেতেন ঠাকুর। মোহমুগ্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে শুনিয়ে যেতেন মুক্তির মহামন্ত্র।

নাম নয়, সত্যিই যেন মুক্তির মন্ত্র। এই নাম জপ করতে হবে মনে প্রাণে। এই নাম জপ করলে আত্মার মধ্যে পাবে মহাশক্তি অন্তরে পাবে পরমানন্দ। আমাদের হরি হচ্ছে পরমানন্দময় এক মহাসত্তা। আনন্দই ব্রহ্ম। উপনিষদে বলেছে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—এ সব কোন কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্ম আছে আনন্দের মধ্যে। আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ আনন্দ হতেই সব কিছুর জন্ম; আনন্দের দ্বারাই তারা বেঁচে থাকে, আবার আনন্দেতেই তারা লীন হয়ে যায় কালক্রমে। রসই অমৃত। আমাদের হরি তাই রসের নাগর। পরিপূর্ণ রসের মূর্ত প্রতীক। তাহলে বেদান্ত ও বৈষ্ণবে আসলে তফাৎ কোথায়? উপনিষদে যা দিয়ে শেষ করেছে, বৈষ্ণবরাই তাই দিয়েই করেছে শুরু। অবশ্য বৈষ্ণবদের শুরু বা শেষ বলে কিছুই নাই। নামই হচ্ছে সব।

হরিণাম কর। হরিণামের মধ্যে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দ পেলে কোন ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতভাব থাকবে না। তখন রাধাকৃষ্ণ সব একাকার হয়ে যাবে। বেদান্তের অদ্বৈত তখন সেই আনন্দের রসে গলে মিশে কত সহজে তোমার অন্তরকে ভাসিয়ে দেবে।

প্রেমভক্তির বিকাশটি বড় চমৎকার। একবার অন্তরে তার বন্যা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেই তা আর অন্তরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না কিছুতেই। আপনা হতেই অন্তর উপচিয়ে প্রাণের দু-কূল ছাপিয়ে চারিদিকের চেতন-অচেতন সব কিছুকে ভাসিয়ে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়বে সে বন্যা দূর দূরান্তে। যাঁরাই কোনরকমে একবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের কাছে এসেছে তারাই তাঁর এই প্রেমভক্তির রস প্রবাহে সিক্ত না হয়ে পারেন নি।

সাধন জীবন পাকাপাকিভাবে শুরু হবার পর হতে একবারও জন্মভূমি শান্তিপুরে আসেন নি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। অবশ্য বাড়ীর প্রতি কোন বিশেষ টান নাই তাঁর। স্ত্রী যোগমায়া দেবী তাঁরই নির্দেশে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে অবলম্বন করে সাধন ভজন করে চলেছেন। তিনিও খুব ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তাঁরও অন্তরটি ভক্তিরসে সিদ্ধ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে।

শান্তিপুরের প্রধান আকর্ষণ শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরকে আজো ভোলেন নি প্রভুপাদ। এ স্মৃতি কিন্তু কখনো বোঝা হয়ে ভার হয়ে চেপে বসে নি তাঁর মনে। বরং এ স্মৃতি ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে সহজ হয়ে মিশে আছে তাঁর জীবনে। অন্তরের অন্তঃস্থলে থেকে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে।

শ্যামসুন্দরকে বিগ্রহ মূর্তির মধ্যে না দেখে সারা বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। শ্যামসুন্দরের ঘনশ্যাম মূর্তটিকে তিনি পরিব্যাপ্ত ও বিরাট আকারে দেখেছেন আকাশের নীলিমায়, বৃক্ষপত্রের শ্যামলিমায় নবঘন মেঘের রক্তাভ মেদুরতায়। শ্যামসুন্দরের মধুর হাসিটিকে তিনি দেখেন সূর্যের অন্তহীন উজ্জ্বলতায়, চন্দ্রের স্নিগ্ধ মদিরতায়।

শিষ্যদের নিয়ে একবার শান্তিপুরে গেলেন প্রভুপাদ। শান্তিপুরের কাছে অদ্বৈতপ্রভুর ভজন স্থান হচ্ছে বাবলা। ছেলেবেলা হতেই এই জায়গাটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও আসক্ত প্রভুপাদ। শান্তিপুরে যখনি বাইরে থেকে এসেছেন, একবার এ জায়গাটি অবশ্যই ঘুরে গেছেন।

জায়গাটির অলৌকিক মহাত্ম্যের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই। ঠাকুর বললেন, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে

থাকলেই টের পাওয়া যাবে। এখানকার আকাশে বাতাসে অলৌকিক নাম সংকীর্তনের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ছেলেবেলায় প্রায়ই বাবলায় ছুটে আসতাম আর এই সংকীর্তন শুনতাম। শুনে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতাম। কিন্তু কোথাও কোন নামের দল বা লোক দেখতে পেতাম না। এই কীর্তন কোন সাধারণ কীর্তন নয়। এ হচ্ছে মহাপ্রভুর সংকীর্তন ধ্বনি। তোমরা খুব ভাগ্যবান যে তা শুনতে পেয়েছ।

সেদিনকার অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথাটি কুলদানন্দজী লিখে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, আমরা সবাই স্থিরভাবে বসে নাম করতে লাগলাম। ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে একটি মহাসংকীর্তন ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে মনে হতে লাগল। একবার ভাবলাম, ঠাকুর আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন জেনে আশপাশের লোক সংকীর্তনের দল নিয়ে এখানে আসছে। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে নাম করতে লাগলাম। সংকীর্তনের ধ্বনিতে আমাদের প্রাণ নেচে উঠল।

দুই এক মিনিট অন্তর সংকীর্তন এসে পড়েছে, স্পষ্ট এরকম মনে হওয়াতে আমরা আসন ছেড়ে সংকীর্তনে যোগ দেবার জন্য মন্দিরের বাইরে গেলাম এবং ঠাকুরকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা। ঠাকুরকে ছেড়ে আমরা যতই কীর্তনে যোগ দেবার জন্য চলতে লাগলাম ততই কীর্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল! অবশেষে দুই-এক মিনিটের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

আমরা তখন ঠাকুরের কাছে ফিরে এলাম।

জায়গাটির মাহাত্ম্যের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে এবার আর কারো কোন সংশয় রইল না।

আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা পাওয়া যায় কুলদানন্দের দিনলিপিতে।

একবার ঠাকুর তাঁর নিজ বাড়ী থেকে বহু লোকজন ও চোদ্দ-মাদল নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে বাবলার দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর একটি গৃহপালিত কুকুর ছিল। নাম কেলো। সবাই বলত কেলো সাধারণ কুকুর নয়। সে জীবনে কখনো মাছ মাংস খায়নি। কেলো রোজ একবার করে শ্যামসুন্দরের মন্দির পরিক্রমা করত। খোল-করতালের শব্দ শুনতে পেলেই সেখানে ছুটে গিয়ে একমনে হরিণাম সংকীর্তন শুনত। কখনো ওর 'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত। ঠাকুর কেলোকে "ভক্তরাজ" বলে ডাকতেন। তিনি বলতেন কেলো নাকি মহাপুরুষ। কোন বিশেষ কার্য-সাধনের জন্য সংসারে এসেছে।

সেবার সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেলোও ঠাকুরের পিছু পিছু যেতে লাগল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হবার সময় যাত্রীদের কয়েকজন কেলেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কেলো তখন নিরুপায় হয়ে ঠাকুরের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। ঠাকুর তখন কেলোর গমনে বাধা দিতে নিষেধ করলেন তাদের।

কিছুকাল পরেই হরি-সংকীর্তন মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করল। তখন ভাবাবেশে মাতোয়ারা হয়ে সবাই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। চারিদিকে সেই অপ্রাকৃত মহাসংকীর্তনের মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। কেউ কেউ অদূরে সংকীর্তন আসছে ভেবে তাতে যোগ দেবার জন্য এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু যতই তারা মন্দির ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল ততই সেই সংকীর্তনের ধ্বনি মিলিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে আর শুনতে পেল না।

এই সময় ভক্তরাজ কেলো কিছু দূরে পঞ্চবটির কাছে একটি

জায়গায় দৌড়ে গিয়ে সজোরে সে জায়গায় মাটি আঁচড়াতে লাগল। পরক্ষণেই ঠাকুরের কাছে এসে চীৎকার করতে করতে তাঁর কাপড়ের আঁচল কামড়ে ধরে তাঁকে টানতে লাগল।

ক্রমাগত এইরকম করতে থাকায় ঠাকুর কেলোর সঙ্গে সেই জায়গায় গিয়ে জায়গাটি খোঁড়বার জন্য আদেশ দিলেন। কাছাকাছি চাষীদেব বাড়ী থেতে দুখানি কোদাল এন জায়গাটি খোঁড়া হলো। কিছুদূর খুঁড়ে কিছু না পাওয়ায় সকলে থামল। তখন কেলো ঠাকুরের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে নিজেই নখ দিয়ে সেই জায়গাটির মাটি আঁচড়াতে লাগল। তা দেখে ঠাকুর আরো কিছুদূর খুঁড়তে বললেন।

এইবার বেশ কিছুটা খুঁড়তেই একটি পিতলের হাঁড়ি বার হলো। তার মধ্যে পাওয়া গেল শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নাম আঁকা একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা, একটি মাটির কড়োয়া ও একটি বাক্সর ভিতর হস্তলিখিত একটি ছিন্ন পুঁথি। সকলেই তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ঠাকুর সেই খড়ম দুটি মাথায় ধারণ করে নৃত্য কত্তে লাগলেন।

আবার সংকীর্তন শুরু হলো। ভাবাবেশে ঠাকুর অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। বাহ্যজ্ঞান লাভ করে দেখলেন ভক্তরাজ কেলোও অচৈতন্য। ঠাকুর কানে নাম শোনাতে লাগলেন। কেলো তখন উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যে কাজের জন্য তুমি এসেছিলে, সে কাজ আজ সম্পন্ন হলো। এখন তুমি গঙ্গালাভ কর।

এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন হওয়ার পর বাড়ী ফেরা হলো। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে সকলে দেখল একহাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসছে। ঠাকুর নিজের হাতে গঙ্গাতীরে বালি খুঁড়ে ভক্তরাজ কেলোর দেহ সমাধিস্থ করলেন।

এই সময় একবার কলকাতায় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। একে একে পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ল। প্রকৃত পক্ষে তাঁর সাধন জীবনের শুরু হয় মহর্ষির কাছে। সেইদিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ল তাঁর যেদিন তিনি কোন এক বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য নিয়ে গিয়ে মহর্ষির উপদেশবাণী শোনেন। প্রথম যৌবনে সেই উপদেশবাণী শুনেই তাঁর ব্রহ্মলাভের বাসনা জাগে হৃদয়ে।

প্রভুপাদ গিয়ে দেখলেন, মহর্ষি ঘরের মধ্যে একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন। ডানদিকের একটি চেয়ারে ররেছেন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়। মহর্ষিকে নমস্কার করে তাঁর চরণধূলি মাথায় ধারণ করে কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল সহসা। তিনি বুকের উপর হাত রেখে আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করতে লাগলেন, নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ; গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বলতে বলতে তাঁর মাথাটি কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীর তাঁর শিউরে উঠল। গাল বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। ঠাকুরও তখন ভাবাবিষ্ট হয়ে মহর্ষির বাঁ দিকের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই চুপ করে রইলেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যরাও তখন মহর্ষিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে দুপাশের বেঞ্চের উপর বসে পড়লেন। মহর্ষি তখন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বললেন, এঁদের দেখে আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, এঁরা কে?

শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, এঁরা সকলে গোঁসাই এর শিষ্য।

মহর্ষি বললেন, মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু পায়,

তখন শুধু নিজে না খেয়ে অন্যকেও তা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যা ভোগ করেছেন শিষ্যদেরও তাই দিচ্ছেন। এতে ওঁর কোন স্বার্থই নাই। শিষ্যদের কল্যাণই ওঁর একমাত্র আকাংখা। ইনিই ধন্য; শিষ্যদের যথার্থ সন্তাপহারক। এঁকে দেখে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগে।

মহর্ষি আবার বলতে লাগলেন, ভগবানকে যেমনভাবে পেতে চাই, তেমন ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া করে দেখা দিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে যান। যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের দেখা না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ছটফট করে। কিভাবে যে সময় কাটাই তিনিই জানেন। তিনি দয়া করে দেখা না দিলে আর কি করব। জ্ঞানের দ্বারা ত তাঁকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানত একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। তা ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়াতে হয়। পুরুষকার অর্থশূণ্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করে তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছি।

এই বলে মহর্ষি ছোট ছেলের মত অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলতে লাগলেন।

একটু পরে চোখ মুছে মহর্ষি ঠাকুরকে বললেন, যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, আগে হতেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা, সাধন—এই চারটি একসঙ্গে না থাকলে প্রকৃত সত্য বস্তু বা ষোলআনা ধর্মলাভ হয় না। তোমাতে এই চারটি উপযুক্তরূপে রয়েছে। অদ্বৈতপ্রভুর বিশুদ্ধ বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেছ, তাঁর কৃপায়

প্রকৃত সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ পেয়েছ। তারপর মনুষ্য চেষ্টায় সাধন ভজন যতটা সম্ভব তাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করেছ। সর্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমি ধন্য। তুমি যাই কর, যেভাবে চল ভগবান তাই অতি সুন্দর দেখছেন।

ঠাকুর বললেন, আপনিই ত আমায় হাতে ধরে মানুষ করেছেন। আমার সবই আপনা হতে। আপনিই আমার গুরু।

মহর্ষি হেসে বললেন, তা ঠিকই বলেছ, গুরু ত বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশয়ের মত। ক খ শিখতে হলে প্রথমে যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের কাছে শিখতে হয়; পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমশায়েরও গুরু হবার উপযুক্ত হয়। তোমার বেলাতেও ঠিক সেইরূপ হচ্ছে।

এইভাবে মহর্ষি নানাভাবে ঠাকুরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন ঠাকুর একসময় উঠে মহর্ষির চরণ দুটি আবার মাথায় ধারণ করে বললেন, আমি আপনার ছেলের মত, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

মহর্ষি প্রতি নমস্কার করে বললেন, আমি তোমায় আশীর্বাদ করতে পারি না। আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, তোমার জয় হোক।

প্রভুপাদর শিষ্যরা সকলে মহর্ষিকে প্রণাম করলে মহর্ষি বললেন. তোমাদের মঙ্গল হবে। গোঁসাইকে তোমরা কখনো ছেড়ো না। ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।

এবার গুরুদেব পরমহংসজীর নির্দেশে শান্তিপুর হতে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন প্রভুপাদ। গুরুদেব একদিন তাঁকে

আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ব্রজভূমিতে গিয়ে কিছুদিন সাধন ভজন কর। বড় পবিত্র ও জাগ্রত সে স্থান। সেখানে এ সময়ে থাকলে রাধাকৃষ্ণের বহু অপ্রাকৃত লীলা তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

এই সেই ব্রজধাম রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা-মাধুর্যে মধুর হয়ে আছে যার প্রতিটি রজকণা। এই ব্রজধামেই পরমাত্মারূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মাস্বরূপিনী রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রাণ মাতানো আবেশ ছড়ানো আছে অভিসারিকা শ্রীরাধার চরণ লাঞ্ছিত মৃত্তিকায়। এখানকার ফুলে ফুলে আজো মঞ্জরিত হয়ে আছে রাধার অন্তর-কামনা। এখানকার কুঞ্জে কুঞ্জে আজো গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার অশান্ত উচ্ছাস। কৃষ্ণবিরহিনী রাধার অবিরল অশ্রুধারা বয়ে চলেছে আজো যমুনার জলে।

ব্রজধাম বৃন্দাবনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতণ্ময়তা আরো বেড়ে যায় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের। যেদিকেই তাকান শুধু দেখেন রাধা আর কৃষ্ণ। এখানকার সূর্যকিরণে দেখেন শ্রীরাধার সোনার অঙ্গের বর্ণবিভা আর এখানকার নবঘন মেঘের বিস্তারে ও স্নিগ্ধ বনচ্ছায়ায় তিনি দেখেন শ্রীকৃষ্ণের শ্যামকান্তির আভা। দেখেন আর কাঁদেন। কাঁদেন আর দেখেন। দুচোখ চেয়ে ঝরে অশ্রুর ধারা। চৈতন্যমহাপ্রভুর পর আর কোন এতবড় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বৃন্দাবনে আসেন নি। চৈতন্যযুগের পর এমন প্রেমভক্তির বন্যায় আর কখনো প্লাবিত হয়নি এই ব্রজভূমি।

একদিন বৃন্দাবনের রাধাবাগে ভাবতন্ময় হয়ে বসেছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবীয় সাধনরীতি

ও চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতি—এই দুই রীতির কোন-টিরই অনুসরণ করনেনি তিনি। প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবসাধকেরা ছিলেন লীলাশুক। অর্থাৎ তাঁরা সখী বা মঞ্জরীরূপে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হতে বৈষ্ণব সাধকেরা চৈতন্যদেবকে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত অবতাররূপে ভজনা করতেন। প্রভুপাদ কিন্তু কিন্তু এই দুইভাবেই ভজনা করতেন। সেদিন রাধারাগে চৈতন্য মহাপ্রভুর ধ্যান করতেই মহাপ্রভু এক দিব্যজ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হন তাঁর সামনে।

অনলপ্রভ সেই দিব্যজ্যোতির তেজ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন প্রভুপাদ। মুখে শুধু উচ্চারণ করলেন, জয় গৌর, জয় নিতাই।

বৃন্দাবনের মহিমা অপার। এ মহিমা একমাত্র ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষেরাই বুঝতে পারেন। প্রকৃত অর্থে বৃন্দাবন তিনটি। প্রথমতঃ নিত্যবৃন্দাবন; এই নিত্য বৃন্দাবনে পরম পুরুষ কৃষ্ণ একাকী বিরাজ করেন। দ্বিতীয়তঃ লীলা বৃন্দাবন; এখানে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে যুগলে বিরাজ করে নিত্য লীলা করেন। এই লীলা বৃন্দাবন সাধারণ মানুষে দেখতে পায় না। এই অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করবার জন্য বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা বৃন্দাবনের বনে বনে বৃক্ষরূপ ধারণ করে অবস্থান করেন। এই সব বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সঙ্গে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

তৃতীয় বৃন্দাবন হচ্ছে বৃন্দাবনধাম, সারাধণ ভৌগলিক অর্থে যাকে আমরা বৃন্দাবন বলি। এই বৃন্দাবনধামেই সাধারণ ভক্ত ও দর্শনার্থীরা আসে তীর্থ পর্যটনে।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের নাম সাধনা ও দেহত্যাগের আশ্চর্য ফল গোস্বামীজী শিষ্যদের একদিন দেখান। একদিন তিনি

শিষ্যদের নিয়ে যমুনার তীরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি মৃতদেহের অস্থি পাওয়া গেল। অস্থিটি তুলে নিয়ে প্রভুপাদ দেখালেন, এই অস্থির মধ্যে হরেকৃষ্ণ নাম আঁকা রয়েছে। অর্থাৎ অনবরত বাচিক ও মানসিক নাম জপ করার ফলে সাধকদের অস্থিমজ্জায় ঐ নাম আপনা হতে আঁকা হয়ে যায়।

ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য প্রায়ই প্রচার করতেন প্রভুপাদ। কিন্তু একদিন তাঁর এক কলকাতার শিষ্য বললেন, প্রভু, এই স্থানের মাহাত্ম্যের কথা অনেক কানে শুনেছি। কিন্তু ত চোখে দেখতে বা অনুভব করতে পেলাম না।

ভদ্রলোক কলকাতায় থাকেন। গুরুদেব গোস্বামী ঠাকুরকে দেখবার মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে আসেন আর চলে যান। গুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ভক্তি অবিচল থাকা সত্ত্বেও তাঁর বৃন্দাবনের মহিমার কথাটি মানতে পারলেন না তিনি।

তাঁর শুনে গোস্বামী ঠাকুর বললেন, এ আপনি কী বলছেন ? এ হচ্ছে অপ্রাকৃত ধাম। এখানকার অপ্রাকৃত লীলারস সাধারণ মানুষ কখনো আস্বাদন করতে পায় না অথবা সে লীলা স্থুল চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্রজধামের মহিমা নিশ্চয়ই আছে। একবার মন প্রাণ দিয়ে হরিনাম করতে করতে এর পবিত্র মাটিতে লুঠিয়ে পড়ুন দেখি।

শিষ্যটি গুরুদেবের একথা শুনে তা যাচাই করবার জন্য সত্যি সত্যিই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

সেই মাটি গায়ে লাগামাত্র এক অপূর্ব ভাবাবেশে সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়ে এল তাঁর। তাঁর সমগ্র দেহটি কেঁপে উঠল। দু'চোখ চেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল অবিরল। মুহূর্তের মধ্যে এই আশ্চর্য ভাবান্তর কি করে হলো তা তিনি কিছুই

বুঝতে পারলেন না। শুধু পাগলের মত বারবার সেই জায়গায় ধূলো গায়ে মাথায় মাখতে লাগলেন।

অন্যান্য শিষ্যরা এসে তাঁকে ধরে উঠিয়ে বসিয়ে শান্ত করলেন তাঁকে কোন রকমে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি। তিনি বুঝলেন তাঁর স্থূল বুদ্ধি নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে তর্ক করা উচিত হয়নি।

গোস্বামীজীর চরণ ধরে বারবার ক্ষমা চাইলেন তিনি তখন। বৃন্দাবনধামের অপার মহিমা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না তাঁর মনে।

এই সময় প্রভুপাদ গোস্বামী ঠাকুরের পত্নী যোগমায়া দেবী বৃন্দাবনে এসে কিছুকাল স্বামী সঙ্গে বাস করেন। প্রভুপাদ পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে গৃহীর মত বাস করছেন জেনে বৃন্দাবনের অনেক সাধক তাঁকে উপহাস করতে থাকেন। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না প্রভুপাদ।

কারণ এ বিষয়ে তাঁর গুরুদেব পরমহংসজী অনেক আগেই অনুমতি দিয়েছেন। শক্তিমান সাধক গৃহে থেকেও ধর্ম সাধনা করতে পারেন। এই ভাবেই তিনি গৃহীযোগীরূপে আদর্শ সৃষ্টি করতে পারবেন অজস্র মোহবদ্ধ সংসারীর মনে। কলিকালে মানুষকে ঘরছাড়া করে সন্ন্যাসী বানিয়ে লাভ নাই। সংসার জীবনের মধ্যেই ধর্ম, নীতি ও শুচিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাত্ত্বিক ত্যাগে দীক্ষিত করতে হবে স্বার্থান্ধ মানুষকে।

প্রভুপাদ যখন প্রথম আসেন বৃন্দাবনে তখন একদল সাধু তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের খ্যাতির কাছে নিজেরা ম্লান হয়ে যাবে,—এই ছিল তাদের ভয়। পরে স্বপ্নযোগে তাঁর মহিমার পরিচয় পেয়ে চুপ করে যায়।

এবার বৃন্দাবনধামের মোহান্ত ব্রহ্মজ্ঞ মহাসাধক রামদাস

কাঠিয়াবাবা নিজে প্রভুপাদ গোস্বামী ঠাকুরের মহিমার কথা বুঝিয়ে দিলেন সকলকে।

যোগমায়া সহসা পরলোকে গমন করলেন। তাঁর জীবনের পরম সাধটি পূরণ হলো এতদিনে। তাঁর বড় সাধ ছিল রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামাধুর্যে পবিত্র হয়ে আছে যে ব্রজভূমি সেই ব্রজভূমিতেই তিনি মরদেহ ত্যাগ করবেন। সেই পবিত্র ভূমিতেই থাকবে তাঁর দেহাস্থি।

স্ত্রীর মৃত্যুতে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না প্রভুপাদ। জপ, তপ, সাধন, ভজন নিয়মিত যেমন করেন তেমনিই করে যেতে লাগলেন। জীবন-মৃত্যু সমান তাঁর কাছে তখন। জন্ম মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, আনন্দ বেদনা—সমস্ত দ্বৈত চেতনা ও ভেদ জ্ঞানের উর্ধ্ব উঠে গেছে তাঁর মন।

গীতায় সাংখ্যযোগে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, যিনি সকল মনোগত কামনাকে ত্যাগ করেছেন, যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, যিনি দুঃখে কখনো বিচলিত হন না, যাঁর সুখলাভের কোন আকাংখা নাই, ভয় ক্রোধ, আসক্তি কিছুই নাই যাঁর মনে, সেই ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সন্ন্যাসী বলা হয়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মহযোগীতে পরিণত হয়েছেন।

আত্মা যাঁর সব সময়ই নিত্যশুদ্ধ, চিত্ত যাঁর নির্মল তাঁর কাছে দেহগত শুচিতা অশুচিতার কোন মুল্য নাই, কোন অর্থ নাই। একদিন শৌচক্রিয়া করতে করতে প্রভুপাদ শুনলেন, পথে হরিনাম সংকীর্তদের দল আসছে। সঙ্গে সঙ্গে শৌচকার্য ফেলে রেখে অবোধ শিশুর মত আত্মহারা হয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন পথে। পরম আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন হরিনাম করতে করতে।

সমস্ত কুণ্ঠা ও মান অভিমান ত্যাগ করে মনে প্রাণে দীন

হীন কাঙাল না সাজলে কখনো প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।' প্রকৃত বৈষ্ণবকে হতে হবে কুসুমের মত সুকোমল, তৃণের মত সুনীচ বা নম্রনত। এই দীন হীন ভাবটি অন্তরে সব সময়ই ফুটে থাকত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজের মধ্যে তার বিকাশ ঘটত।

একবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠানের সময় তাঁবু খাটিয়ে খাটিয়ে বৈষ্ণব সাধুদের সঙ্গে বাস করছেন প্রভুপাদ। সেবার তিনি সব শিষ্যদের উপর বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে নিজে ভিক্ষায় বার হতেন। তিনি বলতেন, আমার কাজ হবে ভিক্ষার দ্বারা তোমাদের ভরণ পোষণ করা।

সঙ্গে কোন মজুত জিনিষপত্র বা জমানো টাকা নাই। প্রকৃত সাধক বা সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন বস্তুর সঞ্চয় নিষিদ্ধ। কিন্তু মেলায় সাধুমণ্ডলীর খাওয়া দাওয়ার জন্য আটা চিনি ঘি প্রভৃতি দরকার এবং তার জন্য দৈনিক শ' শ' টাকা খরচ। অথচ প্রভুপাদ একবার ভিক্ষায় বার হলেই ভারে ভারে সব জিনিষ কোথা হতে এসে পড়ে।
ঋদ্ধি ও সিদ্ধিযুক্ত সাধকের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

সেই বিরাট সর্বভারতীয় কুম্ভমেলায় অজস্র অতিথিকে শুধু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাতেন না প্রভুপাদ, তার উপর দানও করতেন প্রচুর।

বিভিন্ন ধর্মমতকে যিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করতেন, বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির মধ্যে যিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন, কোন একটি বিশেষ বিধি বা রীতিকে বাঁধাধরাভাবে মেনে চলা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। প্রভুপাদও তাই পারতেন না। তিনি বৈষ্ণব হয়েও রুদ্রাক্ষ মালা পরতেন গলায় এবং গৈরিক বসন ধারণ করতেন। এজন্য অনেকে সমালোচনা করতেন তাঁর। কিন্তু নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করতেন সব কিছু।

তাঁবুর ঠিক মাঝখানে একটি প্রশস্ত পূজাবেদী ছিল। সেই বেদীতে নিতাই গৌরের বিগ্রহমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতেন প্রভুপাদ। অনেক বৈষ্ণব সাধু তা পছন্দ করতেন না। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসক।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র সর্বত্যাগী সাধক বৈষ্ণব সন্নাসীর প্রতীক হিসাবেই দেখতেন না প্রভুপাদ, তিনি তাঁকে কৃষ্ণও রাধা-ভাবের মিলিত অবতাররূপে পূজো করতেন। সত্যিই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্যে যেন রাধাকৃষ্ণ দুইই আছেন। তাঁকে দর্শন করা মানে যেন রাধাকৃষ্ণকেই যুগলে দর্শন করা। রাধার মতই সোনার অঙ্গ, মন প্রাণ রাধার মতই কৃষ্ণে সমর্পিত। রাধাভাবের দিব্যদ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর গৌরকান্তি হতে। কৃষ্ণপ্রেমের সুরভিতে আমোদিত হয়ে আছে তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকেও সমান মর্যাদা দিতেন প্রভুপাদ। কারণ নিত্যানন্দ ছিলেন সার্থক গৃহী বৈষ্ণবের আদর্শ প্রতীক। গৃহী বৈষ্ণবের আদর্শ গুণ গুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর এই সম্ভাবনা ছিল বলেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁকে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে বলেন। সংসারের মধ্যে থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতেন তিনি।

বৃন্দাবনে থাকাকালে হরিদাস বসু নামে এক ভক্ত কথায় কথায় প্রেমভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ হনুমানের নাম করেন। তিনি বললেন, আহা হনুমানের কি অপূর্ব ভক্তি। বুক চিরে ইষ্টদেবতা রামসীতা দেখিয়েছিলেন। প্রভুপাদ তখন মৃদুহেসে বললেন, সে কি গো, বুক কি আবার চিরতে হয়।

গুরুদেবের কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলেন না হরিদাসবাবু। তাই ভাবতে লাগলেন নীরবে। সহসা দেখলেন, প্রভুপাদের আসনে 'হরেকৃষ্ণ' এই শব্দটি আপনা হতে আঁকা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা গেল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন হরিদাসবাবু। প্রেমভক্তির এখন সার্থক জাজ্জ্বল্যমান রূপ তাঁর সামনে মূর্ত ও জীবন্ত থাকতে তিনি তার মর্ম বুঝতে না পেরে হনুমানের দৃষ্টান্ত খুঁজতে গিয়েছিলেন, এজন্য লজ্জা অনুভব করলেন মনে মনে। লজ্জিত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে।

দিন যত যেতে থাকে সাধনার নিবিড়তা ততই বাড়তে থাকে। এক একবার সারা দিনের মধ্যেও সাধন কুটিরের দরজা খোলেন না। শিষ্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে বাইরে। আর ওদিকে ধ্যানে বিভোর হয়ে প্রভুপাদ কাটিয়ে দেন সারাটিদিন।

একদিন গভীর ধ্যানের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের আভাস পান প্রভুপাদ। তিনি বুঝতে পারেন দেশের ধর্মজীবনের ক্রমশ: অবনতি ঘটবে। তারপর অবশেষে চরম অবনতির পর আবার ঘটবে জাতির পনরুজ্জীবন। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি প্রভুপাদ বিজয়-কৃষ্ণের বাণী আজ বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত।

এবার পুরীধামে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে মন। চৈতন্য মহাপ্রভুর মত তাঁর জীবনের অন্তিম কালটি নীলাচলেই অতিবাহিত করবেন প্রভুপাদ। ব্রজধামে তাঁর যে সাধনা চরম উন্নতিলাভ করছে এবার পুরীধামে সেই সাধনা লাভ করবে এক পরম পরিণতি।

কলকাতার শিষ্যরা অনেকদিন হতেই প্রভুপাদকে একবার কাছে পেতে চাইছিল। পুরীধামে একবার গেলে আর আসা হবে না। তাই সেখানে যাবার আগে একবার কলকাতা যাবার মনস্থ করলেন। শিষ্যদের পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তাদের অন্তরের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

মানুষের আত্মা স্বভাবতঃই আজ অমর। দীর্ঘ সাধনার দ্বারা অমিত শক্তি লাভ করে এই আত্মা। তবু আশ্চর্য! এই

আত্মাকে যে দেহ ধারণ করে রাখে সেই দেহ কিন্তু জন্ম মৃত্যুর অধীন। পরিধেয় বসনের মত ব্যবহৃত কোন আধারপাত্রের মত এ দেহ কালক্রমে জীর্ণতা প্রাপ্ত হবেই। প্রভুপাদ এবার অনুভব করলেন, তাঁর বলিষ্ঠ দেহটি ক্রমশই জীর্ণ হয়ে আসছে। ক্রমশঃ বিলীন হয়ে আসছে তার শক্তি। ক্রমবিলীয়মান এই শক্তি আর বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না তাঁর আত্মাকে। সুতরাং এ দেহ এবার ত্যাগ করা উচিত।

বৃন্দাবন থেকে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় শিষ্যের অভাব নাই। তবু তাঁর সেবা করবার জন্য কয়েকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। বৃন্দাবনের অজস্র ভক্ত ও শিষ্য বিষাদে আকুল হয়ে পড়ল। সকলের চোখেই জল এল। প্রভুপাদ তখন সকলকে শান্ত করে বললেন, বিষণ্ণ হয়ো না তোমরা; প্রসন্ন মনে বিদায় দাও। তোমরা কায়মনোবাক্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো, আমি যেন আমার প্রাণের নীলাচলনাথকে দর্শন করতে পারি, আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি ঘটে।

একথায় শিষ্যদের দুঃখ আরো বেড়ে গেল। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে গুরুদেবের ক্ষণিকের বিচ্ছেদও বেদনাদায়ক, তাঁর পরলোক গমনে এ বেদনা হয়ে উঠবে কত দুঃসহ তা ভেবে অশান্ত ও অধৈর্য হয়ে উঠল তাদের চিত্ত।

বৃন্দাবনের ভক্ত ও শিষ্যদের অন্তরকে বেদনায় আচ্ছন্ন করে কলকাতার শিষ্যদের মনে আনন্দের তুফান নিয়ে এলেন প্রভুপাদ। হরিনাম সংকীর্তনের বিরামহীন সমারোহে মুখর হয়ে উঠল কলকাতার বাসাটি। অজস্র ভক্ত ও শিষ্যের আনাগোনা চলতে লাগল দিনরাত।

ক্রমে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। সকলের কাছে করজোড়ে বিদায় চাইলেন প্রভুপাদ। কলকাতার শিষ্যদের মনেও নেমে এল বিষাদের ঘন মেঘ। জল এল চোখ ফেটে।

কলকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করত বহুদিন ধরে। মনে মনে সে শ্রদ্ধা করত প্রভুপাদকে। কাছে আসতে সাহস পেত না। প্রভুপাদ গোস্বামী ঠাকুরের প্রস্থান সময়ে সেদিন একপাশে সংকোচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বেদনার্ত চিত্তে সব কিছু লক্ষ্য করছিল মেথরটি।

সহসা সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, একপাশে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, তুমিও প্রাণ খুলে আর্শীর্বাদ করো, আমি যেন নীলাচলনাথ সাক্ষাৎ দারুব্রহ্মের কৃপা পাই। তোমাদের সকলের কৃপা ও শুভেচ্ছা ছাড়াত তা সম্ভব নয়।

মেথরটি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। আনন্দে বিস্ময়ে বেদনায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল। সে কথা বলতে পারল না। এতবড় বিনয় এতবড় দীনতা আর কোন সাধকের মধ্যে কখনো সে দেখেনি। উপস্থিত শিষ্যরাও অবাক হয়ে গেল সকলে। একমাত্র চৈতন্যমহাপ্রভুই বলেছিলেন, "চণ্ডালোপি' দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ:।"

চৈতন্য মহাপ্রভুর পর ভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে অনেক বৈষ্ণব হয়ত কোল দিয়েছেন; কিন্তু তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন না কেউ। জীবনে এতখানি ঋদ্ধি সিদ্ধি পাওয়ার পর আর কোন যোগী এমন দীনতার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে কারো জানা নাই।

প্রেমভক্তির গভীর আবেশে আত্মহারা হয়ে উঠল সকলে। প্রেমভক্তি এমনই আশ্চর্য জিনিষ যার আবেগ একবার অন্তরে উচ্ছলিত হয়ে উঠলে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান বস্তুতে বস্তুতে সব ভেদ লুপ্ত হয়ে যায় নিমেষে।

পুরীধামে এসে ভক্তিভাব চরমে উঠল প্রভুপাদ গোস্বামী ঠাকুরের। এই সেই নীলাচল যেখানে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গ

মহাপ্রভুর শেষ জীবনের বারোটি বছর কেটেছিল কৃষ্ণবিরহের দিব্যোন্মাদে। চৈতন্যচরিতামৃতে একটি জায়গায় মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ ভাবটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে॥

অন্ত্যলীলার এই সময়ে মহাপ্রভু কখনো কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে আত্মহারা হয়ে বহু বিভঙ্গে নাচতেন, আবার কখনো বা রাধাভাবে আবিষ্ট হয়ে হরি হরি বলে কাঁদতেন। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেন তাঁর কান্ত। কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তা গৌরচন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন মানস লীলা।

জগন্নাথদেবের প্রতিটি লীলা উৎসবে আত্মহারা হয়ে পড়েন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চন্দ্রযাত্রা প্রভৃতি একটি করে উৎসব আসে আর ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়ে ওঠে প্রভুপাদের অন্তরে। নামকীর্তনে মেতে উঠেন এক অনির্বচনীয় আবেশে।

গৌরচন্দ্রের উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরস, তাঁর বিচিত্র শুদ্ধপূত প্রেমলীলাবিলাস বহুকাল পরে আবার পূর্ণভাবে বিকাশিত হয়ে ওঠে প্রভুপাদের অন্তরে। অশ্রু, হাস্য, পুলক, কম্প, মূর্ছা প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখা যায় তাঁর মধ্যে।

সেবার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা কালে এক পূর্ণ দিব্যোন্মাদের ভাব ফুটে ওঠে প্রভুপাদের মধ্যে। তাঁর বাহ্যজ্ঞানরহিত উদ্দণ্ড নৃত্য দেখে দর্শকরাও ভক্তিভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। পুরীর ভক্ত সমাজে প্রভুপাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

জীর্ণ দেহটি জীর্ণতর হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। নানারকমের উপসর্গ দেখা দেয় ভগ্ন দেহে। তার উপর দেহের প্রতিদিন নামকীর্তনও

নৃত্যের অত্যাচার। অসুস্থতার জন্য প্রায়ই সমুদ্রস্নানে যাওয়া হয় না।

কিন্তু শিষ্যরা সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড দেখেন স্বচক্ষে। প্রভুপাদ সমুদ্রে যাননি। সকাল হতে এক আসনে বসে ধ্যান করছিলেন। অথচ সবাই দেখল, তাঁর জটাভার হতে সমুদ্র জল ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। তাঁর পরিধানের বসন, বসবার আসন সিক্ত। সিদ্ধ মহাসাধকের পক্ষে সবই সম্ভব।

জগন্নাথদেবের মন্দির মধ্যে তিনটি মূর্তি আছে। সাধারণ মানুষ এই বিগ্রহ তিনটিকে বলে থাকে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা। কিন্তু প্রভুপাদ এক নূতন ব্যাখ্যা দান করেন এই দেবমূর্তিগুলির। তিনি বলেন, আসলে এরা দারুব্রহ্মের অখণ্ড রূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দারুরূপে তিনটি মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছেন। এঁদের দেখলে ব্রহ্মদর্শন হয়।

প্রভুপাদের যোগবিভূতি ও দান ধ্যানের খ্যাতি দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। তাঁর দীর্ঘ জটাভারের জন্য উড়িষ্যাবাসীরা তাঁর নাম দেয় জটিয়াবাবা। শুধু পুরীধামের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে না সে খ্যাতি। ছড়িয়ে পড়ে তা সমগ্র উৎকল প্রদেশে।

পুরীধামের ধর্মসমাজে তাঁর এই এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ফলে একদল হীন প্রকৃতির সাধুর কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তারা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়। প্রথমে তারা তাঁকে অপমান করে তাড়াবার চেষ্টা করে পুরী থেকে। কিন্তু এই শক্তিমান মহাসাধককে অপমান করা সম্ভব নয় জেনে তারা কৌশলে তাঁর প্রাণ নাশের চক্রান্ত করতে থাকে।

কথাটা ক্রমে প্রভুপাদের কানে আসে। একথা শুনে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যরা বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রভুপাদ একেবারে নির্বিকার। অবিচলিতচিত্ত।

তিনি একদিন শিষ্যদের একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, কে কিভাবে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করবে তা বিধিনির্দিষ্ট। এই বিধির বিধান হতে কেউ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তা পারেন নাই, তোমরা তা মহাভারতে পড়েছ। সুতরাং তা নিয়ে বৃথা উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নাই। দেহ যখন ধারণ করেছি, এ দেহ তখন একদিন না একদিন ত্যাগ করতেই হবে। তার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তাও করি না আমি। আমি শুধু আমার কর্তব্য করে যাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দিনটি যে এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। কেই বা ভাবতে পেরেছিল, এমন নিষ্ঠুরভাবে নেমে আসবে বিধির বিধান। যোগ সাধনার ফলে দেহটি এখনো শক্ত ও সমর্থ থাকা সত্ত্বেও সে দেহ কেন অকালে ত্যাগ করতে হবে তা সবার চিন্তাও কল্পনার অতীত।

তবু তা করতে হবে, কারণ তা বিধিনির্দিষ্ট।

নীলমণি নামে প্রভুপাদের এক পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন সকালবেলায় প্রভুপাদ শিশ্যদের নিয়ে নীলমণির বাড়ীতে বসে আছেন। ধর্মবিষয়ে শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন একমনে। ভক্তরাও সকলে তা নিবিষ্টমনে শুনছে।

এমন সময়ে উঠোনে একটি সাধু এল। সাধুটিকে কেউ চেনে না। সাধু সন্ন্যাসী এমন যখন তখন অনেকেই আসে। সুতরাং সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার কেউ প্রয়োজন বোধ করল না।

এ সাধু কিন্তু অদ্ভুত এক আবেদন নিয়ে এসেছে। প্রভুপাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটি প্রসাদী নাড়ু হাতে ধরে হাতটি এগিয়ে দিল তাঁর দিকে। তারপর বলল, বাবা, এ হচ্ছে জগন্নথদেবের মহাপ্রসাদের নাড়ু। আপনার জন্য এনেছি। প্রসাদ পাওয়া মাত্রই খেয়ে নিতে হয়। দেরি করতে নাই।

উপস্থিত শিষ্যরা সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠলেন। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ প্রভুপাদও সব বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু উপায় নাই। এই নাড়ুর মধ্যে বিষ আছে জেনেও তা নেবার জন্য হাসিমুখে তিনি হাতটি এগিয়ে দিলেন। এটাই ভবিতব্য। তিনি বুঝতে পারলেন, এই বিষই হবে তাঁর নরদেহ ত্যাগের কারণ।

শিষ্যদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সকলকে নিরস্ত করে তিনি সাধুটিকে বললেন, দাও বাবা, জগন্নাথদেবের প্রসাদ অমৃত আমার কাছে। পরম ভক্তিভরে তা আমি ভক্ষণ করব।

নাড়ুটি নিয়ে ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে তা খেয়ে ফেললেন প্রভুপাদ। বিষের ক্রিয়া অল্প সময়ের মধ্যে দেখা দিল। অচেতন হয়ে পড়লেন প্রভুপাদ।

এদিকে সাধুটিকে আর তখন পাওয়া গেল না। কোথায় জনারণ্যে সে মিশে গেছে। শিষ্যরা ছোটাছুটি করে একজন চিকিৎসক নিয়ে এলেন।

চিকিৎসক এসে বিষ বার করে দিতে উপস্থিত জীবন রক্ষা হলো। চেতনা ফিরে পেয়ে শিষ্যদের কাছে ডেকে প্রভুপাদ বললেন, উপস্থিত প্রাণটা রক্ষা পেল বটে। কিন্তু দেহত আর সারবে না। আজ হতে এক মাস পরেই এ-দেহ তাগ করতে হবে। মুক্ত মন আর স্বচ্ছ অন্তদৃষ্টির আলোকে আমরা ভূত ভবিষ্যৎ সব স্পষ্ট দেখতে পাই; কিন্তু তা ত রোধ করতে পারি না।

এক মুহূর্তের জন্য গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরছিল না শিষ্যদের। দেখতে দেখতে একটি মাস কোন দিকে কেটে গেল। এক একটি দিন কাটতে থাকে আর আসন্ন বিচ্ছেদের অপরিসীম বেদনায় ভারী হয়ে উঠতে থাকে শিষ্যদের বুকের ভিতরটা।

অবশেষে অসংখ্য ভক্ত শিষ্যদের অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করে মাত্র সত্তর বছর বয়সে পুরীধামে মরদেহ ত্যাগ করলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। সেদিন ১৩০৬ সালের ২২ শে জৈষ্ঠ। সকাল থেকেই শিষ্যরা যেন বুঝতে পেরেছিল। তারা সব সময় তাদের গুরুদেবকে ঘিরে বসে রইল। বাইরে থেকেও অগণিত ভক্ত দলে দলে ভীড় করতে লাগল একবার শেষ দর্শন লাভের আশায়।

যথাসম্ভব উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন প্রভুপাদ। তিনি বারবার ভক্তির উপর জোর দিতে লাগলেন। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি ছাড়া উপায় নাই। ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব উজ্জ্বলরসরূপে সমর্পণ করবার জন্যই গৌরাঙ্গমহাপ্রভু রাধাভাব অবলম্বন করে কৃষ্ণকে কান্তরূপে জ্ঞান করতেন।

ক্রমে দিন শেষ হয়ে রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কিন্তু চোখে কোন অন্ধকারই দেখতে পেলেন না প্রভুপাদ। তিনি শুধু দেখছেন, হিরণ্যমূর্তি কমনীয়কান্তি এক বিরাট পুরুষকে যাঁর দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র বিশ্বভুবন আলোকিত, যাঁর রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা অন্তর্বৃন্দাবনে পরমাত্মা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছেন আর তাঁর সেই প্রেমবিলাসের সুরভিতে আমোদিত হয়ে উঠেছে সমস্ত দ্যুলোক ভূলোক।

প্রভু জগদ্বন্ধু

১৮২১ সাল।

মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া অঞ্চলে দীননাথ ন্যায়রত্ন মশায় তখন কোন এক টোলের অধ্যাপক হিসাবে বেশ নাম করেছেন। সামান্য একজন গরীব ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আবার এসে যুক্ত হয়েছে এক পরম ভগবৎভক্তি। এজন্য লোকের কাছ থেকে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে পান এক বিশেষ শ্রদ্ধা।

ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু গাঁয়ের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। মুর্শিদাবাদের রাণী স্বর্ণময়ীর কানেও এসে পৌঁছেছে সে খ্যাতির কথা। রাণী স্বর্ণময়ীও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন ন্যায়রত্নকে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার হলেও সেখানে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কোন অভাব ছিল না। সাধ্যমত দান অধ্যয়ন ও কর্মের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে দিন কাটাতেন ন্যায়রত্ন। তবে একটা দুঃখ মাঝে মাঝে বড় পীড়া দিত তাঁর মনকে। পর পর দুটি সন্তানেরই অকালে প্রাণবিয়োগ হয়। তারপর থেকে বেশ কিছুদিন আর কোন সন্তান হয়নি। এজন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় মনের দুঃখে ছিলেন। কিন্তু সে দুঃখ খুব একটা প্রবল হয়ে কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। কারণ বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তি থাকায় ঠাকুর সেবা পূজা অর্চনা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে কোন দিকে সময় কেটে যেত কেউ বুঝতে পারতেন না। তার উপর ন্যায়রত্ন মশায়ের

ছিল পঠন পাঠন ও শাস্ত্রলোচনা। স্ত্রী বামা দেবীর ছিল ঠাকুরসেবা ছাড়াও ঘর সংসারের কাজ।

তবু শত কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি অবকাশ পেলেই একটি নূতন সন্তান কামনা ব্যাকুল হয়ে জেগে ওঠে সন্তানহারা ন্যায়রত্ন দম্পতির মনে। কখনো কখনো সেই কামনাটিকে সকরুণ প্রার্থনার আকারে ব্যক্ত করেন রাধাগোবিন্দের সামনে। ঠাকুরের কাছে কেঁদে বলেন, কী এমন অপরাধ করেছি ঠাকুর যার জন্য সন্তানসুখে আমাদের বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। এ জন্মে ত জ্ঞানমতে আমরা কোন পাপ করি নাই। আর সজ্ঞানে বা বা অজ্ঞানে যদিই বা কোন পাপ করে থাকি, তাহলে শোক দুঃখে সে পাপ নিশ্চয়ই স্খালন হয়ে গেছে এতদিনে। এবার আমাদের কোল জোড়া একটি সন্তান দাও ঠাকুর। ঠিক গৌরাঙ্গের মত। বেশী নয়, শুধু একটি। একা চাঁদে পৃথিবী আলো। ছেলের মত ছেলে হলে সে হবে একাই একশো।

তারপর একটি বছর ধরে বাড়ীতে চলল শান্তি হোম আর কঠোরশুদ্ধাচার ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত উপবাস। সুসন্তান পেতে হলে তার জন্য সাধনা করতে হয় একাগ্র চিত্তে।

অবশেষে একদিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো ন্যায়রত্ন দম্পতির। কোল আলো করা ঘর আলো করা এক সন্তান এলো। ঠিক যেন নদের গোরাচাঁদ।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠমাসের সীতানবমী। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী প্রসূতিকে বলে উঠল, দেখগো, একবার চেয়ে দেখ, চাঁদ এসেছে।

ভয়ে চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখলেন না বামাদেবী। বললেন, কালো খাঁদা, কানা খোঁড়া যা হয়েছে তোমাদের পাঁচজনের হয়ে রাধাগোবিন্দের দয়ায় বেঁচে থাকুক।

ধাত্রী বলে, আমি বহু ছেলে প্রসব করিয়েছি, এমন লক্ষণ

সচরাচর কোন ছেলের মধ্যে দেখা যায় না। দেখে নিও এ-ছেলে রাজা হবে।

মা বলেন, রাজা হতে হবে না বাই মা, ও কাঙাল হয়ে বেঁচে থাক।

পর পর দুটি সন্তান অতি অকালে মারা গেছে। তাই পুত্রের দীর্ঘ আয়ুলাভ সম্বন্ধে উদ্বেগের অন্ত নাই মৃতবৎসা জননীর। পুত্র ভবিষ্যতে কি হবে সে বিষয়ে তাঁর কোন চিন্তা নাই। তার রূপগুণের জন্যও তাঁর কোন ভাবনা নাই। তাঁর একমাত্র চিন্তা, কিকরে সে শুধু বেঁচে থাকবে।

ন্যায়রত্ন অনেক ভাবনা চিন্তার পর পুত্রের নাম রাখলেন জগৎ। পরে জগৎ থেকে হলো জগদ্বন্ধু। মামকরণ করে স্ত্রীর মত নিতে গেলেন ন্যায়রত্ন। স্ত্রী বামাদেবীর কিন্তু পচ্ছন্দ হলো না নামটা। তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, এত ভাল নাম কেন। একটা আজে বাজে নাম রাখতে পারলে না, যা সাধারণতঃ আর পাঁচটা ছেলের থাকে।

দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। মাত্র কয়েক মাসের শিশু। কিন্তু তারই অসামান্য রূপলাবণ্যের ছটায় আলো হয়ে ওঠে চারিদিক। মুগ্ধ হয়ে যায় অজস্র লোকের দৃষ্টি! একবার চোখ পড়লে সে চোখ আর ফিরিয়ে নিত না কেউ। দেহের এমন সুঠাম ভংগিমা রঙের এমন উজ্জ্বলতা, চোখ মুখের মধ্যে এমন এক লোকোত্তর ব্যঞ্জনা কোন ছেলের মধ্যে কেউ কখনো দেখেনি।

কিন্তু শুধু কি রূপ? শুধু রূপটাই চোখে পড়ে সবার। অতটুকু শিশুর আবার গুণের খবর কে রাখবে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে যে এক মহান আত্মা লুকিয়ে আছে, আছে এক বিরাটের সম্ভাবনা, সেকথা সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও যে সব যোগাসিদ্ধ পরুষ বা সাধু সন্ন্যাসী ভবিষৎক

দেখতে পান তাঁদের তা বুঝতে বা জানতে বাকি রইল না।

সেদিন মুর্শিদাবাদের রাজপ্রসাদে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

নেপাল থেকে সেদিন এক যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী এসেছেন। তাই সেখানে হয়েছে বহু লোকের ভীড়। রাজবাড়ীর লোক ও কর্মচারি ছাড়াও রাজবাড়ীর সঙ্গে বিভিন্ন সুত্রে ঘনিষ্ট এমন লোকও এসেছে অনেক। খবর পেয়ে টোলের পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন মশায় এসেছেন। এসেছেন রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজ।

সন্ন্যাসী সিদ্ধবাক পুরুষ; কাছে পেয়ে সকলেই ঠিকুজি, কুষ্ঠী দেখাচ্ছে। যাদের এ সব নাই তারা হাত দেখিয়ে হস্তরেখা বিচার করাচ্ছে। গঙ্গাধর কবিরাজ ন্যায়রত্নের বন্ধু এবং হিতাকাংখী। তিনি বললেন, দেখে মনে হচ্ছে ইনি একজন শক্তিমান সাধক। এঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। তুমি তোমার ছেলের ঠিকুজিটা একবার নিয়ে এসো। যদি কোন দোষ থাকে তাহলে বলে দেবেন। প্রতিকারের যাই হোক একটা উপায় হবে।

ন্যায়রত্ন মশায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী গিয়ে পুত্রের ঠিকুজিটা নিয়ে এসে সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন। এক অজানা আশংকায় বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল তাঁর।

সন্ন্যাসী ঠিকুজিটি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে ন্যায়রত্ন মশায়কে বললেন, ছেলেটিকে একবার আনতে পারেন?

ন্যায়রত্ন মশায় আশংকা ও আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতির চাপে উৎসাহভরে বললেন, বিলক্ষণ, এত আর এমন কি শক্ত কথা। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।

আবার বাড়ী গিয়ে যথাশীঘ্র ছেলেটিকে নিয়ে এলেন ন্যায়রত্ন।

প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ ছেলেটির দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলেন সন্ন্যাসী। তারপর ন্যায়রত্ন মশায়ের কোল থেকে তাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। শুধু তাই নয়, আবেগের সঙ্গে তার রক্তরাঙা নরম তুলতুলে পা দুখানি বারবার কপালে ও মাথায় ঠেকাতে লাগলেন।

অবাক বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে তা দেখতে লাগলেন ন্যায়রত্ন মশায়। মুখ দিয়ে কথা সরে না। শুধু ন্যায়রত্ন মশায় নয়, উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল এ দৃশ্য দেখে।

ন্যায়রত্ন মশায় অবশেষে সাহস করে বললেন, এ কি করছেন সাধুবাবা, আপনি সাধক পুরুষ, গুরুজন। আমার শিশুপুত্রের পা আপনার মাথায় ঠেকলে আমার শিশুপুত্রের যে পাপ হবে।

সন্ন্যাসী আবেগের সঙ্গে উত্তর দিলেন, এ যে সে শিশু নয় পণ্ডিত। দেবোপম মহিমার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি এ শিশুর মধ্যে। একে দর্শন করে আজ আমি ধন্য হলাম। এখানে আমার আসা সার্থক হলো।

সন্ন্যাসীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি কেউ তা দেখতে পেল না।

আর একদিন ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এক সাধু। ন্যায়রত্ন মশায় তখন ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই সাধুটি কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কার শিশু বাবা?

ন্যায়রত্ন মশায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন কেন বাবা, এ আমারি ছেলে।

সাধু তখন গম্ভীরভাবে বললেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে রাজা হবে।

ন্যায়রত্ন মশায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, সেকি বাবা। আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণ। আমার ছেলের পক্ষে কি রাজা হওয়া কখনো সম্ভব?

সন্ন্যাসী তখন হেসে বললেন, আমিত ভোগ ঐশ্বর্যের রাজার কথা বলি নাই। এ হবে যোগের রাজা।

'যোগের রাজা' এই কথাটির মধ্যে এক অশুভ ইংগিত খুঁজে পেলেন ন্যায়রত্ন মশায়। তবে কি তাঁর সন্তান বড় হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যাবে। একটি মাত্র সন্তান, তাও থেকে হবে না থাকা। সারা শেষ জীবনটা কেঁদে কেঁদে কাটাতে হবে তাঁদের দুজনকে।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে কথাটা বলতে তিনিও শিউরে উঠলেন এক অজানা ভয়ে। বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা যে ছেলের মধ্যে দেব মহিমা খুঁজে পায় সে সাধারণ ছেলে নয়। এত বড় সুলক্ষণ-যুক্ত ছেলে সাধারণতঃ বাঁচে না, বাঁচলেও ঘরে থাকে না। এই এই কথা ভেবেই পুত্রগৌরবে গৌরব বোধ করার পরিবর্তে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেন তাঁরা।

এখন গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দই তাদের একমাত্র ভরসা। তাই রাধাগোবিন্দের কাছে গিয়ে সব কথা কাতরকণ্ঠে জানিয়ে মনে মনে অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে উঠলেন ন্যায়রত্ন দম্পতি।

সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেল ন্যায়রত্ন মশায়ের মনে। যে কথা এক রকম তিনি ভুলেই গিয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের বাস্তুভিটের যে কথাটি ছোটবেলায় বাবার কাছে শুনেছিলেন, সেই কথাটি আজ অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর।

কীর্তিনাশা কুলভাঙ্গা পদ্মার পারে ছোট্ট একটি গাঁ। সে গাঁয়ে কখনো যাননি ন্যায়রত্নমশায়। শুধু কানে তার নাম শুনেছেন। নাম তার কোমরপুর। গোয়ালন্দের কাছাকাছি। গাঁটি ছোট হলে হবে কি, এই গাঁ আর তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভিটেকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ তাৎপর্য জড়িয়ে আছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করেন তখন এই কোমরপুর গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ

করেন। কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে পদ্মায় জলে তিনি স্নান করেছিলেন বলে ভক্তরা এই গাঁয়ের নাম দেয় কোমরপুর। এই বাসুদেব চক্রবর্তী ন্যায়রত্নমশায়েরই পূর্বপুরুষ। পরে কালক্রমে পদ্মা গাঁটিকে গ্রাস করে ফেললে চক্রবর্তীরা গাঁ ছেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এই গোবিন্দপুরেই ছোট থেকে মানুষ হয়েছেন ন্যায়রত্নমশায়। এইভাবে সুদূর অতীত হতে প্রবাহিত তাঁদের বংশের রক্তধারার মধ্যে ধর্মপ্রবণতার একটি ঢেউকে সহসা খুঁজে পেলেন ন্যায়রত্ন।

সকলের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে বাপ মাকে গৌরবান্বিত করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল শিশু জগৎ। যে দেখে সেই ছুটে এসে একবার কোলে করে শিশুকে। শিশুর সৌম্য সুন্দর মূর্তি, তার মুখের ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনা। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জাগায় মানুষের মনে। সংস্কারবশতঃ ছেলেকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন বামাদেবী। যার তার কাছে বার করেন না। কার মনে কি আছে, কে কখন কুনজর দেবে, কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু পুত্রসুখের এমন অনাস্বাদিতপূর্ব গৌরব আর বেশীদিন ভোগ করতে হলো না বামা দেবীকে। একদিন হঠাৎ প্রাণত্যাগ করলেন তিনি। জগতের বয়স তখন মাত্র এক বছর দুই মাস।

আকস্মিক মৃত্যু ছোট্ট সুখের সংসারটিতে নিয়ে এল এক দারুণ বিপর্যয়। বাড়ীতে অন্য কোন মেয়ে লোক নাই, দুগ্ধপোষ্য শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়লেন ন্যায়রত্নমশায়।

সহসা একটা উপায়ের কথা মনে পড়ল তাঁর। গোবিন্দপুরে তাঁর এক নিঃসন্তান বিধবা ভাইঝি আছে। তার কাছে জগৎকে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সে খুশি হয়ে ভার নেবে তার।

হলোও ঠিক তাই। গোবিন্দপুরে যেতেই ভাইঝি দিগম্বরী সব ভার নিল জগতের। নিশ্চিন্ত হলেন ন্যায়রত্ন। এ গাঁয়ের পাশ দিয়েও পদ্মা বয়ে চলেছে। ন্যায়রত্নের দেখে মনে হলো,

ক্রমশই কূল ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে পদ্মা। এ গাঁটিকে গ্রাস করতেও বিশেষ দেরি হবে না তার। পদ্মাকে দেখে কোমরপুরের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তার সঙ্গে মনে পড়ল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা। পদ্মার জলে ন্যায়রত্ন দেখলেন প্রেমধর্মের দুর্বার অজস্র ঢেউ।

যেদিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে এসে বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়ীতে এসে ওঠেন সেইদিন হতেই যেন তার বংশধারার মধ্যে প্রেমভক্তির এক প্রবল প্রবণতা চিহ্নিত হয়ে যায়। যেদিন পদ্মার জলে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু স্নান করেন, সেইদিন হতেই যেন অজস্র ধারায় প্রেমভক্তির প্রবাহ বয়ে চলেছে পদ্মার জলে। সবাই তা দেখতে পায় না। ন্যায়রত্ন তা দেখতে পেলেন।

ন্যায়রত্ন ইহলোকে আর বেশীদিন রইলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই পরলোকে চলে গেলেন। জগৎ গোবিন্দপুরে দিদি দিগম্বরীর কাছেই রয়ে গেল। তার বয়স তখন মাত্র চার।

এদিকে দেখতে দেখতে গোবিন্দপুর গাঁখানির বেশ কিছুটা অংশ পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। দিগম্বরীদের বাস্তুভিটেরও কোন চিহ্ন রইল না। দীগম্বরী তখন নিরুপায় হয়ে ফরিদপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণকাঁদা নামে একটি সহরতলীতে উঠে এসে জগৎকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

ফরিদপুরের জেলা স্কুলে পড়াশুনো করতে লাগল জগৎ। কিন্তু পড়াশুনোতে বেশ মেধার পরিচয় দিলেও মন দিতে পারে না। বেশীক্ষণ মন কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না বইএর পাতায়, চারিদিকের মাঠ, বন, আকাশের মধ্যে কি যেন তা খুঁজে বেড়ায়।

তের বছর বয়সে উপনয়ন হতেই অদ্ভুত এক ভাবান্তর ঘটল জগতের মধ্যে। ছোট থেকে সে একটু ভাবুক প্রকৃতির। কথা কম বলে। বালসুলভ দৌরাত্ম্য বা চপলতা কোনদিনই তার নাই। কিন্তু এবার থেকে আরো সে কথা কমিয়ে দিল। সঙ্গী সাথীদের

সঙ্গে মেলামেশাও প্রায় বন্ধ করে দিল। সে কেবল কোন নির্জন জায়গায় চুপ করে একা একা বসে থাকতে ভালবাসে। বসে বসে তন্ময় হয়ে কি ভাবে কেউ তা বুঝতে পারে না।

কিছুকালের মধ্যে দুটি অদ্ভুত লক্ষণ জগতের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে। হরিনাম শুনতে সে খুব ভালবাসে আর দেহটি সে সব সময় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। সকলেই ভাবে, এও বুঝি বালসুলভ খেয়াল। কিন্তু জগৎ যা কিছুই করে তা সবই ভাল লাগে সকলের। সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তার সুন্দর সুঠাম দেহভঙ্গিমায় সব কিছুই মানিয়ে যায়।

এই সময় ফরিদপুর স্কুলের এক শিক্ষকের ভুলের জন্য স্কুল ছেড়ে দেয় জগৎ। কিছুদিন পড়া বন্ধ থাকে। তারপর পাবনায় যেতে হয় জগৎকে। সেখানে গিয়ে আবার পড়াশুনো শুরু হয়। তার মত রূপগুণসম্পন্ন ছেলেকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠে তার সহপাঠিরা।

পাবনায় আসার পর থেকে হরিভক্তি ও হরিনাম কীর্তন আরো বেড়ে যায় জগতের। শুধু তাই নয়, এবার সে একা একাই নাম করে না। তার সহপাটি ও সঙ্গী সাঙ্গীরাও যোগ দেয় সে নাম কীর্তনে। ভক্তিভাবের আবেশে বিহ্বল, হরিপ্রেমের উন্মাদনায় উত্তাল তার মূর্তিটি দুর্বারবেগে আকর্ষণ করে সকলকে। সকলে দলে দলে এসে যোগ দেয়।

এক দিন পাবনার কাছে এক সহরতলিতে যাত্রাগানের আসরে হরিনাম শুনে মুর্ছিত হয়ে পড়ে জগৎ। অষ্টসাত্বিক প্রেম-বিকারের লক্ষণ ফুটে উঠে তার দেহে। তখন পাবনা অঞ্চলে ধ্রুব চরিত্রের যাত্রাগান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ গান যেখানেই হয় প্রচুর ভীড় হয়। কিন্তু জগতের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। প্রহ্লাদের হরিভক্তির মধ্যে তার ভক্তহৃদয়ের এক পরম আকূতিকে

খুঁজে পেয়েছে যেন জগৎ। হরির জন্য ভক্ত প্রহ্লাদের যে প্রাণপণ আকুলতা, সে আকুলতা যেন তার আপন হৃদয়ের রঙে রাঙানো।

এই যাত্রাগান যেখানেই হোক, জগৎ তা শুনতে যাবেই। সেদিনও গিয়েছিল। আসরের একধারে শুনছিল মন দিয়ে। হঠাৎ ধ্রুব গান ধরল, কোথায় পদ্মপলাশ লোচন হরি।

এই গান শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলল জগৎ। মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। সকলে তখন তাকে ধরাধরি করে পাশের একটি বাড়ীতে নিয়ে গেল। আসরের মধ্যেই একজন নূতন পাশ-করা ডাক্তার বসে ছিলেন। তিনিও ব্যস্ত হয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগলেন জগৎকে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ হচ্ছে হিষ্টিরিয়া রোগ।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে পরীক্ষা করেও জগতের কোন কোন রোগ ধরতে পারলেন না ডাক্তার। না পেরে আশ্চর্য হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনা থেকেই বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল জগৎ। আবার গিয়ে যাত্রাগান শুনতে লাগল।

সাত্ত্বিক বিকারের কথা এর আগে শুধু কানেই শুনেছিলেন ডাক্তার। কিন্তু চোখে দেখেননি। আজ নিজের চোখে তা দেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস না করে পারলেন না।

আর একদিনের কথা। সেদিন ইচ্ছামতী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল জগৎ। হঠাৎ নদীর ধারে একজন রাখাল যাত্রাগানের আসরে শোনা প্রহ্লাদের গান গেয়ে উঠল, আর কবে দেখা পাব হরি, যুগলরূপ একাসনে।

জগতের মনে হলো, এ গানের বাণী ও সুর আর কারো নয়। এ গানের বাণী ও সুর তারই অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশ হতে বেরিয়ে মূর্ত হতে উঠেছে এই গানের মধ্যে। এ গান নয়, তার আত্মার ক্রন্দন। তার প্রাণের হরিকে দেখবার জন্য জন্মে জন্মে

যুগে যুগে সে যেন এমনি করে কেঁদে আসছে। আরো কাঁদবে। যতদিন না দেখা পাবে ততদিন এমনি করে কাঁদবে।

ভাবতে ভাবতে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল জগৎ নদীর ধারে ঘাটের কাছে। জলে তখনো নামেনি। একজন বৈষ্ণব সাধক পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জগতের অবস্থা কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ছুটে এসে জগতের কানের কাছে নাম কীর্তন করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এ সাধারণ মূর্ছা বা হিষ্টিরিয়া নয়; এ হচ্ছে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার যা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রায়ই হত।

বৈষ্ণব সাধুটির দেখাদেখি আরো অনেকে এসে হরিনাম করতে চেতনা ফিরে পেল জগৎ। পরে স্নান করে বাড়ী ফিরে গেল। এই কিশোর বয়সে এতখানি ভক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠা সম্ভব নয় কোন সাধকের পক্ষে। কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠল জগতের পক্ষে। তার এই ভক্তিসিদ্ধর কথাশুনে চারিদিক হতে রোজ তাকে দেখবার জন্য বহু লোক আসতে লাগল।

কী অদ্ভুত আকর্ষন এই কিশোরের। সুঠাম, সুন্দর ও উন্নত দেহ। উন্নত নাসিকা। লীলায়িত ভ্রূযুগল। আয়ত উদাস দৃষ্টি। একবার দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে সবাই। ভক্তিভাব জাগে সকলের মধ্যে।

জগতের কণ্ঠও বড় মধুর। তার মধুর কণ্ঠের কীর্তন গান একবার যে শুনেছে সে আর ভূলতে পারে না। বারবার তাকে আসতে হয়।

হরিনাম সংকীর্তন নিজে করা ত দূরের কথা, কানে শুনলেই ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে পড়ে জগবন্ধু।

একদিন একটি দুষ্ট লোক পরীক্ষা করতে চাইল তাকে। তার বাহ্যজ্ঞান লোপ, সাত্ত্বিক প্রেমবিকার সত্যকারের না ভাণ সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল তার। তাই একদিন জগবন্ধু যখন হরিনাম কীর্তন

করতে করতে দিব্যভাবে বিহ্বল উন্মাদ হয়ে উঠছে ঠিক সেই সময় লোকটি একটি জ্বলন্ত টিকে ফেলে দেয় তার পায়ের উপর। কিন্তু তা একেবারেই বুঝতে পারলনা জগবন্ধু। যে আগুনের স্পর্শ পাবা মাত্র মানুষ এক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে সেই আগুনে তার পায়ের একটি আঙুল দগ্ধ হয়ে গেলেও তা সে অনুভব করতে পারল না। ভক্তিভাবের প্রবলতায় এমনি তার মন প্রাণের সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত। হরিপ্রেমে এমনি সে বিভোর।

কিছুক্ষনের মধ্যেই জগবন্ধুর ভক্তরা তা দেখতে পেয়ে পা থেকে টিকে টিকে সরিয়ে দেয়। এদিকে দুষ্ট লোকটি এই আশ্চর্য দৃশ্য নিজের চোখে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়। জগদ্বন্ধু পরে সব বুঝতে পেরেও লোকটিকে ক্ষমা করে।

দিনে দিনে নাম কীর্তনের ফলে আত্মার শক্তি যত বাড়তে লাগল সর্বজীবে সর্বভূতে উদার প্রেমভাব যত প্রসারিত হতে লাগল ক্ষমাগুণও ততই বাড়তে লাগল জগদ্বন্ধুর। একদিকে ভক্তের সংখ্যা যেমন বেড়ে গেছে, অন্যদিকে পরশ্রীকাতর নিন্দুকের দলেরও অভাব নেই। জগবন্ধুকে এবার ভক্তেরা প্রভু বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে। দলে দলে তাঁর কাছে এসে নামকীর্তনে যোগ দিচ্ছে। এসব দেখে এক শ্রেণীর দুষ্ট লোক তাঁকে অপমানিত করবার চেষ্টা করে।

বনমালী রায় নামে একজন পরম ভক্ত ছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুর। একবার বনমালী রায় ধরে বসলেন, কোন এক জমিদার বাড়ীতে গিয়ে হরিনাম করতে হবে। হরিনাম সংকীতনের জন্য স্থান বিচারের কোন প্রশ্ন নাই। চণ্ডালের ঘর রাজার ঘর সেখানে সমান। তাছাড়া ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে নিমজ্জিত মোহগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধারের অন্য কোন পথ নাই।

এই সব নানারকম ভেবে সম্মত হলেন জগদ্বন্ধু। এদিকে তাঁর যশ দিনে দিনে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সমাদরের সঙ্গে

রাজবাড়ীতে আহুত হয়েছেন জেনে তাঁর শত্রুরা হিংসায় জ্বলে উঠল। তারা দল বেঁধে একদিন তাঁকে একা পেয়ে মারধোর করে। পরে বনমালীবাবু এবং ভক্তরা তা জানতে পেরে দুষ্ট লোকগুলির শাস্তি দেবার জন্য বিশেষ ভাবে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সব জেনেও দুষ্টলোকগুলির নাম কিছুতেই প্রকাশ করলেন না জগদ্বন্ধু।

প্রভু জগদ্বন্ধু আসার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াসের জমিদারবাড়ীতে হরিনাম সংকীর্তনের মহা সমারোহ শুরু হয়ে যায়। হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে চলে উদ্দণ্ড নৃত্য। কীর্তন কালে ভাবে বিভোর হয়ে নাচতে নাচতে কারো কারো পাদুটি মাটি থেকে শূন্যে অনেকখানি উপরে উঠে যায়। একেই বলে উদ্দণ্ড নৃত্য।

জমিদারবাড়ীতে রাধাবিনোদের বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে বহু লীলাকাহিনী প্রচলিত আছে। বড় অদ্ভুত এই জাগ্রত দেবতার মহিমা। সেবাইতরা যে ভোগ নিবেদন করে তা নাকি ঠাকুর স্পর্শ করেন। ভোগের পর গড়গড়া হতে তামাক খান। অনেকে শব্দ শুনেছে।

শোনা যায় বহুকাল আগে এই জমিদারবংশের একটি কুমারী মেয়ে রাধাবিনোদকে স্বামীরূপে ভজনা করত। তার অবিচল ভক্তি আর নিষ্ঠা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। একদিন রাধাবিনোদ স্বয়ং তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাকি মেয়েটি মুহূর্ত মধ্যে সকলের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও কেউ তার কোন সন্ধান পায়নি। সবাই বলে, রাধাবিনোদ তাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সে দেবলোকে বৈকুণ্ঠে গিয়ে রাধাবিনোদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে লীলা করছে। সেই থেকে স্থানীয় লোকেরা রাধাবিনোদকে বলত জামাই বিনোদ।

বনমালীবাবু কিন্তু এসব কথা সব বিশ্বাস করেন না। বনমালীবাবুর চরিত্রে দুটি স্ববিরোধী গুণের দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি বৈষ্ণব বংশের সন্তান। ভক্তিভাবের বীজ ছিল তাঁর রক্তে। কিন্তু সমকালীন ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় মন হয়ে উঠেছে যুক্তিবাদী। অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে কুসংস্কার বলে মনে হয় তাঁর।

তবে বনমালীবাবুর একটা বড় গুণ ছিল। তিনি ছিলেন সরল, সত্যবাদী আর স্পষ্টবক্তা। মনের কোন কথা অনুভূত কোন সত্য তিনি গোপন রাখতে পারতেন না। প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রতি তাঁর ভক্তিতে বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না।

একদিন তিনি স্পষ্ট জগদ্বন্ধুকে বললেন, আচ্ছা প্রভু এ সব কি-করে সত্য হয়? অন্য কারো কথা আমি বিশ্বাস করব না। একমাত্র আপনি যদি সত্য বলেন তাহলেই আমি বিশ্বাস করব।

প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে কোন কথা না বলে বনমালীবাবুকে সঙ্গে কার ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলেন।

তখন ঠাকুরের ভোগ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তামাক সেজে গড়গড়াটি ঠাকুরের সামনে সেবনের জন্য রাখা হয়েছে।

হঠাৎ বনমালীবাবু আশ্চর্য হয়ে শুনলেন, গড়গড়া থেকে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। সচকিত হয়ে দেখলেন, নল থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। জীবনে এতবড় আশ্চর্য জিনিষ দেখেননি বা শোনেননি। এ কিকরে সম্ভব তা কিছুতেই ভেবে পেলেন না।

বিহ্বল এবং বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেলে বনমালীবাবু জগদ্বন্ধুর পা দুটো ধরে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন প্রভু। আমার ভুল এতক্ষণে ভেঙ্গেছে। আমি সামান্য মানুষ; অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আমার মন। আমার এই ভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত মন লৌকিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে চেয়েছিল সব সত্যকে আর সেই সত্যকে যুক্তি দিয়ে চিরে চিরে দেখতে চেয়েছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, লৌকিক জগতের বাইরে বাস্তব জ্ঞানের উর্ধ্বে বহু

সত্য আছে। মাঝে মাঝে সেই সত্য আমাদের খণ্ড জ্ঞানের সীমাকে উপহাস করে এই লৌকিক জগতেই প্রকটিত হয়। একমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারাই এ সত্যকে জানা যায়।

সদা সর্বদা কৃষ্ণনাম লিখবে জপবে ভাববে। কৃষ্ণই গতি, কৃষ্ণই পতি,—এই সার কথাই পরম ধর্ম। মানসে সদা যুগল সঙ্গ করে নিজেকে দাসী মনে করবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে ও মানসে ভাসবে। কৃষ্ণই জীবনের ব্রত। তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না ভাববে না।

এই ক'টি কথাই ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রই তিনি সকলকে দান করতেন। তাঁর এই বাণী সেকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই একমাত্র ব্রজভাবের গোপী সাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করে নিজে রাধাভাবে কৃষ্ণের ভজনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু এই ভাবের সাধনা সাধারণ ভক্তের জন্য নয়। তাই এই ভাবে সাধনা করতে কোন বৈষ্ণব সাধক তাঁর ভক্তশিষ্যদের বলেন না।

সাধারণ ভক্ত নিজের উপর রাধাভাব বা ব্রজগোপীভাব আরোপ করতে পারে না। এ কাজ বড়ই কঠিন। তাই তারা সখি বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলারস আস্বাদন করে ধন্য হয়।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন,—

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানি কে।
মধুরবৃন্দা বিপিনমাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজযুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ না হলে রাধার প্রকৃত মহিমা কেউ জানতে পারত না; নামপ্রেমের রস কেউ আস্বাদন করতে পারত না। একমাত্র গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই প্রথমে রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধনার দ্বারা মধুর বৃন্দাবনবিপিনের মাধুরী আর যুবতী ব্রজগোপীদের ভক্তিভাবের রহস্যটি জগতের সামনে তুলে ধরেন। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম অপ্রাকৃত। তা লৌকিক বা প্রাকৃত নয়।

প্রিয়বস্তুর প্রতি মানুষের মনের সহজ অনুরাগকেই রতি বলা হয়। বৈষ্ণবদের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের রতি লৌকিক রতি নয়, কৃষ্ণরতি। এই কৃষ্ণরতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এখানে ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। শান্তে আছে শুধু ভগবানের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, নিষ্ঠা আর নির্ভরতা, সেখানে ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না। দাস্যে যে ঈশ্বরপ্রেমের সূচনা, সখ্য ও বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে মধুরে তার চরম পরিনতি।

রাধা ও ব্রজগোপীদের মহিমা দেখাতে গিয়ে বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা ভক্তিরও স্তরভেদ করেছেন। রাধা ও ব্রজগোপীদের কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ। তারজন্য সাধনা করতে হয় না। এইজন্য তাদের ভক্তি সাধ্যভক্তি। কিন্তু জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনাসাপেক্ষা বলে তাদের ভক্তি সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তিকে শাস্ত্রে বৈধী ভক্তি বলে। বৈধীভক্তি আবার নয় রকমভাবে প্রকাশিত হয় যথা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন।

এই সব ভাবের সাধনায় চিত্ত নির্মল হলে সেখানে প্রকৃত প্রেমের ছায়া পড়ে। এই প্রেমের উদয়েই কান্তভাবের সূচনা। যে প্রেমে ভক্তহৃদয়ে পরমদুঃখও সুখ বলে মনে হয় সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। এই রাগ গোপীদের কৃষ্ণভক্তির অন্তরাত্মা

বলে তাদের ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগ সাধারণ ভক্তদের স্বভাবজাত নয়, তার জন্য সাধনা করতে হয়; তাই তাদের ভক্তি রাগানুগা ভক্তি। জীবের সাধনা চলে এই রাগের অনুসরণে।

এই কঠিন প্রেমসাধনার জন্য রাধাকেই মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। কৃষ্ণকে পেতে হলে আগে পেতে হবে রাধার কৃপা এবং করুণা। তাই রাধাই হয়ে উঠল তাঁর ধর্ম এবং কর্ম, ধ্যান এবং ধারণা।

কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুচরকে নিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন জগদ্বন্ধু। কিন্তু কোথাও গিয়ে শান্তি পেলেন না মনে প্রাণে। রাধার দর্শন লাভের জন্য ভীষণভাবে আকুল হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র মন প্রাণ। কেবলি তাঁর মনে হতে লাগল, বৃন্দাবনে গেলেই মহাভাবস্বরূপিনী রাধার দর্শনলাভ করতে পাবেন। তাই মথুরা ও প্রয়াগ হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন জগদ্বন্ধু।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়েই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। যমুনার জলে স্নান করে ও কুঞ্জছায়ায় বিশ্রাম করে দেহ শীতল করলেন। রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার অজস্র স্মৃতির সুরভি ছড়িয়ে আছে যে সব জায়গায় সেগুলি একে একে দেখে নয়ন তৃপ্ত করলেন।

কিন্তু তবু শান্তি পেলেন না। রাধার দর্শন লাভ না করলে এখানে আসাই তাঁর বৃথা। তাই আকুল ও আত্মহারা হয়ে রাধাকুণ্ডের দিকে ছুটে চললেন প্রভু জগদ্বন্ধু। কাউকে সঙ্গে নিলেন না। কারো সামনে যদি দেখা না দেন রাধা। দুচোখে জল ঝরছে অবিরল। কণ্ঠে শুধু একই নাম একই গান বার বার উচ্চারিত হচ্ছে, রাই তুমি উদ্ধারণ। দেখা দাও। তুমি আমার ধর্ম, তুমিই আমার কর্ম। এ ভবকুহক হতে তুমি আমায় উদ্ধার কর। তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। আমার দীক্ষাগুরু নাই, মনে মনে আমি তোমাকেই গুরুরূপে বরণ করেছি, তোমারি

কাছে প্রেমসাধনা শিক্ষা করেছি। কিন্তু তোমার দেখা না পেলে আমার জীবনই হবে বৃথা। আজ আমায় তোমার দেখা পেতেই হবে। না পেলে এ জীবন আমি রাখব না। রাই, তুমি দেখা দাও। দেখা দাও। দেখা দাও।

চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠল আর সেই অন্ধকারের মাঝে সহসা চোখের সামনে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল যেন। চকিতে স্ফুরিত হয়ে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলোর এক স্বর্ণরেখা। বিস্ময়বিস্ফারিত ছুটি চোখ মেলে জগদ্বন্ধু দেখলেন, মহাভাবময়ী স্বয়ং রাধা আবির্ভূত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধার ধ্যানমন্ত্র আপনা থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। অস্ফুট স্বরে বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলেন।

অমলকমলকান্তি নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
নবীন হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।

অমল কমলের মত তাঁর কান্তি। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং। অপরূপ তাঁর কেশকলাপ। তিনি নীল বস্ত্র পরে রয়েছেন। তিনি পূর্ণানন্দবতী অর্থাৎ কৃষ্ণের আনন্দশক্তির পূর্ণ প্রতীক।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আনন্দে ভাসতে লাগল যেন তাঁর মন। রাধার আকাংখিত দর্শনলাভে ধন্য হয়েছে তাঁর জীবন। এক অপরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর সাধনা।

এরপর থেকে জীবনে কোনদিন রাধা'নাম আর উচ্চারণ করেননি। তবে রাধাই যে তাঁর দীক্ষাগুরু একথা তিনি একদিন ভক্তদের প্রকাশ্যে বললেন। বললেন, তোদের বৃষভানুনন্দিনীই আমার গুরু।

রাধা যদিও গোপীগণের অন্যতমা তথাপি তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আরাধিকা। নিখিল ভক্তজীবের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতীক। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীরা শ্রেষ্ঠ আরাধিকা রাধার ভক্তিমুখী বিচিত্র

চিত্তবৃত্তিরই এক একটি মূর্তিমতী প্রতীক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণের ভজনা আসলে গোপীভাবের, রাধাভাবের নয়। গোপীভাবের ভজনায় অর্থ রাধার সখী ললিতা বিশাখা প্রভৃতির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবা।

কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধুর সাধনার স্বরূপটি ছিল রাধার আনুগত্যময়ী। সদ্‌গুরু যেমন সব সময় ভক্তের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইষ্ট সাধনার ঠিক পথ বলে দেন, রাধাও তেমনি সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে তাঁর জীবনের মর্মমূলে বসে তাঁর সাধনপথে তাঁকে চালিত করছেন। অবিরাম মানস সান্নিধ্যের ফলে একাত্ম হয়ে উঠেছেন তিনি রাধার সঙ্গে।

রাধা নাম উচ্চারণ করেন না তিনি মুখে। গুরুরনাম মুখে বলতে নাই। কিন্তু এ নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে তাঁর সমস্ত দেহ। আত্মহারা হয়ে ওঠেন তিনি। এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাঁর চেতনার মধ্যে।

তাঁর দেখাদেখি রায় হরিদাস নামে এক ভক্তও রাধানাম উচ্চারণ ছেড়ে দিলেন। এ যেন নিছক নকল। হরিদাস ভাবলেন, তিনিও এইভাবে রাধার অনুগত্যময়ী প্রেমসাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠবেন প্রভু জগদ্বন্ধুর মত।

কিন্তু এই সুকঠিন সাধনা সকলের জন্য নয়। তাই প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন হরিদাসকে বললেন, এ নাম করবি না ত ভবসিন্ধু তরবি কিসে? তখন হরিদাস নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

বৃন্দাবন হতে আবার ফরিদপুর। যে অমূল্য অপার্থিব সম্পদ তিনি বৃন্দাবনে লাভ করেছেন, এবার বিতরণ করতে হবে তা সাধারণ লোকসমাজে।

একবার কী মনে হলো ব্রাহ্মণকাঁদায় গিয়ে উঠলেন জগদ্বন্ধু সদলবলে। এই ব্রাহ্মণ কাঁদাতেই দিদির কাছে কেটেছে তাঁর

শৈশবকাল। এখানকার মাটিও মানুষের মধ্যে তাঁর শৈশবকালের কত স্মৃতি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

তাঁকে পেয়ে স্থানীয় জনসাধারণের আনন্দের সীমা নাই। শুধু তাঁর ছেলেবেলাকার খেলার সাথীরা নয়, দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা বহু লোক এসে যোগদান করতে লাগল তাঁর হরিনাম সংকীর্তনে। প্রভু জগদ্বন্ধু নিজেই কীর্তনের জন্য পদ রচনা করেন, নিজেই সুর দেন। তারপর এক দিব্য আনন্দে বিভোর হয়ে মূল গায়েনরূপে স্বকণ্ঠে নিজেই প্রথমে গাইতে থাকেন। সঙ্গে তার অনুসরণ করে অজস্র সমবেত কণ্ঠ। সময় অসময় দিন রাত্রির কোন ভেদজ্ঞান নাই। হরিনামের আর বিরাম নাই।

যারাই হরিনামে যোগদান করছে তারাই প্রসাদ পাচ্ছে। কে কোথা হতে এত লোকের খাওয়ার আয়োজন করছে তা বোঝবার উপায় নাই। হরিনাম শুধু কীর্তন অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অঙ্গন থেকে শুরু হয় নগর পরিক্রমা। প্রভু জগদ্বন্ধুর ভাববিহ্বল বিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখে বহু লোক আপনা থেকে কীর্তনে এসে যোগদান করে। মোহবদ্ধ অজস্র মানুষকে মুক্ত করবার জন্যই তিনি যেন বিরামহীন নামযজ্ঞের আয়োজন করেছেন।

তথাকথিত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীদের প্রতিও দয়ার অন্ত নাই জগদ্বন্ধুর। হরিজন আন্দোলনের বহু আগেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সহজ পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি। জীবে দয়া এবং হরিনামে রুচি মানুষেয় মনের মধ্যে জাগলেই সব ভেদজ্ঞান দূর হয়ে যাবে।

ফরিদপুর শহরের শেষপ্রান্তে একদল বুনো বাগ্দী বাস করে। কালো বলিষ্ঠ দেহ। দৈহিক শক্তি প্রচুর। বিভিন্ন রকমের পশু পাখি শিকার করে খায়। বাছ বিচার নাই। শূয়োর খায় বলে লোকে তাদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। ঘৃণা করে। রজনী

হচ্ছে এই সব বাগ্দীদের সর্দার। খৃষ্টান মিশনারীরা তখন তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করছিল।

প্রভুজগদ্বন্ধু যখন নগর পরিক্রমার সময় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন তখন রজনী অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত।

একদিন রজনী তার জনকতক অনুচর সঙ্গে নিয়ে কীর্তন অঙ্গনের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। এগিয়ে গিয়ে কোন কথা বলবার সাহস হলো না।

এদিকে প্রভু জগদ্বন্ধুর সেদিকে সহসা চোখ পড়তেই কীর্তন করতে করতে নিজে ব্যস্ত হয়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রজনী সর্দারকে। বললেন, রজনী, মনে রেখো, তোমরা হীন বা অস্পৃশ্য নও। তোমরাও মানুষ। আজ হতে তুমি হলে শ্রীহরির দাস, নিজেকে আর রজনী সর্দার বলে মনে করো না। তোমার দলের লোকরাও বুনো বাগ্দী নয়, তারা এবার হতে মোহান্ত সম্প্রদায় বলে গন্য হবে। এবার হতে তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে। মুখে শুধু হরিনাম করবে। হরিনাম হচ্ছে অমৃত, জীবনের পরম ধন।

এক প্রবল আলোড়ন জাগল রজনীর মনে। ভক্তিভাবের বন্যায় জীবনের সমস্ত জঞ্জাল মুহূর্তে ভেসে গেল সব। রজনী হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সে বুঝল, এতদিন সে যা কিছু করে এসেছে যে পথে চলে এসেছে তা সব ভুল। এবার থেকে নূতন পথে চলতে হবে, নূতন জীবন শুরু করতে হবে।

প্রভুজগদ্বন্ধু বললেন, আগামী কাল তুমি তোমাদের দলের ছেলে বুড়ো সবাইকে এখানে নিয়ে এসে রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাবে।

পরদিন রজনী সত্যিই তার দলের ছোট বড় সবাইকে নিয়ে এসে কীর্তনে যোগ দিল ও প্রসাদ খেল। তাদের আনন্দ আর

ধরে না। প্রভু জগদ্বন্ধুর অপার করুণার স্পর্শে ও হরিনামের গুণে এই জগৎ ও জীবনের এক নূতন অর্থ খুঁজে পেল রজনী।

এইভাবে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠল বুনো বাগ্দীর দল। কীর্তন গান করতে করতে তারা হয়ে উঠল ভাল কীর্তনীয়া। গানে ও বাজনায় সমান পটু। কপালে গোপীচন্দন ও কণ্ঠে তিলকে ভূষিত হয়ে তারা হয়ে উঠল পরম বৈষ্ণব, প্রকৃত হরিজন। সমাজে জাতি বা বর্ণ হিসাবে যাদের কোন প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতি নাই তারাই হলো হরির হৃদয়ের ধন। তারাই হলো হরিজন।

ফরিদপুরের শেষ প্রান্তে সেই বুনো বাগ্দীদের এই পরিবর্তনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। আর তাদের কেউ বুনো বাগ্দী বলে ঘৃণা করে না। কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে এখন তারা হরিনাম প্রচার করে বেড়ায়। তাই লোকে তাদের মোহান্ত বলে। আগেকার রজনী সর্দার এখন হয়েছে হরিদাস প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রিয় শিষ্য। হরিদাস হচ্ছে এখনো দলপতি, তবে আগেকার অর্থে নয়। এখন সে মূল কীর্তনীয়া বা মূল গায়েন। দলের মধ্যে গাইতে এবং বাজাতে অনেকেই শিখে গেছে। বিশেষ করে মৃদঙ্গ বাজনায় অনেকে নাম করেছে। মহিম হচ্ছে মৃদঙ্গ বাজনায় সবচেয়ে ভাল।

একবার এক কীর্তন অনুষ্ঠানে হরিদাস ও মহিমের মধ্যে তাল নিয়ে ঝগড়া হয়। একজন আর একজনের ভুল ধরে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। কথা কাটাকাটি করতে করতে অহংকার তীব্র হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। অহংকার থেকে সৃষ্টি হয় উত্তাপ। মূল কীর্তনীয়া ও মূল মৃদঙ্গ বাদকের মধ্যে এই ঝগড়া ক্রমশ তীব্র হওয়ায় দলের লোক অনুষ্ঠান ভেঙে দিতে বাধ্য হয়। শ্রোতারা ক্ষুণ্ণ মনে চলে যায়। হরিনাম প্রচারের মহিমা খর্ব হয় লোক সমক্ষে।

প্রভু জগদ্বন্ধু যেন অন্তর্ধামী। দূরে থেকেও শিষ্যদের মনের সব কথা তাদের সব ত্রুটী-বিচ্যুতি নিজে থেকেই জানতে পারেন। অলক্ষ্যে ঘটলেও কোন কিছুই অগোচরে থাকতে পায় না তাঁর।

হরিদাস মহিমের ঝগড়ার কথাটি সেই রাত্রেই যোগবলে জানতে পেরেছেন জগদ্বন্ধু। তাছাড়া অকালে কীর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যথা পেয়েছেন মনে। পরদিন সকাল হতেই ফরিদপুর হতে সহসা ব্রাহ্মণ কান্দায় উপস্থিত হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস ও মহিমকে ডেকে পাঠালেন।

দুজনেই বুঝতে পারল, প্রভু তাদের সব কথা জানতে পেরেছেন। ভয়ে ও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

জগদ্বন্ধু শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, প্রকৃত বৈষ্ণবের ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছ তোমরা। শ্রীহরির চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করে হরিনাম করবে, সেখানেও অহংকার? আমি আশ্চর্য হয়েছি তোমাদের ধৃষ্টতায়। মনে রেখো তৃণের মত নীচ আর ফুলের মত নরম না হলে প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। এমন নীচ ও নম্র হয়ে চলবে যে সবাই তোমাকে পা দিয়ে দলে গেলেও একটা কথা বলবে না; প্রাণটা সব সময় থাকবে ফুলের মত কোমল।

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুজনেই অনুতপ্ত হয়েছে। দুজনেই প্রভুর পায়ের উপরে পা দুটো জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলল আমাদের অন্যায় হয়েছে প্রভু।

জগদ্বন্ধু খুশি হয়ে বললেন, এবার তোমাদের ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে এ রকম আর কখনো করো না।

প্রভুর কাছ থেকে দুজনে একসঙ্গে বাড়ী ফিরবার পথে মহিম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল হরিদাসকে, আচ্ছা হরিদাস, কাল রাত্রে কত দূরে আমরা ঝগড়া করেছিলাম। কেউ একথা প্রভুকে জানায়ও নাই। তবু কি করে তিনি বুঝতে পারলেন বল দেখি।

হরিদাস বলল, আমাদের প্রভু অন্তর্যামী। আমাদের মনের সব কথাই তিনি জানতে পারেন। আর একবার আমি হরিনাম করতে করতে একটি লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। প্রভু সেবারও জানতে পেরেছিলেন।

একদিন সকাল বেলায় হরিদাস তার বাড়ীতে হরিনাম করছিল। এমন সময় একজন লোক এল। লোকটি কাছে কিছু টাকা পেত হরিদাস। হরিদাস তাই কীর্তন থামিয়ে টাকার জন্য ঝগড়া করতে লাগল লোকটির সঙ্গে। তারপর লোকটি চলে গেলে কীর্তন গান শেষ করল। দিনকতক পর প্রভুর সঙ্গে দেখা হতেই প্রভু কঠোরভাবে তিরস্কার করতে লাগলেন হরিদাসকে। বললেন, তুই এত নীচ হরিদাস! হরিনামের থেকে টাকা তোর কাছে বড় হলো?

তাদের প্রভু সর্বজ্ঞ একথা তখন জানতে পারেনি হরিদাস। তাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল প্রভুর মুখ পানে। সে যখন ঝগড়া করেছিল লোকটির সঙ্গে তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। তবে কে বলল প্রভুকে এই ঝগড়ার কথা। হরিদাস ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, একথা আপনি কি করে জানলেন প্রভু? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

প্রভু জগদ্বন্ধু বলল, তোর ঘরে আমার যে ছবিটা টাঙানো আছে, আমি ছিলাম তারই মধ্যে। মনে রাখবি, হরিণাম আমার প্রাণ। তাই হরিনামে অনাদর করলে আমি প্রাণে বড় আঘাত পাই। মুখে হরিনাম করবি আর মনে বিষয় চিন্তা করবি, এর থেকে ভণ্ডামি আর কি হতে পারে হরিদাস?

হরিদাসের কাছ থেকে সব কথা শুনে অনুশোচনা তীব্র হয়ে উঠল মহিমের মধ্যে। হরিদাসকে নিয়ে আবার প্রভুর কাছে ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনি যদি সবই জানতে পারেন প্রভু, তাহলে আমাদের মনের দর্পকে কেন চূর্ণ করে দেন নাই?

জগদ্বন্ধু বললেন, তখন তোদের মন অহংকারে ভরা ছিল, সেখানে আমি ঢুকব কি করে?

হরিদাসও কেঁদে বলল, প্রভু আমি মহাপাতকী। আপনি আমায় একবার সাবধান করে দিলেও আমি আবার ভুল করেছি। হরিনামে অবহেলা করে অহংকারে মেতে উঠেছি।

জগদ্বন্ধু শান্ত ও ক্ষমাশীল কণ্ঠে বললেন, সত্যিই তোরা বড় অন্যাস করেছিস হরিদাস। গতকাল রাত্রে তোরা ঐভাবে হরিনাম বন্ধ করায় সারারাত আমি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করেছি।

হরিদাস ও মহিম আকুলভাবে কাঁদতে লাগল। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু।

শোনা যায়, প্রভু জগদ্বন্ধু মহিমকে এক টুকরো পাথর দিয়েছিলেন। যে কোন কীর্তনের আসরে মৃদঙ্গ বাজাতে যাবার আগে সেই পাথরটি ছুঁয়ে যেত মহিম। ফলে কেউ তাকে হারাতে পারত না। তার মৃত্যুর পর তার বংশধরেরাও এই পাথরটির বলেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৃদঙ্গবাদকরূপে নাম করেছিল।

শুধু গেরুয়া কাপড় পরলেই হলো না। গৈরিক ধারণ করলেই যদি সর্বত্যাগী বৈরাগী হওয়া যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। গৈরিক পরবার আগে তার অধিকার অর্জন করতে হবে। বাইরে শুধু কাপড়ে ত্যাগের ছোপ লাগালেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও সাত্ত্বিক ত্যাগের আদর্শে দীক্ষিত করতে হবে। কর্মফলের আশা ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ। কিন্তু তার জন্য সাধনা করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে।

কিন্তু অতুল চম্পটি নামক প্রভুর এক ভক্ত কোন সাধনা না করেই শুধু বৈরাগ্যের উচ্ছাসে গৈরিক পরতে শুরু করেছেন। অতুল বাবু আগে ছিলেন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রভু জগদ্বন্ধুর সংস্পর্শে

আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন শুধু কীর্তনগানই তাঁর একমাত্র কাজ। কিন্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় যে ত্যাগধর্ম মনে প্রাণে আয়ত্ত করতে হয় তা এখনো আয়ত্ত হয়ে ওঠেনি চম্পটির।

প্রভু জগদ্বন্ধু দিনকতক চম্পটিকে লক্ষ্য করে একদিন বললেন, আপনি গৈরিক পরেছেন কেন? গৈরিক পরবার অধিকার ত আপনার এখনো হয় নাই।

চম্পঠি বললেন, আমি এমনিই পরেছি, অধিকারের কথা ভাবি নাই।

প্রভু জগদ্বন্ধু বললেন, যাই হোক, আপনি শীঘ্র গৈরিক ত্যাগ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক ত্যাগ করে ধুতি পরলেন চম্পঠি। তারপর প্রভু জগদ্বন্ধু চম্পঠির উপর দিলেন টহল দেবার ভার। টহলব্রত হচ্ছে বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টহল গানের মূল উদ্দেশ্য হলো হরিনাম প্রচার। ঘুম হতে প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কানে যাতে হরিনাম প্রবেশ করে এবং সেই হরিনাম শ্রবণ করে হরির প্রতি পূর্বরাগ জন্মে শ্রোতার মনে তার জন্যই প্রভাতে পথে পথে কৃষ্ণনাম গান করে বেড়ান অনেক বৈষ্ণব সাধক।

রোজ ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করে কলকাতার পথে পথে রাধা মাধবের নাম গান করে বেড়ান চম্পঠি। একে একে সমস্ত অভিমান দূর হয়ে যায় মন থেকে। অন্তরে জাগে বৈষ্ণবীয় দীনতা, সেবাপ্রেমের আকুলতা। এরপর আরো কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রভু জগদ্বন্ধু চম্পঠিকে পাবনায় হারাণ ক্ষেপার কাছে কিছুদিন রেখে দেন। কারণ তিনি বলতেন উচ্চশিক্ষার অভিমান বংশগৌরব আত্মসম্মানবোধ অত সহজে মন হতে উৎপাটিত হতে পারে না।

হারাণ ক্ষেপা একজন শক্তিমান সাধক। বাইরে সে পাগল। স্থানীয় লোকেরা তাকে ক্ষেপা বলে ডাকে। প্রভু জগদ্বন্ধু আগে

পাবনায় থাকার সময় হতেই জানতেন। তার শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন।

প্রভুর মনের কথাটি জানতে পেরেই যেন সাধক হারাণ ক্ষেপা ধীরে ধীরে গড়ে তুকলেন চম্পঠিকে। পরিণত করলেন এক সাধক বৈষ্ণবে। চম্পটি ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু একদিন হারাণ ক্ষেপা তাঁকে এক চণ্ডালের বাড়ীতে গিয়ে তাদের উচ্ছিষ্ট ভাত খেয়ে আসতে বললেন। আবার চম্পঠি সত্যি সত্যিই তাঁর কথামত চণ্ডালের বাড়ী থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত খেয়ে এলে বাজারের সব লোকের সামনে তাঁকে অপমান করলেন। বললেন, বামুনের ছেলে হয়ে চণ্ডালের এঁটো খেতে লজ্জা করে না ?

কিন্তু অবশেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চম্পটি। সমস্ত লজ্জা মানে জলাঞ্জলি দিয়ে মনে প্রাণে তিনি হয়ে উঠলেন মুক্তপুরুষ। তারপর ফিরে এলেন প্রভুর কাছে।

মধুর রসের অন্তর্গত সমর্থারতির সাধনায় সিদ্ধপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু অন্তরে বাইরে দেহে মনে সব সময় নারীভাব আরোপ করে থাকতেন। ব্রজগোপীভাবে ভাবিত ছিল তাঁর আত্মা। সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—এই তিন রকমের 'মধুরা' রতির মধ্যে সমর্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কৃষ্ণরতি ভক্তহৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের তৃপ্তিসাধনই যার একমাত্র লক্ষ্য এবং যার প্রভাবে ভগবানও ভক্তের বশীভূত হন, যার কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যা, তাই হচ্ছে সমর্থা রতি। বৃন্দাবনে ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীদের রতি সমর্থা। এই সমর্থা রতি হচ্ছে 'সর্ববিস্মরিগন্ধা' 'সান্দ্রতমা'। অর্থাৎ এই রতি এমনিই গভীর যে ভক্তহৃদয়ের ধর্ম ধৈর্য লোক লজ্জাদি সব কিছু নিঃশেষে ডুবিয়ে দেয়।

সুদূর ছেলেবেলাতেই নিজের দেহটিকে প্রায়ই কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইতেন জগবন্ধু। আজকাল সেই প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে। একবার চম্পটি বিখ্যাত জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের

বাগান বাড়ীতে প্রভুর থাকবার ব্যবস্থা করেন। ভক্তদের কাছ থেকে প্রভুর কথা শুনে কালীকৃষ্ণবাবু নিজেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কিছু দান করেন।

বিরাট বাগানের মধ্যে একটি পাকা বাড়ী। তারই একটি নিরিবিলি ঘরে জগদ্বন্ধুর থাকবার ব্যবস্থা হলো। প্রভু কিন্তু ঘর হতে বার হন না। সকালে একবার গঙ্গাস্নান করে এসে সাদা কাপড়ে সারা দেহখানি ঢেকে মশারির ভিতর চুপচাপ সারাদিন বসে থাকেন। আর এক মনে হরিনাম শোনেন।

জমিদার বাড়ীর কয়েকজন কর্মচারির কিন্তু ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত লাগল। ভক্তরা যাকে প্রভু বলে তাঁকে কোন দিন তারা নিজের চোখে দেখতে না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হল। একদিন সকালে গঙ্গাস্নানের সময় ঘর হতে বেরোতেই দূর থেকে দেখে সুন্দরী তরুণী বলে মনে হলো প্রভুকে তাদের।

কথাটা কালীকৃষ্ণবাবুর কানে উঠল। আসলে ব্যাপারটা কতকগুলো ভণ্ড বৈষ্ণবের ছলনামাত্র। প্রভুর নাম করে একজন তরুণীকেই তারা লুকিয়ে রেখেছে। এইভাবে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে তাঁর কিছু টাকা খসিয়েছে।

কর্মচারিদের প্ররোচনায় একদিন কালীকৃষ্ণবাবু নিজে বাগান-বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখতে গেলেন। ব্যাপারটি কি তা নিজে না দেখেই প্রভুর ভক্তদের উদ্দেশ্যে অনেক কটু কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেখলেন, সত্যি সত্যিই মাশারির মধ্যে মাথা হতে পা পর্যন্ত একখানি সাদা কাপড়ে ঢেকে চুপচাপ বসে রয়েছেন প্রভু জগদ্বন্ধু।

কালীকৃষ্ণবাবু অনুতপ্ত হয়ে কাছে আসতেই জগদ্বন্ধু শুধু বললেন, কে রে, কালীকৃষ্ণ?

শান্ত কণ্ঠের এই কয়টি কথার মধ্যেই কালীকৃষ্ণবাবুর মনে হলো যেন অনেক কথা নিহিত আছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত

হয়ে ক্ষমা চাইলেন কালীকৃষ্ণবাবু। প্রভু কিন্তু আর কোন কথাই বললেন না।

কালীকৃষ্ণবাবু তাঁর কর্মচারিদের বলে দিলেন, প্রভুর যতদিন ইচ্ছা থাকবেন। যখন যা দরকার হতে তাই যেন তারা দেয়। তবু প্রভু সেখানে আর রইলেন না। সেইদিনই সেই বাগানবাড়ী হতে বিদায় নিলেন। আসবাব ও জিনিসপত্রের কোন অভাব না থাকলেও ধনী কালীকৃষ্ণবাবুর মধ্যে অহমিকা আর এক শোচনীয় আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তিনি যে প্রভুর সেবায় এই সব জিনিষ দান করছেন, এই ধরণের অহংকার ছিল তাঁর মনে। তাই এবার কোন গরীবের কুঁড়ে ঘরে উঠে যেতে চাইলেন জগদ্বন্ধু।

কলকাতাতেই রামবাগান অঞ্চলে একটি নোংরা বস্তীতে কুখ্যাত ডোমেদের বাস ছিল। তারা ছিল অজ্ঞ, অবহেলিত অভাবগ্রস্ত। তারা মদ খেত আর অন্যায় কাজ করত। লোকে তাদের ঘৃণার চোখে দেখত। এই ডোমেদের মধ্যে একজন সহসা ভক্ত হয়ে ওঠে প্রভু জগদ্বন্ধু।

প্রভু জগদ্বন্ধু সহসা স্থির করলেন, সেই ডোম পল্লীতে তাঁর ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন।

সেখানে গিয়ে প্রভু অন্যান্য ভক্তদের বলতে লাগলেন, ডোম পাড়ায় আমার এমন আপন জন থাকতে চম্পটি আমায় নিয়ে গিয়েছিল রাজার বাড়ীতে। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

বস্তীর পূতিগন্ধময় পরিবেশে যেখানে ভদ্র মানুষ বেশীক্ষণ টিকতে পারে না, প্রভু সেখানে অবলীলাক্রমে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলেন। অন্তরে বাইরে কিছুমাত্র নাই অসহিষ্ণুতা।

একদিন ভক্তরা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা প্রভু, এখানে থাকতে আপনার কোনরূপ কষ্ট হচ্ছে না?

প্রভু বললেন, সে কিরে, কষ্ট হবে কেন? যেখানে আছে ভক্তি

আর ভালবাসা, সেখানে কষ্ট থাকলেও কষ্টকে কষ্ট বলে কি মনে হয়? মনে রাখবি প্রেম ভক্তি না থাকলে স্বর্গ হয়ে ওঠে নরক আর প্রেমভক্তির জোরে নরক হয়ে ওঠে স্বর্গ।

প্রভুর সংস্পর্শে আসার পর হতে রামবাগানের ডোমেরাও সৎভাবে জীবন যাপন করতে লাগল। এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল তাদের মধ্যে। অনেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করল প্রভুর কাছে।

রামবাগানের ডোমপাড়ায় অনেক পতিতার বাস ছিল। এদের মধ্যে সুরতকুমারী ছিল সব চেয়ে ধনী এবং নাম করা। জগদ্বন্ধুকে চোখে না দেখেই তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠে সুরতকুমারী। তাঁকে দর্শন করার জন্য আকুল হয়ে ওঠে তার প্রাণ ও মন। এদিকে নারীমুখ বড় একটা দেখতে চান না জগদ্বন্ধু। অবশেষে একদিন সুরতকুমারীর অন্তরের রূপান্তর আর ভক্তির প্রগাঢ়তাকে অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। তার ভক্তি নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেবার জন্যই যেন প্রভু নিজে তার বাড়ী গিয়ে তাকে দর্শন দিলেন। সুরতকুমারী কাতর কণ্ঠে বলে, দয়া যদি করলে ঠাকুর, তাহলে তোমার ঐ পাদপদ্ম আমার মাথার উপর একবার রাখ।

দয়াপরবশ হয়ে জগদ্বন্ধু তাই করেছিলেন। কিন্তু একবারের বেশী আর দেখা দেননি সুরতকুমারীকে। পরে প্রভুর আদেশ মত নিয়মিত নাম জপ করতে করতে পরম ধার্মিক ও ভক্তিমতী হয়ে ওঠে সুরতকুমারী। প্রভু তার নূতন নামকরণ করেন সুরমাতা।

সাধারণ মানুষের দেহ হচ্ছে প্রাকৃত। তা সব সময়ই স্থান কালের অধীন। সাধারণ মানুষ নিজের দেহকে স্থান কাল হতে বিচ্ছিন্ন করে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁরা স্বেচ্ছাময়। তাঁরা ইচ্ছামত দেহমনকে বশীভূত করতে পারেন। তাঁদের দেহ অপ্রাকৃত, স্থান কালের

অধীন নয়। ইচ্ছা করলেই তাঁরা তাঁদের দেহকে স্থান কালের সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারেন মুহূর্ত মধ্যে।

প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন এমনি এক স্বেচ্ছাময় যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। অথচ তিনি কখনো কোথাও আত্মপ্রচারের মধ্যে কোন যোগবিভূতি প্রদর্শন করেননি। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, অহমিকাশূন্য নিরভিমান। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে তাঁকে তার যোগশক্তির পরিচয় দিতে।

একবার হুগলীতে পুলিশ প্রভু জগদ্বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। তিনি সব সময়েই সারাদেহ কাপড়ে ঢেকে রাখতেন। শুধু ঘরে নয়, বাইরে কোথাও যাওয়া আসা করার সময়ও এইভাবেই তিনি চলতেন। একদিন হুগলি শহরে একা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সারা দেহ কাপড়ে ঢাকা দেখে পুলিশ মনে করে কোন পলাতক আসামী পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য এমনিভাবে গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল।

জগদ্বন্ধু তাঁর নিজের প্রকৃত পরিচয় দেয়া দূরের কথা কোন কথাই বললেন না। তবে তাঁকে থানার হাজত ঘরে ঢোকাবার সময় তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন তিনি। তিনি থানাঘরে বা কারো বাড়ীতেই রাত্রিবাস করবেন না। তবে কোন গরুর গোয়াল পেলে সেখানে থাকতে তাঁর আপত্তি নাই। তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আটক থাকতেই হবে।

অবশেষে ঠিক হলো হুগলীর নাজীরের গোশালায় তাঁকে রাখা হবে।

গোশালা মানে ইটের পাকা ঘর। ভাল মজবুত দরজা। ভাল তালা লাগানো হলো। চাবি রাখা হলো নাজীরের কাছে।

ঘরে ঢোকার আগেই কোন একটি লোককে দিয়ে কলকাতায় সুরমাতার ঠিকানায় একটি টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন জগদ্বন্ধু।

রাত্রির মত সেখানে আটক রাখার পর আবার কোথায় তাঁকে নিয়ে যাবে কে জানে।

কিন্তু পরদিন সকালে গোশালার তালা খুলে নাজীর ও পুলিশের লোক দেখল তাদের বন্দী সেখানে নাই। এতবড় আশ্চর্য ঘটনা জীবনে কখনো দেখেনি তারা। আগের দিন নজীরের সামনে তালাবন্ধ করে সেই চাবি নাজীরের হাতে দিয়েছে। সেই চাবি নাজীর ক্ষণেকের জন্যও হাতছাড়া করেনি। তবু কিভাবে এই অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হলো তা তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। নাজীর পড়ল মহামুস্কিলে। কারণ তার জিম্মা হতে বন্দী পালালে চাকরি যাবে। চারিদিকে বদনাম রটবে।

এমন সময় কলকাতা হতে সুরমাতা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে করে হুগলিতে এসে হাজির হলো। তারা এসে নাজীরকে প্রভুর. প্রকৃত পরিচয় দান করে। তারা বলল, জগদ্বন্ধু এমনি করে স্বাধীনভাবে.সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। কেউ তাঁকে কোথাও ধরে রাখতে পারবে না। তিনি যোগী পুরুষ, ইচ্ছা করলেই নিজের দেহটিকে অতিসূক্ষ্ম ও লঘু করতে পারেন। তিনি পুন্যবান মহাসাধক। তাঁর থেকে নাজীরের কোন ক্ষতিই হবে না।

পরে সত্যি সত্যিই ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়। এইভাবে সাধারণ মানুষের সকল সন্ধানী বুদ্ধিও বাস্তব জ্ঞানের সীমাকে উপহাস করে সাধকদের যোগশক্তি আত্মপ্রকাশ করে মাঝে মাঝে। বিস্মিত ও বিমূঢ় করে দেয় মানুষের চেতনাকে। অণিমা রূপ যোগবিভূতির বলে যোগীরা শরীরটিক ইচ্ছামত ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম করতে পারেন। দেহটাকে ইচ্ছামত অতি সূক্ষ্ম করে যত্রতত্র যাতায়াত করতে পারেন। সেদিন হুগলিতে নাজীরের গোশালা হতে এই যোগশক্তির বলেই ইন্দ্রজালিকভাবে অন্তর্হিত হয়েছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু।

আর একবার একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

একদিন অতুল চম্পটিকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাবার জন্য কলকাতা হতে রওনা হলেন। সঙ্গে টাকা নাই। প্রকৃত বৈষ্ণবের কোন সঞ্চয় থাকবে না। যেখানে থেকে যা কিছু আসে খরচ হয়ে যায় তাই সঙ্গে সঙ্গে। হাওড়া ষ্টেশনে এসে প্রভু চম্পটিকে টাকা না দিয়েই টিকিট আনতে বললেন। প্রভুর হাতে যেমন টাকা থাকে না, চম্পটিও তেমনি কোন কিছু সঞ্চয় করেন না। এত টাকা কোথায় পাবেন তিনি।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাত্রির ট্রেন। চম্পটি ভয়ে ভয়ে বললেন, এত রাত্রে এই টিকা কোথায় পাব প্রভু?

প্রভু শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, তুমি চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই কোন গৌরভক্ত দেবে।

প্রভু আর কোন কথা বললেন না। চম্পটিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লেন নীরবে।

যেখানে যেখানে পরিচিত লোক ছিল চম্পট একে একে সেখানে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও টাকা পেলেন না। অবশেষে হতাশ মনে ফিরবার পথে বিডনস্কোয়ারে এসে একবার থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন তিলককণ্ঠী-ধারী এক বৈষ্ণব তাঁর দোকান বন্ধ করছেন।

চম্পটি ব্যস্ত হয়ে তাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি গৌরভক্ত?

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, গৌরের ভক্তি পেয়েছি কি না জানি না, তবে গৌরকে আমি ভক্তি করি।

চম্পটি তখন প্রভু জগদ্বন্ধুর পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বললেন। লোকটি তখন বললেন, আমার দোকানের তহবিলে অত টাকা ত হবে না।

চম্পটির তখন গভীর বিশ্বাস জেগেছে মনে। প্রভুর কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। তিনি যখন গৌরভক্তের দেখা পেয়েছেন তখন টাকাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাঁর কাছে।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা।

চম্পটি বললেন, পঞ্চাশ টাকা আট আনা।

লোকটি তহবিল গণে দেখলেন তহবিলে ঠিক ঐ পরিমাণ টাকাই রয়েছে। তার কমও নাই, বেশীও নাই। লোকটি তখন আশ্চর্য হয়ে প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে টাকাগুলি চম্পটিকে দিলেন। লোকটির নাম মুকুন্দ ঘোষ। পরে ইনি প্রভু জগদ্বন্ধুর এক পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

আপন অধ্যাত্মসাধনার সুরভিতে আপনি মগ্ন থাকতে চান প্রভু জগদ্বন্ধু। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়া সে সুরভি বাইরে আর কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু সে সুরভির উচ্ছাসকে যতই চেপে রাখবার চেষ্টা করুন ঘরের মধ্যে, ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে দূর দূরান্তে। সে সুরভির বিন্দুমাত্র পরিচয় পেয়েই তার মাধুর্যে আত্মহারা হয়ে অজস্র মুমুক্ষু মানুষ ভীড় করতে থাকে প্রভুর চারিদিকে। যিনি শুভ্র শুদ্ধ পট্টবস্ত্রে নিজের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রেখে সবার অলক্ষ্যে অগোচরে থাকতে চান, তাঁকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে ছুটে আসে সবাই। কী অদ্ভুত তাঁর আকর্ষণ।

ফরিদপুর ও ব্রাহ্মণকাঁন্দার কীর্তন অঙ্গনে যে হরিনাম অনুষ্ঠিত হয় তার সুরে সুরে শুধু পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাসই প্লাবিত হয় না। সুদূর পশ্চিমবঙ্গেও সে সুরের ঢেউ এসে লাগে।

চুঁচড়োর অন্নদা দত্ত একজন পরম গৌরভক্ত, নিষ্ঠাবাণ বৈষ্ণব। মাঝে মাঝে তিনি যোগাবিষ্ঠ হয়ে অনেক দূরের কথা বলে দিতে পারতেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার

ঘোষ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি ভক্তগণ অন্নদাবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন।

একদিন অন্নদাবাবু ধ্যানাবিষ্ট হয়ে বললেন, পূর্ববঙ্গে ফরিদপুরে এক বৈষ্ণব মহাসাধকের আবির্ভাব হয়েছে। পরম রূপলাবণ্যময় দিব্যকান্তি। সর্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন। ব্রজগোপী ভাবে ভাবিত আত্মা কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর। তিনি বাইরে আসতে চান না। সবার আড়ালে থেকে হরিনাম প্রচার করতে চান সারা দেশে। কালই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। স্টীমারযোগে কাল তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করবেন। সুতরাং একবার খোঁজ করলেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। লক্ষ মানুষের ভীড়ের মাঝেও বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না সেই দিব্যকান্তি মহাপুরুষকে চিনতে।

অন্নদাবাবুর কথামত পরের দিন সত্যিই স্টীমারে দেখা পাওয়া গেল প্রভু জগদ্বন্ধুর। নিজেকে তিনি চেনা দিতে না চাইলেও তাঁকে চিনে নিতে দেরী হলো না। মহাত্মা শিশির-কুমার, মহেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলেন প্রভুর চরণে।

এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে শিশিরকুমার প্রভু জগদ্বন্ধুর মহিমা সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রচার করেন। আত্মপ্রচারে চিরপরাঙ্মুখ প্রভু একথা শুনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। তিনি ভক্তদের বলেন, তোরা শিশিরকে নিষেধ করে দিস আমাকে যেন এভাবে বিপদে না ফেলে। 'দেখা দাও, 'দেখা দাও' বলে অজস্র লোক তাহলে আমার জ্বালিয়ে খাবে। সূর্যের মতই সকল অধ্যাত্মসাধনার জ্যোতি হচ্ছে স্বপ্রকাশ, সূর্যের উদয় হলে যেমন জগতের লোক তা দেখতে পায়, তেমনি কোন অধ্যাত্মসাধনা পূর্ণতা লাভ করলে তা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে লোক সমক্ষে। তার জন্য ঢাক পেটাতে হয় না এমন করে।

এই সময় প্রেমানন্দ ভারতী নামে এক সন্ন্যাসীকে কলকাতায় এক জায়গায় আবিষ্কার করেন অন্নদাবাবু। প্রমানন্দ ভারতী ছিলেন

জ্ঞানমার্গের সাধক। পরণে গেরুয়া কাপড়, মাথায় দীর্ঘজটা। কাশীর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধুকে চোখে না দেখেই তাঁর কথা কানে শুনেই তাঁর প্রেমভক্তিবাদের সাধনা শুরু করে দেন মনে মনে। মনের মধ্যে ব্রজসখীভাবে আনবার চেষ্টা করেন।

কলকাতায় অন্নদাবাবু প্রেমানন্দ ভারতীকে আবিস্কার করার পরই তাঁকে জগদ্বন্ধুর কাছে নিয়ে যান। মাথা মুণ্ডন করিয়ে গেরুয়া কাপড় ছাড়িয়ে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করান। এবার হতে হরিনাম প্রচারই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ব্রত।

কলকাতা হতে আবার বৃন্দাবন। বৃন্দাবন যাবার আগে একবার নবদ্বীপ ঘুরে আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে চৈতন্য অনুসারী ভক্তিবাদকে এক চরম পরিণতি দান করেন প্রভু জগদ্বন্ধু। গৌরাবতারের তাৎপর্যটি চৈতন্যোত্তর যুগে তাঁর মত আর কেউ যেন বুঝতে পারেননি। বঝলেও আপন জীবনে মেনে চলতে পারেননি।

চৈতন্যচারিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন রাধা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি। একদিন দুজনে এক ছিলেন; পরে দেহভেদে দুই হয়েছিলেন। এখন এই 'দুই' চৈতন্য নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্যে প্রকটিত হয়েছেন। রাধার ভাবকান্তিযুক্ত সেই কৃষ্ণস্বরূপকে নমস্কার। কলিযুগে কৃষ্ণের প্রেমস্বভাবকে নূতন ভাবরূপে আস্বাদন করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব চেতনার পক্ষে রাধাকৃষ্ণলীলা-রস উপলব্ধি করবার একমাত্র উপায় হলো গৌরভক্তি।

বিশুদ্ধ ভক্তি বা কেবলারতির জন্য বৈষ্ণবদের নিষ্ঠা ও অভ্যাসের সঙ্গে সাধনা করতে হয়। এর জন্য শ্রবণ, কীর্তন ও সাধুসঙ্গ দরকার। সার রতিচর্চার প্রথম সোপান হচ্ছে আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। সর্বেন্দ্রিয় বলতে চোখ, কান প্রভৃতি

জ্ঞানেন্দ্রিয় বা হাত পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় নয়। মনবুদ্ধি অহংকার প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্রকেও বোঝায়।

দেহমন প্রাণের ঐকান্তিকী ভক্তি সাধনার সিদ্ধির নাম প্রেম। বৈষ্ণবদের রাধা হচ্ছেন এই মূর্তিমতী সিদ্ধি। রাধা হচ্ছেন মহাভাবরূপ প্রেম।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

কিন্তু প্রেমসিদ্ধিস্বরূপিণী রাধার প্রেমকে নিজের সাধ্য বলে মনে করতে পারেন না কোন বৈষ্ণব। নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ প্রেমের অনুসরণ করে যথাসম্ভব আস্বাদন করবার চেষ্টা করেন মাত্র।

প্রভু জগদ্বন্ধু বলতেন' আমি ত চাহি না রাধা হতে, হব রাধার পরাণপ্রিয়া।

সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, রাধাপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করতে স্বয়ং কৃষ্ণও পারেননি। সেই স্বরূপকে ভালভাবে বোঝবার জন্যই কৃষ্ণকে নরদেহ ধারণ করতে হয়েছিল। দেহ মনের ভিন্নতার জন্য কোন প্রেমিক কখনো তাঁর প্রেমাস্পদের প্রেমের প্রকৃত স্বরূপকে ঠিকমত বুঝতে পারেন না। তিনি শুধু নিজের প্রেমের কথা বা ভোগানন্দের কথাই বলতে পারেন। তিনি কখনো জানতে পারেন না তাঁকে ভোগ করে তাঁর প্রেমিকা কতখানি আনন্দ লাভ করেন।

রাধার প্রণয় মহিমা স্বয়ং কৃষ্ণও জানতে পারেননি। রাধার প্রণয় মহিমা কেমন, তাঁকে অনুভব করে রাধার কতখানি সুখবোধ হয় তা জানবার জন্যই কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে দ্বাপরের কৃষ্ণ হয়ে ওঠে কলিযুগের চৈতন্য।

এসব তত্ত্ব সাধারণ লোকে জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারে না। কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে এসব উপলব্ধি করতে হয়।

তাই প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তদের কেবল ভক্তির উপর জোর দিতে বলতেন। একবার প্রভু যখন বৃন্দাবনে বাস করছিলেন তখন এক ভক্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও ব্রজগোপীভাবের তত্ত্ব বুঝতে না পেয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন প্রভুকে।

সহজ কথায় প্রভু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে বললেন, এসব কথা তুই এত সহজে বুঝবি না। এর জন্য বহু সাধনার দরকার। গোপীভাবের একটু আভাস পেতেই সাধক কবি বিদ্যাপতির ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গিয়েছিল। এখন তোকে সে তত্ত্ব বললে ধারণা করতে ত পারবি না; বরং ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে মারা যাবি। এখন তুই হরিনাম করে যা, সময়ে সব বুঝতে পারবি।

এবার বৃন্দাবনে বাসকালে অনেক লীলা প্রদর্শন করেন জগবন্ধু। তাতে তাঁর নাম বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন শেঠের মন্দিরে পালাকীর্তন শুনতে শুনতে সহসা মূর্ছিত হয়ে পড়েন জগদ্বন্ধু। সকলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে, দেহের মধ্যে একেবারে প্রাণের ক্ষীণতম আভাসটুকু পর্যন্ত নাই।

ভক্ত বনমালী রায় তাঁকে চিনতেন। তিনি রাধাবিনোদ কুঞ্জে প্রভুকে নিয়ে যান। সেখানেই প্রভু জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার অন্যত্র চলে যান।

শ্রীকুঞ্জ তীরে অবস্থিত বনমালী রায়ের বিগ্রহ দেবতা রাধাবিনোদর কুঞ্জটি বড় চমৎকার। কাছেই মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের কাছে একটি মাটির কুটিরে প্রভু জগদ্বন্ধু বাস করতেন। শ্রীকুঞ্জ দিয়ে রোজ একবার করে বেড়াতে আসবার সময় বনমালীবাবু প্রভুর সংগে দেখা করতেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু উপদেশ বাণী শোনার পর আবার ফিরে যেতেন।

একদিন এক অদ্ভুত কথা বললেন জগদ্বন্ধু।

প্রভু বললেন, আগামী কাল এক মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন।

বনমালীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে সে মহাপুরুষ প্রভু?

অদূরে একটি পুরনো বিশাল তেঁতুল গাছ দেখিয়ে প্রভু বললেন, উনিই সেই মহাপুরুষ।

বনমালীবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রভুর কথায় কোন সন্দেহ জাগল না মনে। কারণ এর আগেই তিনি প্রভুর কাছে শুনেছেন, অপ্রাকৃত ধাম এই বৃন্দাবন। এখানকার অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা দর্শনের জন্য বহু মহাপুরুষের আত্মা বৃক্ষরূপ ধারণ করে অবস্থান করছেন।

পরদিন সকাল হতেই প্রভুর নির্দেশমত সেই তেঁতুল গাছটিকে ঘিরে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হলো। দুপুরের দিকে দেখা গেল, সেই বিশাল গাছটি অজস্র লোকের সামনে ভেঙ্গে পড়ল।

সেদিন এই ঘটনা উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। সকলে নিজের চোখে এই ঘটনাটি দেখে। এরপর থেকে প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। মাধবদাস, শ্যামদাস, মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস ও তাঁর শিষ্য জয়দীশবাবা প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণ প্রভু জগদ্বন্ধুর শক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেন। প্রভু তরুণ বয়সে সাধনায় যে সিদ্ধি লাভ করেছেন তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান সকলে।

তাঁর যোগবিভূতি কাউকে দেখাতে চাইতেন না প্রভু জগদ্বন্ধু। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে হঠাৎ এমনিই দেখে ফেলেছে।

প্রভু জগদ্বন্ধু তখন বৃন্দাবনের কুসুম সরোবরের পারে একটি মাটির ঘরে থাকতেন। একদিন মথুরার ডাক্তার প্রমথ স্যান্যাল কয়েকজন লোক নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু একটি অলৌকিক ঘটনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন তাঁরা।

তাঁরা দেখলেন, প্রভু জগদ্বন্ধু ঘরের মধ্যে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তাঁর পিছনে একটি বিষধর সাপ ফণা তুলে আছে।

ভক্তরা ভীত হয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, উনি ওখানে আগে হতেই ছিলেন, আমি তা জানি। আমি ওঁর অতিথি। উনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

ভক্তদের ভয় তবু যায় না। প্রভু জগদ্বন্ধু তখন বললেন, উনিও একজন পরম ভক্ত। তবে আপনাদের ভয় যদি না যায় তাহলে উনি নিশ্চয়ই অন্যত্র সরে যাবেন।

সেইদিনই সাপটি কোথায় চলে গিয়েছিল; আর সে ঘরে কখনো আসেনি। কেউ তাকে সেখানে আর দেখতে পায়নি।

সাপের মত হিংস্র প্রাণীকে হরিপ্রেমের মহিমা বুঝিয়ে কিভাবে তাকে এক পরম ভক্ত করে তুলেছিলেন এবং কেমন করেই বা তাকে নিয়ে একঘরে দিনরাত থাকতেন তা ভেবে না পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইল ভক্তেরা। তাদের সে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে অনেক সময় লেগেছিল।

আর একদিন ভক্ত শ্যামদাস একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। একদিন বৃন্দাবনের একটি বনের ধারে শ্যামদাস কিছুদূর হতে দেখলেন, এক জায়গায় প্রভু জগদ্বন্ধু শুয়ে রয়েছেন আর একদল গরু তাঁর কাছে গিয়ে নাক দিয়ে শুঁকে তাঁর দেহের সুগন্ধ অনুভব করছে আরে মাঝে মাঝে তাঁর দেহটি জিব দিয়ে চাটছে। প্রভু নীরবে শুয়ে রয়েছেন আর মুখে শুধু কৃষ্ণনাম করছেন।

আর একদিন আর একটি অদ্ভুত অলৌকিক দৃশ্য দেখেন শ্যামদাস। প্রভু জগদ্বন্ধুর অণিমা ও মহিমা রূপ যোগ বিভূতির চাক্ষুস পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যান শ্যামদাস। সেদিন সকালের দিকে শ্যামদাসকে সঙ্গে নিয়ে কুসুম সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। প্রভু জলে স্নান করতে নামলে শ্যামদাস তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্যামদাস সহসা দেখলেন জলে

স্নান করতে করতে চোখের সামনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন প্রভু। তাঁর জায়গায় একটি ছোট ছেলে জলকেলি করছে। আবার কিছুক্ষণ পর শ্যামদাস দেখলেন, দীর্ঘ বিরাট জ্যোতিপুঞ্জ সমন্বিত এক এক পুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তা দেখে ভীত হয়ে উঠলেন শ্যামদাস।

কুটিরে গিয়ে শ্যামদাস প্রভুকে বললেন, আজ আপনার প্রকৃত স্বরূপ দেখলাম।

প্রভু মৃদু হেসে বললেন, ওটা কি স্বরূপ রে? দেহটাকে ইচ্ছামত বড় করা যায়, ছোটও করা যায়।

আর একদিন প্রভু জগদ্বন্ধু যে কুটিরে থাকতেন তার উঠোনে আকাশ থেকে এক গুচ্ছ চন্দনমাখা তুলসী পাতা পড়ে। কেউ কোথাও আশে পাশে নাই। সহসা শ্যামদাস দেখলেন একটি একটি করে তুলসী পাতা ঝরে পড়ছে শূন্য থেকে।

এইভাবে প্রভুর বহু ভাবলীলা বৃন্দাবনের ভক্তরা দেখে ধন্য হল।

বৃন্দাবনে থাকাকালে প্রভু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বনে, কখনো নদীতীরে, কখনো মাঠে কি যেন খুঁজে বেড়াতেন তিনি। তবে যেখানেই যেতেন কাপড়ে সারা দেহটি ঢেকে ঘোমটা মাথায় যেতেন। তাই দেখে বৃন্দাবনবাসীরা তাঁকে বলত, 'ঘোমটাওয়ালী'। তাঁর এই গৌরনাগরপ্রিয়া ভাবের সাধনা আলোড়ন এনে দেয় বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে।

গৌরনাগরপ্রিয়া ভাবের সাধনার প্রথম প্রবর্তন করেন ভক্ত-কবি নরহরি সরকার খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে। নাগরী ভাবে শ্রীচৈতন্যস্বরূপের আস্বাদনের পথ তিনিই প্রথমে দেখান। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বৈষ্ণবরা সকলেই নাগরী। বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ তথা কৃষ্ণাবতার গৌরচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ আর সব জীব তাঁর কান্তা। ব্রজগোপীগণ বৃন্দাবনে একদিন যেভাবে

শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করেছিলেন, গৌরনাগরীগণও সেই ভাবে ভাবিত হয়ে গৌরলীলা আস্বাদন করতে চান।

গৌরগতপ্রাণ প্রভু জগদ্বন্ধুর এই সাধনতত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠে বৃন্দাবনের ভক্তসমাজ।

ভারতী মহারাজকে আমেরিকা যাবার নির্দেশ দিয়ে নবদ্বীপ দিয়ে আবার ফরিদপুরে ফিরে যাবার মনস্থ করেন জগদ্বন্ধু।

গৌরাঙ্গের লীলাভূমি নবদ্বীপে গেলেই দিব্য ভাবের এক আবেশ জগত তাঁর দেহে মনে। বৃন্দাবনের মত নবদ্বীপেও এখানে সেখানে একা একাই ঘুরে বেড়াতেন প্রভু। ভাবের আবেশ মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলেই পথে যেতে যেতেই কোন একটি নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়তেন। কিন্তু যেখানেই থাকতেন, তাঁর দিব্য রূপলাবণ্যের ছটায় জায়গাটি উজ্জ্বল হয়ে থাকত। তাঁর দেহের অলৌকিক সুগন্ধে আমোদিত হয়ে থাকত চারিদিক।

একদিন বিকালের দিকে নবদ্বীপের বাইরে শ্মশানের কাছে একটি ঝোপের ধারে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শুয়ে ছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু।

হঠাৎ নবদ্বীপের শিতিকণ্ঠ পণ্ডিত সেখানে গিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করলেন।

গৌরভক্ত পরম বৈষ্ণব দীননাথ পণ্ডিতের ছেলে শিতিকণ্ঠ পণ্ডিত তখন সাধন ভজনের দিক থেকে নবদ্বীপে খুব নাম করেছে। বাড়ীতে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করে একটি স্থায়ী হরিসভারও প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তবু শিতিকণ্ঠর মন কিছুতে ভরছে না। এতকাল এত নিষ্ঠার সঙ্গে ভজনা করে আসছেন তবু ত গৌরাঙ্গের মনোহর মূর্তির অপ্রাকৃত দর্শন একটি বারের জন্যও লাভ করতে পারলেন না।

এমন সময় সেদিন ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা পেলেন প্রভু জগদ্বন্ধুর। দেখলেন প্রাক সন্ধ্যার ছায়া ছায়া অন্ধকারে

দিব্যজ্যোতিমণ্ডিত এক মহাপুরুষ মাটির উপর শুয়ে রয়েছেন। এতদিনের বুকজোড়া অন্ধকারের মাঝে আজ হঠাৎ আলো খুঁজে পেলেন শিতিকণ্ঠ। এ যেন চিরবাঞ্ছিত চাওয়ার ধন। এ ধন লাভ করবার জন্য যেন মনে প্রাণে সাধনা করে আসছেন আকুলভাবে।

প্রভুকে এইভাবে দেখে ভক্তকবি গোবিন্দ দাসের একটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের কথা মনে পড়ে গেল শীতিকণ্ঠর। প্রভুকে দেখে যেন সত্যিই কিশোর বয়স্ক গৌরাঙ্গদেব বলে মনে হচ্ছে। গৌরাঙ্গের মত তিনিও জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ। এক স্বর্গীয় পুলকের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে সারা অঙ্গে। কত সুগঙ্গা ঝরে পড়ছে নয়ন হতে। তাঁর হেমবর্ণের দেহগাত্রের লাবণ্য চাঁপা শোণ ফুল ও স্বর্ণ গিরিকে পরাজিত করেছে। সে সৌন্দর্যের সত্যিই অনুভব করা যায় না।

শিতিকণ্ঠকে চেনেন না প্রভু জগদ্বন্ধু। কখনো দেখেননি। তার কথাও শোনেননি। তবু তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চির পরিচিতের মত স্নেহমধুর কণ্ঠে ডাকলেন, শিতিকণ্ঠ!

শিতিকণ্ঠও যেন এই ডাকটির জন্য কত যুগ ধরে প্রতীক্ষা করছিল। তাই শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

কিছুতেই ছাড়লেন না শিতিকণ্ঠ। প্রভুকে সঙ্গে করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দেখা যখন হলো তখন তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে। তাছাড়া তাঁদের গুরুবাক্য মিথ্যা হবার নয়। অয়েক দিন আগেই তাঁদের দীক্ষা গুরু নেহানদাস বাবাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁদের এই হরিসভায় এক বিখ্যাত মহান বৈষ্ণবসাধক একদিন পদার্পণ করবেন।

শিতিকণ্ঠ পণ্ডিতের হরিসভায় সেদিন প্রভু জগদ্বন্ধু যেতেই

আনন্দের এক বিরাট আলোড়ন শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। প্রভুকে কেন্দ্র হরিনাম সংকীর্তন হতে লাগল রাত্রিদিন। বহু পরিচিত অপরিচিত ভক্তের দল এসে যোগদান করল তাতে।

দেখতে দেখতে নবদ্বীপের এই হরিসভাটি প্রভু জগদ্বন্ধুর এক সাধক পীঠে পরিণত হলো। এর পর থেকে নবদ্বীপে যখনি আসতেন, তিনি এখানে এসেই উঠতেন এবং এখান থেকে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সাধন ভজনের নির্দেশ দিতেন।

এই সময় ভক্তেরা প্রভু জগদ্বন্ধুর দুই একটি অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করবার জন্য নামতে গিয়ে প্রভু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সঙ্গে ছিল ভক্ত নবদ্বীপদাস। নবদ্বীপদাস কাছে আসতেই প্রভু বললেন, তুই এখনি বড়াল ঘাটে ছুটে যা। সেখানে এক বৈষ্ণব গঙ্গার জলে ডুবে আত্ম-হত্যা করতে যাচ্ছে। তার নাম বালকৃষ্ণ। তুই তাকে আমার কথা বলবি। বলবি, এভাবে আত্মহত্যা করতে আমি তাকে নিষেধ করেছি।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের স্বল্প আলোয় পথ দেখে ছুটে যেতে লাগলেন নবদ্বীপদাস। বালকৃষ্ণের জীবন রক্ষা করতেই হবে। বড়াল ঘাটে গিয়ে নবদ্বীপ-দাস দেখলেন, সত্যিই একজন লোক ধীর পদক্ষেপে গঙ্গার ঘাটে সিড়ি বেয়ে নেমে চলেছেন। তাঁকে কোনদিন দেখেননি নবদ্বীপ-দাস। তাঁর নামও শোনেননি। প্রভুও কোনদিন দেখেননি। অথচ কতদূর থেকে এই ঘটনাটি নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রভু। তার জীবন রক্ষার জন্য তাঁর কী আকুতি! যেন কত আত্মীয়।. যেন কতকালের পরিচিত।

নবদ্বীপদাস জোর গলায় বালকৃষ্ণের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

বালকৃষ্ণ ফিরে চাইতেই নবদ্বীপদাস বললেন, প্রভু তোমাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

বালকৃষ্ণ অবাক বিস্ময়ে নবদ্বীপদাসের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর আত্মহত্যা করবার গোপন ইচ্ছার কথা তিনি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কে সে প্রভু? তিনি কি তাহলে সত্যিই অন্তর্যামী?

নবদ্বীপদাস বললেন, আমাদের প্রভু হচ্ছেন অন্তর্যামী। তিনি এক জায়গায় অবস্থান করে বিভিন্ন জায়গার ভক্তদের মনের কথা সব বলে দিতে পারেন। তাঁরই আদেশে আমি তাঁর প্রাণরক্ষা করবার জন্য ছুটে এসেছি।

নবদ্বীপদাস শান্ত ও সহানুভূতিশীল কণ্ঠে বললেন, কিন্তু ভাই, তুমি একজন পরম বৈষ্ণব হয়ে কেন তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে? এ প্রাণ যখন কৃষ্ণে অর্পণ করেছ তখন এ প্রানে তোমার ত অধিকার নাই।

প্রভুপাদে বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য বালকৃষ্ণ সত্যই একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁর সাধন ভজনে কোন ত্রুটি নাই তবে তাঁর একমাত্র দুঃখ তিনি আজো পর্যন্ত তাঁর পরাণসখা কৃষ্ণের দেখা পেলেন না। বালকৃষ্ণ নিবিড় অভিমানভরা কণ্ঠে কেঁদে বলে উঠলেন, কত সাধন ভজন করছি তবু আমার প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি না। তা যদি না পাই তবে এ জীবন রেখে কি লাভ বলতে পার?

নবদ্বীপ দাস হেসে বললেন, সেকি ভাই কৃষ্ণের দেখা পাওয়া কি এতই সহজ? মহাভাবময়ী প্রেমসিদ্ধি স্বরূপিনী রাধার অপ্রাকৃত প্রেম কোন জীবের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। রাধার পক্ষে যা সাধ্য আমাদের তার জন্য বহু সাধনা করতে হয়। তাই কৃষ্ণকে পেতে হলে আগে রাধার কৃপা লাভ করতে হবে। আমাদের প্রভু তাই বলেন, আমি ত চাহি না রাধা হতে হব রাধার পরাণপ্রিয়া।

সেই দিনই প্রভু জগদ্বন্ধুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন বালকৃষ্ণ। দীক্ষালাভ করলেন ব্রজগোপীভাবের সাধনায়। প্রভু তাঁর নূতন নামকরণ করলেন, ব্রজবালা। বালকৃষ্ণ আজ উপলব্ধি করলেন, মনে প্রাণে নারীভাবে ভাবিত না হলে মন থেকে অহংভাব যায় না। অহংভাব না গেলে ঠিকমত আত্মসমর্পণ হয় না। আর আত্ম সমর্পণ না হলে ইষ্টদেবতালাভ হয় না।

ইষ্টদেবতার দেখা না পেয়ে অভিমানে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বালকৃষ্ণ। কিন্তু আজ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আগেই যদি আত্মাকে সমর্পণ করে থাকেন ইষ্টদেবতার চরণে তাহলে সে আত্মাকে হত্যা করবার অধিকার কোথায় তাঁর। তাছাড়া ইষ্টদেবতাকে দেখতে না পাওয়ার যে অভিমান তার মধ্যেও অহংকারের বীজ লুকিয়ে আছে। সাক্ষাৎ দেবদর্শনের সংগে সংগে 'আমি তাঁকে দেখেছি, মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছি, আমি আর পাঁচজন হতে পৃথক'—সাধকের মনে এই ধরণের অহংকার জমে। কিন্তু সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইষ্টদেবতার সংগে একাত্মতা লাভ এবং অন্তরে বাইরে সর্বত্র সর্বভূতে তাঁর স্বরূপকে প্রতিফলিত দেখাই হলো প্রকৃত শক্তিমান সাধকের কাজ। বরং কোন এক বিশেষ মূহূর্তে কোন এক বিশেষ মূর্তিতে তাঁকে দেখার অর্থই হলো তাঁকে খণ্ড করে দেখা।

প্রভু জগদ্বন্ধু সেদিন কত সহজে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন বালকৃষ্ণকে। এইভাবে মনুষকে এক মুহূর্তেই আপন করে নিতে পারতেন প্রভু। যারাই তাঁর কাছে আসত তিনি তাদের উপদেশ দিতেন ও সাধন ভজনের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু কাউকে কখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা দিতেন না। তিনি বলতেন, মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কাণে, আর জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

বলতেন, হরিনামই আমার একমাত্র মন্ত্র। সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করে হরিনাম কর। সেই জগৎগুরুর ধ্যানে বিভোর হয়ে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর একদিন রাধিকা গুপ্ত নামে এক কিশোর ভক্ত সংসার ত্যাগ করে প্রভুর ফরিদপুরের আশ্রমে এসে উঠল। দেখতে দেখতে হরিনামে মত্ত হয়ে উঠল রাধিকা। তার ভক্তিনিষ্ঠা দেখে প্রভু তাকে গ্রহণ না করে পারলেন না। বহুদিন আগে বৃন্দারণের রাধাবাগে একদিন রাধার সাক্ষাৎ দর্শন লাভের পর থেকে মুখে রাধানাম উচ্চারণ করেন না প্রভু। তাই রাধিকাকে শারিকা। বলে ডাকেন। পরে রাধিকার নূতন নাম দান করেন, রামদাস এবং সাধন ভজনের জন্য বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেন তাকে।

প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রেমধর্ম ও নামকীর্তনের প্রবল ধারাটি ফরিদপুর ও ব্রাহ্মণকান্দাকে ভাসিয়ে এবার ঢাকা শহরটিকে প্লাবিত করতে লাগল। সমস্ত পূর্ববঙ্গে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে জগদ্বন্ধুর নামকীর্তনের আদর্শ এর আগেই ছড়িয়ে পড়েছে। এবার পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা শহরটি পরিণত হয়ে উঠল হরিনাম সংকীর্তনের এক মহা কেন্দ্রস্থলরূপে। বহু মুসলমানও তাঁকে দর্শন করবার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসত। যে সব ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকরা একদিন জগদ্বন্ধুর হরিনাম সংকীর্তনকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার বলে উপহাস করত তারাও ক্রমে ক্রমে নামমন্ত্রের মহিমা বুঝতে পারল। অনেকে ভক্ত হয়ে উঠল প্রভু জগদ্বন্ধুর।

হরিনামই যাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত, হরিনামই যাঁর প্রাণ' অলাদা করে তাঁর আত্মপ্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। হরিনাম প্রচারের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তাঁর জীবনের মহিমা তার পরম সার্থকতা। লোক সমক্ষে নিজেকে বড় একটা প্রকাশ করতে চাইতেন না জগদ্বন্ধু। নিজের যোগবিভূতির কোন লীলাও

কাউকে কখনো দেখাতে চাইতেন না। তবে মাঝে মাঝে কোন নাস্তিক বা সংশয়বাদীকে শিক্ষা দেবার জন্য অথবা হরিনাম প্রচারের কোন বাধা অপসারিত করবার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে কোন না কোন যোগবিভূতির পরিচয় দিতে হত।

উষারঞ্জন মজুমদার তখন ঢাকায় নামকরা ডাক্তার। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। তাই মূর্তিপূজা একেবারে পছন্দ করতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তিনি তাই কঠোর সমালোচনা করতেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তদের প্রায়ই উপহাস করতেন তিনি। প্রভুর কানে একথা যেতে একদিন তাঁকে শিক্ষা দিতে চাইলেন তিনি।

একদিন প্রভু ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর মন্দিরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বসেছিলেন। সহসা তিনি ভক্তদের বললেন, শীগ্‌গির একজন ভাল ডাক্তার ডাক ; আমার ভীষণ অসুখ করেছে।

উষারঞ্জনবাবু ঢাকার একজন বড় ডাক্তার। সুতরাং ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার কিন্তু রোগীকে পরীক্ষা করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রোগীর হাত বুক অনেক করে পরীক্ষা করেও হৃৎস্পন্দনের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। অথচ রোগী বেশ স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছেন।

এতবড় আশ্চর্য ঘটনা উষারঞ্জনবাবু যেন কখনো দেখেননি। যে হৃৎস্পন্দন এক মুহূর্তের জন্যও থেমে গেলে মৃত্যু অবধারিত, সেই হৃৎস্পন্দনের ক্রিয়া এতক্ষণ ধরে অচল হয়ে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে কোন মানুষ এমন স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তিনি তা কোনমতেই বুঝতে পারলেননা।

তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের সীমা বুঝতে পেরে হার মানলেন ডাক্তার উষারঞ্জন।

বিমূঢ় হয়ে তখনো বসে ছিলেন উষারঞ্জন। প্রভু জগদ্বন্ধু তখনো বারবার তাঁকে বলছেন, ডাক্তারবাবু, আমাকে খুব ভাল ওষুধ দিন ; আমার দেহে ছত্রিশ কোটি ব্যাধি হয়েছে।

ভক্তরাও ব্যস্ত হয়ে তাঁকে ভাল ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে।

এবার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন উষারঞ্জনবাবু, এ এক মহাসাধকের অলৌকিক যোগলীলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের অনেক লীলার কথা এর আগে কানে শুনেছেন। কিন্তু চোখে কখনো দেখেননি। আজ তা নিজের চোখে দেখে ধন্য হলেন। সেইদিন হতেই সমস্ত জ্ঞানের অভিমান ঝেড়ে ফেলে প্রভু জগদ্বন্ধুর পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন উষারঞ্জন।

উষারঞ্জনের মত এত বড় ডাক্তারের পরিবর্তন দেখে ঢাকার লোকেরা সবাই অবাক হয়ে যায়। হরিনামের প্রচার আরো বেড়ে যায়। ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা থেকে নবদ্বীপ যাবার পথে কলকাতা হয়ে গেলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। কলকাতায় এলেই সেই রামবাগানের ডোম পাড়াতে থাকতেন। রোজ সকালবেলায় অতুল চম্পটিকে টহল দিতে বেরোতে হত। কাঁধে ঝুলি, হাতে এক জোড়া করতাল। করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে আশ পাশ অঞ্চলের সমস্ত পথগুলি ঘুরে আসতেন। পথের দুপাশে অনেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখত। হরিনামে সকলের রুচি নাই। তাছাড়া শহরের লোক স্বভাবতই হরিনামের প্রতি উন্নাসিক হয়। বৈষ্ণবদের তাচ্ছিল্য অর্থে বলে বোষ্টম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের বলে ন্যাড়া-নেড়ীর দল। তাদের ভিক্ষাবৃত্তিকে বলে, কাঁড়া চাল নেবার ফিকির।

একদিন সকালে চম্পটি ঠাকুর টহল দিয়ে ফিরছেন, এমন সময় জনকতক লোক তাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ঠাট্টা করতে লাগল। একজন বলল, কী বাবাজী! চেহারাটি ত বেশ দুধ ঘি খেয়ে খেয়ে খেয়ে তেল চুকচুকে করেছ। তা হবে নাই বা কেন, ভাবনা

চিন্তা কাজ কর্ম ত কিছু নাই। মুখে শুধু লোক দেখানো সকালে সন্ধ্যায় হরি বলে একটু চেঁচানো।

আর একজন বলল, আমরাও যদি ঐ রকম একটা সুযোগ সুবিধে পাই ত বর্তে যাই।

এর আগেও অনেকবার এই ধরণের বিদ্রূপ শুনেছেন। রোজ রোজ এই সব শুনতে শুনতে আজ একেবারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন চম্পটি ঠাকুর। প্রভু জগদ্বন্ধুর সামনে সোজা গিয়ে ঝুলি ও করতাল নামিয়ে রেখে রেগে বললেন, এই সব রইল, আমি আর রোজ রোজ লোকের গালাগালি শুনতে পারব না। হরিনামে ভক্তি বিশ্বাস ত দূরের কথা, কানে শুনে সহ্য করতে পারে না। ওদের হরিনাম শুনিয়ে কি হবে বলতে পার? ওরা এখন কামিনী কাঞ্চনে মত্ত; শেয়াল কুকুরেরও অধম। তুমি যে এতবড় প্রভু, এত বড় সাধক, কেউ ত তোমায় আজো পর্যন্ত চিনলে না।

এত সব কথা শুনেও এতটুকু বিচলিত হলেন না প্রভু জগদ্বন্ধু। স্থির ধীর ভাবে বললেন, পাগলামি করিস না। তোর কর্তব্য তুই করে যাবি। তুই শুধু নির্বিচারে হরিনাম করে যাবি। কে হরিনাম করছে না করছে তা তোর দেখবার দরকার নাই। মনে রাখবি, কোন ভাল ও বড় কাজের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। তার জন্য সময় লাগে। তুই যদি আজ একটা গাছ বসাস, তাহলে সেটা কি একদিনেই বেড়ে উঠবে? তার জন্য সময় চাই। কালক্রমে সব হবে।

কলকাতায় প্রভু জগদ্বন্ধু যখনই যেখানে থাকতেন, মহেন্দ্রনাথ, শিশির কুমার ঘোষ তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। তাঁদেরও ঐ একই কথা বলতেন; একই উপদেশ দান করতেন। হরিনাম কর। হরিনাম প্রচার কর। বিভিন্ন চিঠিপত্রে, নীতি উপদেশে, গানের পদে একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেছেন প্রভু।

তিনি আরো বলতেন, এ হচ্ছে ঘোর কলিকাল। পাপে মগ্ন হয়ে উঠেছে পৃথিবী। মহাপ্রলয় আসন্ন। এ যুগে হরিনাম ছাড়া জীবের মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। সৃষ্টি রক্ষার অন্য কোন মন্ত্র নাই। অতএব হরিনাম কর।

কতকাল আগে প্রভু জগদ্বন্ধু যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আজ সারা বিশ্বে মানুষের নৈতিক চরিত্রের যে শোচনীয় ব্যাপক অবনতি ঘটেছে এবং তার ফলে দিকে দিকে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে তা এক রকম মহাপ্রলয় ছাড়া কিছুই নয়। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বেড়েছে; কিন্তু সে পরিমানে আত্মার উন্নতি হয়নি। একমাত্র ভক্তি আর বিশ্বাস ছাড়া মানুষের চিত্তশুদ্ধি বা আত্মোন্নতি সম্ভব নয়। হরিনাম যত সহজে মানুষের মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মায়, অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়।

কলকাতা হতে আবার বৃন্দাবন গেলেন প্রভু। হোলি ঝুলন বা রাস এলেই নবদ্বীপ অথবা বৃন্দাবন চলে যেতেন! হরিনামে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে মত্ত হয়ে উঠতেন সেখানে গিয়ে। রথযাত্রার সময়ও তিনি এই দুইটি জায়গার কোন একটিতে যেতেন, কখনো পুরীধামে যাননি।

একবার কোন এক ভক্ত এ বিষয়ে প্রভুকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ও হচ্ছে মহাধাম। ওখানে গেলে এ দেহ কি আর থাকবে? একেবারে গলে জল হয়ে যাবে।

এই কথার মধ্য দিয়ে পুরীধামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রহস্যময় তিরোধানের প্রতিই ইংগিত করেছেন জগদ্বন্ধু। নীলাচলের সাক্ষাৎ দারুব্রহ্মের মধ্যে কিভাবে লীন হয়ে গিয়েছিলেন সেই অবতাররূপী মহামানব সে রহস্য আজো কেউ উদঘাটিত করতে পারেনি।

এবার বৃন্দাবনে গিয়ে পূরো তিনটি মাস রয়ে গেলেন প্রভু

জগদ্বন্ধু। রামদাস তাঁর নির্দেশে বরাবরই বৃন্দাবনে থাকেন। প্রভুর রচিত পদ গান করে করে হরিনাম প্রচার করে চলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

বৃন্দাবন থেকে আবার বাংলাদেশে ফিরবার জন্য প্রভু উদ্যোগ করতে রামদাস বললেন, তিনিও যাবেন। প্রভু বললেন, না এক জায়গায় চিরকাল বসে থাকলে চলবে না। হরিনাম প্রচার করতে হবে জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে।

ভক্তি ভাল। কিন্তু ভক্তির অহেতুক উচ্ছাস সব সময় ভাল নয়। ভক্তদের ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না প্রভু জগদ্বন্ধু। সাধকদের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায় সংযত হয়ে চলতে হবে। সাধনার একনিষ্ঠ ধারাটি অন্তরের মধ্যে গোপনে বয়ে যাবে, বাইরে কোন উচ্ছলতা বা অসংযমে কেটে পড়বে না —ভক্তদের এই উপদেশই বারবার দিতেন প্রভু।

একদিন রামদাস কীর্তন গান করতে করতে ভক্তিভাবের প্রবলতায় মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমে কাঁদতে লাগলেন। তারপর গানের পদের খাতাটি প্রভুর আসনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু শান্তভাবে রামদাসকে শিক্ষা দেবায় জন্য বললেন, এভাবে খাতাটি ছুঁড়ে মারলি, লাগলো কার? মনে রাখবি, যাঁর নাম করছিস নামের মধ্যে অলক্ষ্যে তিনিই বিরাজ করেন। সুতরাং নামের খাতার প্রতি অশ্রদ্ধা মানে তাঁর প্রতিই অশ্রদ্ধা।

রামদাস নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

আর একদিন আর এক ভক্ত নাম জপ করতে করতে ভক্তিভরে আবেগের বশে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, হরি হে প্রাণবল্লভ!

প্রভু জগদ্বন্ধু কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তটিকে ডেকে বললেন, কে তোর প্রাণবল্লভ, সেকথা কি এমনি করে চীৎকার

করে সবাইকে জানাতে হয়? সেকথা প্রাণের গোপনে যত্ন করে রেখে দিতে হয়। ভক্তটি সত্যিই লজ্জিত হলেন।

এ আদেশ চিরদিনের মত শিরোধার্য করে নিলেন রামদাস। দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে হরিনাম প্রচারই একমাত্র ব্রত উঠল তাঁর জীবনে।

স্বদেশে আছেন সুযোগ্য ভক্ত শিষ্যরা। প্রভুর আদেশে হরিনাম প্রচারে মত্ত হয়ে উঠেছে সবাই। ওদিকে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজও চুপ করে নাই। নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্ণিয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকাতেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে চলেছেন ভারতী মহারাজ। সম্প্রতি খবর পেলেন প্রভু জগদ্বন্ধু, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হোম স্থাপন করেছেন। বহু আমেরিকাবাসীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাও দিয়েছেন।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মত প্রভু জগদ্বন্ধুও নারী-স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। ভক্তদের সব সময় সাবধান করে দিতেন, দেখিস, যেন প্রকৃতি স্পর্শ না লাগে।

প্রভু যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন একদিন ভক্ত রামদাস বনমালীবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে এক হাঁড়ি প্রসাদের নাড়ু প্রভুর জন্য কুঞ্জে নিয়ে আসেন। কোন কথা না বলে রামদাস প্রভুর সামনে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, সেকি রে, তুই এভাবে প্রকৃতি স্পর্শ করলি? আর যেন কখনো এমন কাজ করিস না।

প্রসাদের হাঁড়িটিকে তিনি প্রণাম করে নিজে গিয়ে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিলেন।

আজকাল একমাত্র ঠাকুরবাড়ী ছাড়া আর কোথাও যান না। দিনে শুধু একবার করে গোবিন্দজীকে দর্শন করতে যান। এ

ছাড়া কুঞ্জ থেকে বার হল না। কিন্তু যখনি গোবিন্দজীকে দর্শন করবার জন্য পথে বার হতেন, তখনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠত তাঁর মন। সাত্ত্বিক প্রেমবিকার ফুটে উঠত সারা দেহে। যেন প্রেমসিদ্ধি-স্বরূপিনী মহাভাবময়ী রাধা চলেছেন কৃষ্ণ অভিসারে। প্রভু জগদ্বন্ধু বারবার রামদাসকে সাবধান করে দিতেন, দেখিস রামদাস, আমি কখন কি ভাবে থাকি, আবার গায়ে যেন প্রকৃতি স্পর্শ না লাগে। ভালভাবে লক্ষ্য রাখিস।

একদিন কুঞ্জ হতে বেরিয়ে ভক্তদের সঙ্গে বনমালীবাবুর কুঞ্জে রাধাবিনোদ দর্শন করবার জন্য এগিয়ে চলেছেন। প্রভু জগদ্বন্ধু পথে সাধারণতঃ খুব কমই বার হন। যখনি বেরোন তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় জমে যায় পথের দুপাশে। চোখ দুটি মুদ্রিত করে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছেন প্রভু। দুপাশ থেকে জনতা এগিয়ে আসছে তাঁকে স্পর্শ করবার জন্য।

সহসা 'আমার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল' বলে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন প্রভু। রামদাস এতক্ষণ ভীড়ের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এবার চমক ভাঙ্গল তাঁর। তিনি বুঝতে পারলেন ভীড়ের মধ্যে কোন নারীদেহের স্পর্শ লেগেছে প্রভু অঙ্গে। প্রকৃতি স্পর্শে এমনিই জ্বালা অনুভব করেন প্রভু সারা অঙ্গে।

রামদাস অত্যন্ত লজ্জিত হলেন নিজের ভুলের জন্য। এদিকে প্রভু জগদ্বন্ধুর গায়ের জ্বালা থামতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে ব্রজধামের পবিত্র ধুলোতে গড়াগড়ি দেবার পর তাঁর জ্বালা দূর হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর মত প্রভু জগদ্বন্ধুও প্রকৃতি স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন; তার একটি নিগূঢ় কারণ আছে। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনকেই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বলে স্বীকার

করা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যমতে পুরুষ হচ্ছে নির্বিকার নিত্য শুদ্ধ। একমাত্র প্রকৃতির সংস্পর্শেই পুরুষের মধ্যে চেতনা ও অহংকার জাগে। অহংকার থেকে জাগে কামনা, আবার কামনা থেকে সৃষ্টি। যে সব বৈষ্ণব সাধক মধুর ভাবের উপাসক তাঁরা নিজেদের সমর্থা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রতির নায়িকা ভাবেন। তাঁদের কাছে কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণাবতার গৌরই একমাত্র পুরুষ। নারীভাবে ভগবান কৃষ্ণের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণের জন্যই তাঁরা পুরুষভাব একেবারে চেপে রাখেন মনের মধ্যে অথবা মন থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেষ্টা করেন। অন্য কোন নারী বা প্রকৃতির স্পর্শে পাছে আবার প্রথমে পুরুষভাব ও পরে একে একে অহংকার ও সৃষ্টির বাসনা জেগে ওঠে তাঁদের মধ্যে, তাই প্রকৃতি স্পর্শ এমন করে এড়িয়ে চলেন তাঁরা।

বৃন্দাবন থেকে আবার এলেন ফরিদপুরে। এবার আর কলকাতায় থাকলেন না; সোজা চলে গেলেন ফরিদপুর শহরের শেষ প্রান্তে একটি গভীর জংগলের মধ্যে। নূতন কীর্তন অংগন স্থাপিত হলো। মালিক রামদাস মুদী আনন্দে জায়গা দান করল অনেকখানি।

এবার খুব বেশী ভীড় হতে থাকে প্রভুকে দর্শন করবার জন্য। শুধু হিন্দ নয়, বহু মসলমান নরনারীও তাঁকে দর্শন করতে আসত। তাঁর দিব্য দেহকান্তির অলৌকিক লাবণ্য ও জ্যোতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত সবাই। তিনি হচ্ছেন জগতের বন্ধু। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের বন্ধু। তঁরে কাছে জাত বিচারের কোন প্রশ্ন নাই। শুধু ধর্মপ্রবণ বয়স্ক নরনারী নয়, কিশোর বয়সের ছাত্ররাও দলে দলে আসতে লাগল।

ছেলের দল এলেই প্রভু যেন ছেলে হয়ে যান তাদের সঙ্গে। তিনি নিজের হাতে মৃদঙ্গ ও করতাল বাজাতে থাকেন। আর ছেলেদের হরিনাম করতে বলেন। তারপর হাঁড়ি হাঁড়ি বাতাসা

হরির লুট দেন। ছেলেরা যখন হরিনাম করতে করতে ভাবের আবেশে নাচতে থাকে, তিনি তখন হাততালি দেন।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেই আসে সবাইকে শুধু হরিনাম করতে উপদেশ দেন জগদ্বন্ধু। বলেন, কলিযুগে এ ছাড়া কোন গতি নাই। হরিনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলতেন, সমস্ত মন প্রাণ এক করে আমরা যদি কারো নাম করতে থাকি তাহলে নামীর সংগে ক্রমে আমরা একাত্ম হয়ে যাই। নামীর ঐশী শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং হরিনাম কর।

সাধনার ধারাটি এবার যেন সাগর সংগমে এসে পড়েছে। সমুদ্রের অগাধ পূর্ণতা অতলান্ত প্রশান্তি আজ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নদীর মতই বহু পথ পার হয়ে বহু দূর থেকে বহু পাথেয় সঞ্চয় করে নিয়ে এসে নিজের ভারে আজ সে নিজেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আজ তাই সে ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়তে চায় সমুদ্রের কোলে। আজ তাই তার গতি আছে, কিন্তু কোন চঞ্চলতা নাই। ঢেউ আছে, কিন্তু কোন শব্দ নাই।

এবার থেকে মৌনব্রত ও নিভৃত বাস শুরু করলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। অংগনের একপ্রান্তে গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ তৈরী হলো। চারিদিকে ঘন খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানি ঘর। ভিতরে আলো হাওয়া ঢোকবার মত কোন ছিদ্র নাই। ঘরের ভিতরটি সব সময়ই অন্ধকার। একজন নির্দিষ্ট ভক্ত একবার এসে খাবার দিয়ে যায়। তখনি একবার আলো জ্বালা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আবার তা নিবিয়ে দেয়া হয়।

ক্রমশই জড়ের মত নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছেন প্রভু জগদ্বন্ধু। কোন ইচ্ছা নাই, অভাব নাই। কোন বিষয়েই কোন চেতনা নাই। ভক্তরা জোর করে খাওলালে খান, স্নান করালে করেন। কিন্তু নিজে থেকে কোন কিছুই করেন না।

নিভৃতবাস শুরু হবার কিছুদিন পরই প্রেমানন্দ ভারতী

মহারাজ আমেরিকা হতে তাঁর বিদেশী শিষ্যদের নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। আমেরিকার কয়েকজন নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে ভারতী মহারাজ তাদের শ্যামদাস, গৌরীদাসী, হরিদাসী প্রভৃতি নামকরণ করেছিলেন। ভারতী মহারাজ প্রভু জগদ্বন্ধুর নির্দেশেই তাঁর বাণী প্রচার করেন আমেরিকায়। তাঁর মুখে প্রভু জগদ্বন্ধুর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা শুনে সেখানকার অনেকেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত প্রভুকে দেখবার জন্য ভারতী মহারাজের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন।

বহু আশা করে তাঁরা এলেন বটে কিন্তু দেখা হলো না। নিভৃতবাস হতে প্রভু একবারও বার হলেন না।

একজন ভক্ত সাধক বৃন্দাবনে প্রভু জগদ্বন্ধুর অলৌকিক মূর্তি দর্শন করে ফরিদপুরে ছুটে আসেন। কিন্তু প্রভুকে দেখতে না পেয়ে বাইরে থেকেই তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করেন। পরম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ প্রভুর সেবা পরিচর্চা ও হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানের সব ভারই বহন করে চলেছেন। এত সেবা করেও তাঁর মন ভরছে না। কেবলি মনে হচ্ছে, আরো যদি হাত থাকত, আরো যদি সামর্থ থাকত তাহলে ধন্য হতাম প্রভুর সেবা করে।

তাঁর এই মনের গোপন বাসনাটি কিন্তু অজানা রইল না অন্তর্যামী প্রভুর কাছে। প্রভু একদিন তাঁর সামনে অলৌকিক মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, সেবা করবি সেখানেও অহংকার। কেন, আরো যেসব ভক্ত সেবা করছে, তাদের হাত গুলোকে নিজের হাত বলে মনে করতে পারিস না? তাদের আত্মার মধ্যে নিজেকে যদি দেখতে না পারিস ত বৃথাই তোর সাধনা।

মহেন্দ্রনাথ আকুলভাবে কেঁদে উঠলেন।

নিভৃতবাসের বারো বছর পর একবার বেরিয়ে এলেন

প্রভু জগদ্বন্ধু। এসে বললেন, আমার বাইরে আসবার কোন প্রয়োজন নাই। তোরা বাইরে থেকে হরিনাম করবি আর আমি সেই নামের অমৃত পান করতে করতে আকাশে বাতাসে তৃণ ও ধূলিরাশির মধ্যে বিলীন হয়ে যাব। তোরা সব হরিনাম কর। হরিনামেই একমাত্র পাপে ডুবে যাওয়া পৃথিবী আবার রক্ষা পাবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় সাধকেরা ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্যই সাধনা করে থাকেন। মন্ত্রসিদ্ধির দ্বারা আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভ করলেই নিজেদের ধন্য ও মুক্ত মনে করেন তাঁরা। ভাবেন পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁদের সাধনা। কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধু তা কিন্তু কোনদিন ভাবেননি। তাঁর সাধনার উদ্দেশ্যটি বড় চমৎকার। বড় অদ্ভুত। তিনি বলতেন, তিনি মুক্ত হবেন সেইদিন যেদিন হরিনামের অমৃত রসে পৃথিবীর অনন্ত পাপের কলুষ নিঃশেষে ধুয়ে যাবে, যেদিন হরিনামের দিব্য আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রতিটি বস্তু।

প্রভু জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ব্রজলীলায় মাত্র অষ্টসখী এবং গৌরলীলায় মাত্র সাড়ে তিনজন রাসমাধুর্য আস্বাদন করেছিল। তাতে সমগ্র জীবের কিছু হয়নি। সময় এলে একদিন না একদিন পৃথিবীর অণু পরমাণুগুলোকে পর্যন্ত শ্রীভগবানের স্বরূপরস আস্বাদন করাবো; তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।

অবশেষে মরদেহ রক্ষা করে নিত্যধামে যাবার দিনটি ঘনিয়ে এল।

সেদিন ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন। সূর্যের উজ্জ্বল আলোতেও ভক্তরা সকাল থেকে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন সব কিছু। বুকে অপরিসীম ব্যথাভার। চোখে অবিরল অশ্রুধারা। তাঁরা বুঝেছেন, মাটির দেহটি মর্তভূমিতে রেখে প্রভু জগদ্বন্ধুর বিদেহী

আত্মা পরব্রহ্ম হরির সংগে মিলিত হতে যাচ্ছেন। তবু মন মানে না। কোন বাধা মানতে চায় না অশ্রুর ধারা। দেখতে দেখতে যে ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন যুগাবতার জগদ্বন্ধু অজস্র ভক্তের আকুল ক্রন্দন সত্ত্বেও সে ধ্যান আর ভাঙ্গল না।

সমাপ্ত